ডিপ্লোম্যাট

নিমাই ভট্টাচার্য

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৯

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

আট টাকা

মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েও যিনি অদৃষ্টের নামে পরাজয় স্বীকার করতে শেখেননি ও যাঁর সান্নিধ্যে, শুভকামনায় মুগ্ধ হয়েছি, সেই

লণ্ডন প্রবাসিনী শ্রীমতি তৃপ্তি দাশ-কে

—জার্নালিস্ট

DIPLOMAT

A Novel by

NIMAI BHATTACHARYYA

8·00

এই লেখকের আর চারখানি বহু প্রশংসিত উপন্যাস

মেমসাহেব

এ-ডি-সি

রিপোর্টার

ডিফেন্স কলোনী

ডিপ্লোম্যাট

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম,
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম ;
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব।

কর্মজীবন আর সংসারজীবনের তুটি গোলপোস্টের মাঝখানে দায়িত্ব কর্তব্যের ফুটবল পেটাতে পেটাতেই অধিকাংশ মধ্যবিত্তের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিছু মানুষের বিচরণক্ষেত্র আরো বিস্তৃত, আরো রঙীন। কিছুটা বিস্তৃত, কিছুটা রঙীন হওয়া সত্ত্বেও সমাজসংসারে এদের নোঙর বাঁধা। চৌরঙ্গীর অলিতে-গলিতে ঘোরাঘুরি বা সন্ধ্যার অন্ধকারে মিউজিয়ামের পাশে লুকিয়ে রিক্সা চড়ে যৌবনের অলকা-নন্দা-অমরাবতী ভ্রমণের মেয়াদ কতটুকু, মীর্জাপুর বা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ঘরবাড়ী ছেড়ে বোম্বে সেল্‌স অফিসের মিস সোন্ধিকে

নিয়ে মেরিন ড্রাইভ বা চার্চ গেটের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করারই বা স্থায়িত্ব কতক্ষণ?

দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে স্বাধীনতা উপভোগের পর্ব শেষ হয়। সূর্যাস্তের পর সব পাখি ফিরে আসে ঘরে। শনি-মঙ্গল-রাহুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই একদিন সব থেমে যায় প্রায় সবার।

ডিপ্লোম্যাট-কূটনীতিবিদরা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। মীর্জাপুর বা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ছেলে হয়েও সারা ছুনিয়ায় তাঁদের বিচরণ, তাঁদের সংসার। বিশ্ব-সংসারের কত রং-বেরঙের নারী-পুরুষের সঙ্গে তাঁদের লেনদেন। দেশে-দেশে ছড়িয়ে থাকে এদের স্মৃতি, প্রাণের মানুষ, মনের টুকরো টুকরো স্বপ্ন।

তরুণ মিত্র যেদিন ফরেন সার্ভিসে ঢুকে কূটনীতিবিদদের তালিকায় নিজের নাম জুড়েছিলেন, সেদিন সত্যি উনি তরুণ ছিলেন। সেদিনের পর মিসিসিপি-ভলগা-গঙ্গা বেয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। অনেক জল-ঝড়, অনেক শীত-বসন্ত পিছনে ফেলে এসেছেন।

ফায়ার প্লেসের ধারে রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বাকি হুইস্কিটা হঠাৎ গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তরুণ মিত্র। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে চলে গেলেন স্টাডিতে। অতি পরিচিত পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ, মহাসাগরের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ল্যাণ্ডিং এয়ার ক্রাফট্-এর কমাণ্ডারেব মত খুঁজতে লাগলেন রানওয়ে। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির বোঝা নিয়ে মনের বিমান ল্যাণ্ড করাতে গিয়ে অনেকগুলো এয়ারপোর্টের অনেক রানওয়ের হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠল। দিল্লী···কায়রো···লণ্ডন···মস্কো···নিউইয়র্ক ···হংকং···টোকিও এবং আরো কতো! এক সঙ্গে যেন সমস্ত

কণ্টোল টাওয়ার থেকে ল্যাণ্ডিং সিগন্যাল আর নির্দেশ পেলেন ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র।

আরো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দু'পা ডানপাশে সরে এলেন। চোখের সামনে নজর পড়ল দিল্লী।

'সো' ইউ হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টে ইন ঘানা'···পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও ইউনাইটেড নেশানস ডিভিশনের হেড, পরমেশ্বরন হাসতে হাসতে ছোট্ট মন্তব্য করলেন।

তরুণ মিত্র বলল—'হাঁ স্যার।'

মুহূর্তের জন্য দু'জনেই চুপচাপ। তরুণ আবার বলে, 'আক্রার পোস্টিং পেয়ে মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভালই···'

পরমেশ্বরন ওয়ারলেশ ট্রানস্‌ক্রিপ্টের ফাইলটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'ব্ল্যাক আফ্রিকায় পোস্টিং না পেলে কোন ডিপ্লোম্যাটই ঠিক পুরোপুরি ডিপ্লোম্যাট হতে পারে না।'

'আজ সত্যি সত্যিই সেকথা বিশ্বাস করি।'

—রেঙ্গুন থেকে ঘানা। তরুণ মোটেও খুশী হতে পারেননি। ভেবেছিলেন কন্টিনেণ্টে পোস্টিং পাবেন। কিছুদিন আগে ফরেন সার্ভিস ইন্সপেক্টরেটের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী রেঙ্গুনের ইণ্ডিয়ান এম্বাসী ভিজিট করতে এসে বলেছিলেন, 'ঠিক মনে নেই, বাট সামওয়ান টোল্ড মী যে তুমি এবার কন্টিনেণ্টে কোন পোস্টিং পাবে।'

ফরেন সার্ভিসের অধিকাংশ নবীন কূটনীতিবিদদের মত ব্ল্যাক আফ্রিকার নাম শুনেই তরুণের পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরকে পর্যন্ত মনের কথা জানিয়েছিল। অ্যাম্বাসেডর তরুণের কথা শুনে শুধু মুচকি হেসেছিলেন, মুখে কিছু বলেন নি। প্রায় মাসখানেক পরে অ্যাম্বাসেডর একদিন

তরুণকে ডেকে বললেন, 'স্পেশ্যাল সেক্রেটারী তোমাকে ঘানাতেই চান।'

সুতরাং আর অযথা বাক্যব্যয় না করে তরুণ কোকো আর সোনার দেশ ঘানা গিয়েছিল। গিনি উপসাগরের পাড়ের আক্রায় কাটিয়েছে তিন বছর। কিন্তু গিনি উপসাগর বা দূরের দক্ষিণ অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের গর্জন ছাপিয়ে কানে এসেছে প্রেসিডেণ্ট নক্রুমার তীব্র অহমিকার অসহ্য উল্লাস।

স্নিগ্ধ, শান্ত, বিচিত্র প্রকৃতির ছোট্ট কালো দুরন্ত ছেলে হচ্ছে ঘানা। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে চলে গিয়েছে তুলনাহীন বালুকাময় বেলাভূমি। সেই সুন্দর সুদীর্ঘ বেলাভূমি কখন যেন হারিয়ে যায় ঘন-কালো বনানীর মধ্যে। এই সীমাহীন অরণ্য আর বালুকাময় বেলাভূমিতেই লুকিয়ে আছে সোনার সংসার। তাইতো নাম ছিল গোল্ডকোস্ট! পশ্চিম আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেবার পর এলো ডেন আর ডাচরা। ফেরিওয়ালা সেজে ব্যবসা করতে এলো ইংরেজ। দেখতে দেখতে একদিন ফেরিওয়ালাই হলো মালিক।

তারপর প্রায় একশ' বছর ধরে চলল ইংরেজের লুটপাট। জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে গেল ম্যাঙ্গানিজ আর কোকো। শত শত বছরে প্রকৃতির আশীর্বাদে যে বনানী গড়ে উঠেছিল, জাহাজ বোঝাই করে তাও নিয়ে গেল। হাজার হাজার সিন্দুক বোঝাই করে নিয়ে গেল সোনা আর হীরের তাল।

ইংরেজ যখন গোল্ডকোস্টের অনন্ত সম্পদ লুটপাটে মত্ত, তখন সবার অলক্ষে চব্বিশ বছরের এক স্কুলমাস্টার পাড়ি দিলেন আমেরিকা। নিঃসম্বল এই কৃষ্ণকায় রোমান ক্যাথলিক যুবক নিদারুণ শীতের রাতে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছেন। 'ব্ল্যাক নিগার' বলে ধিকৃত হয়েছেন আমেরিকার দ্বারে দ্বারে। কিন্তু তবুও তাঁর সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। দুটি ব্যাচিলার্স আর দুটি

মাস্টার্স ডিগ্রী নেবার পর এলেন অ্যাটলান্টিকের এপারে, ভর্তি হলেন লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে।

এমনি করে বারো বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার পর ছত্রিশ বছরের নক্রুমা ১৯৪৭ সালে ফিরে এলেন নিজের জন্মভূমিতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেশায় মাতাল করে তুললেন সত্তর লক্ষ দেশবাসীকে। সত্তর লক্ষ কৃষ্ণকায় সিংহের বজ্রমুষ্টিতে ইংরেজ না পালিয়ে পারল না।

সেদিন এই সত্তর লক্ষ মানুষ হাসিমুখে নিজেদের ভবিষ্যৎ তুলে দিল রাষ্ট্রনায়ক নক্রুমার হাতে।

ঘানার মানুষগুলো কালো কিন্তু বড় হাসি-খুশী ভরা। আনন্দে মেতে উঠতে বোধ করি এদের জুড়ি নেই সারা আফ্রিকায়। দূরাগত মানুষদের এরা বড় ভালবাসে, বড় সমাদর করে। নিমন্ত্রণ করে বাদামের সুপ খাওয়ায়।

ঘানায় না গেলে কি তরুণ এসব জানত? জানত না। ঘানায় না গেলে আরো অনেক কিছু জানতে পারত না। আক্রা যে এত সুন্দর, এত আধুনিক শহর, তাও জানত না। অন্তরে অন্তরে নিজেদের ঐতিহ্যের জন্য অস্বাভাবিক গর্ববোধ করা সত্ত্বেও ঘানার মানুষ ভয়ে ভয়ে পশ্চিমী আধুনিকতাকে দূরে ঠেলে রাখেনি। তাই তো আক্রায় রয়েছে লা'রন্দির মত বিখ্যাত নাইটক্লাব।

তিন তিনটি বছর আক্রায় কাটিয়ে এসে তরুণের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।...

মিঃ পরমেশ্বরন লাইটার দিয়ে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন। তরুণের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে একটু হাসলেন। প্রশ্ন করলেন, 'প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে কেমন লাগলো?'

'অফিসিয়ালি অর আন-অফিসিয়ালি জানতে চাইছেন?'

'তুমি সত্যি ডিপ্লোম্যাট হয়েছ। টেল মী ইওর পার্সোনাল ওপিনিয়ন।'

'একজন অসামান্য প্রতিভা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে...'

'তবে কি ?'

'যেভাবে চলেছেন তাতে কিছুই বলা যায় না।'

'তার মানে ?'

'প্রায় তিনশ' কোটি টাকা ধার নেবার পরও যে দেশের অর্থনীতি টলমল করছে, সেই দেশের প্রেসিডেন্ট যদি উনিশ-কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজের মর্মরমূর্তি তৈরী করতে যান, তাহলে দেশের মানুষ কতদিন বরদাস্ত করবে তা বলা কঠিন।'

'ইউ আর রাইট মাই বয়।'

এবার তরুণ হাসিমুখে বলে, 'তবে স্যার, প্রেসিডেন্ট নক্রুমা হ্যাজ এ চার্মিং পার্সোনালিটি। এমন ব্যক্তিত্ব যে কেউটে সাপকেও বশ করতে পারেন।'

'সাপুড়ে কিন্তু সাপের ছোবলেই মরে, তা জান তো ?'

'ছাটস রাইট স্যার।'

তরুণ মিত্র সম্পর্কে পরমেশ্বরনের হৃদয়ে বেশ কিছুটা কোমল জায়গা রয়েছে। কনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে তরুণকে ভালবাসার অনেক কারণ আছে। স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম, ইণ্টেলিজেণ্ট। যে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাছাড়া কূটনৈতিক দুনিয়ার গোপন খবর যোগাড় করতে তরুণের জুড়ি ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে খুব বেশী নেই।

কেন, সেবার ? টোকিও থেকে প্যান আমেরিকান ফ্লাইটে দিল্লী ফেরার পথে দু'জন পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাট ওর সহযাত্রী ছিলেন। পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাটরা ভাবতে পারেননি তাঁদের পিছনেই ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের তরুণ মিত্র বসেছিলেন। ওঁদের কথাবার্তায় তরুণ জানতে পারে, ইউ-এস-এয়ার ফোর্সের একদল সিনিয়র অফিসার মাসখানেকের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত দেখতে

আসবেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার অফিসারের কোয়ার্টার তৈরী করা সম্ভব হবে? তাও আবার গিলগিট-পেশোয়ারের মত জায়গায়।

জহুরীর কাছে কাঁচ আর হীরের পার্থক্য ধরতে যেমন কষ্ট হয় না, বুদ্ধিমান ডিপ্লোম্যাটের কাছেও তেমনি এই সব টুকরো টুকরো খবরের অনেক দাম, অনেক গুরুত্ব। তরুণ বেশ অনুমান করতে পারল পাকিস্তানে নাটকীয় কিছু ঘটছে।

পালামে যখন ল্যাণ্ড করল তখন সন্ধ্যা সাতটা। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকেই জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে টেলিফোন করল, কিন্তু পেল না। খবরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিনা দ্বিধায় স্বয়ং ফরেন সেক্রেটারীকেই ফোন করল, 'স্যার, মাপ করবেন, বাট দেয়ার ইজ সামথিং ভেরী ইম্পর্টাণ্ট। জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে না পেয়ে আপনাকেই বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।'

পালাম থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তরুণ ছুটে গিয়েছিল আকবর রোডে ফরেন সেক্রেটারীর বাড়ী। বলেছিল, 'স্যার, ওঁদের কথা শুনে মনে হলো ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয়। সন্দেহটা আরো গাঢ় হলো যখন দেখলাম ওঁরা ব্যাংককে নেমে সিঙ্গাপুরের প্লেন ধরতে ছুটে গেলেন। আই অ্যাম সিওর ওঁরা কে-এল-এম ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর থেকে কলম্বো হয়ে করাচি গেলেন।'

ডিনারের সময় হয়েছিল কিন্তু ডিনার না খেয়েই বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরী হলেন ফরেন সেক্রেটারী। ড্রাইভারকে গাড়ী আনার কথা বলে ভিতরের ঘরে গিয়েই প্রাইম মিনিস্টারকে টেলিফোন করে শুধু বললেন, 'খুব জরুরী ব্যাপার। এক্ষুনি একটু দেখা করতে চাই স্যার।'

ফরেন সেক্রেটারী তরুণকে নিয়ে তক্ষুনি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে গেলেন। আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে উঠে এলেন প্রাইম মিনিস্টার। সব শুনে বেশ চিন্তিত হলেন। ছোট্ট

একটা মন্তব্য করলেন, 'ইণ্টেলিজেন্স কিছু সন্দেহ করছিল বেশ কিছুকাল ধরেই।'

সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টরকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠান হলো প্রাইম মিনিস্টার্স হাউসে। তিনজনে মিলে শলা-পরামর্শ শুরু হবার আগেই তরুণ বিদায় নিল।

এ খবর ফরেন মিনিস্ট্রির অনেকেই অনেক কাল জানতেন না। পরে অবশ্য অনেকেই জেনেছিলেন। স্ট্যালিনের রাজত্বকালে মস্কোর ইণ্ডিয়ান এম্বাসীতে পরমেশ্বরন যখন পলিটিক্যাল কাউন্সেলার, তরুণ তখন তাঁর অধীনে কাজ করেছে এবং একবার নয়, অনেকবার কর্ম-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

পরমেশ্বরন তরুণকে নিজের কাছে রাখতে পারলে সব চাইতে সুখী হন। সব সময় তা সম্ভব হয় না। তবে ঘানা থেকে ফেরার আগেই তরুণকে ইউনাইটেড নেশনস পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন পরমেশ্বরন।

'জান তো এবার তুমি ইউনাইটেড নেশনস-এ যাচ্ছো?'

হাসি হাসি মুখে তরুণ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ স্যার।'

'বছর দুই-তিন ওখানে থাকলে তুমি একটি কমপ্লিট ডিপ্লোম্যাট হবে।' পরমেশ্বরন একটু থেমে আবার বলেন, 'মেন পলিটিক্যাল কমিটিতে কাজ করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি তোমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

টেলিফোন বেজে উঠল। কথা বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তরুণ বলল, 'মেন পলিটিক্যাল কমিটিতে তো পার্লামেণ্টের একজন মেম্বার থাকবেন।'

'হ্যাঁ, একজন এম-পি থাকবেন। তিনি তো তোমাদেরই তৈরী বক্তৃতা শুধু রিডিং পড়বেন। তবে ওঁদের নিয়ে কোন ঝামেলা হয় না। ওঁরা সরকারী পয়সায় কয়েক মাস নিউইয়র্কে থাকতে

পারলেই মহা খুশী। তারপর খবরের কাগজের পাতায় যদি দু' প্যারা বক্তৃতা ছাপা হয় তাহলে তো কথাই নেই।'

তরুণ মুচকি মুচকি হাসে। বিদেশে থাকবার সময় কয়েকজন ঐ ধরনের লোকের দর্শনলাভও হয়েছে ঐ সামান্য অভিজ্ঞতাতেই।

যাই হোক সারা পৃথিবীর টপ ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে মেশবার এমন সুযোগ আর পাবে না। লিফট-এ উঠতে নামতে, ক্যাফেটে-রিয়াতে চা-কফি-লাঞ্চ খেতে খেতে দু'-চারজন ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবেই।

দিল্লীতে আসতে না আসতেই তরুণ আবার ইউনাইটেড নেশনস এ যাচ্ছে শুনে অনেকই চমকে উঠলেন। ডিপ্লোম্যাটদের কাছে এর বিরাট মর্যাদা।

সন্ধ্যার পর কনস্টিটিউশন হাউসের ঐ একখানা ঘরের আস্তানায় তরুণ পা দিতে না দিতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'কনগ্রাচুলেশনস।'

তরুণ চমকে গেল। এরই মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেছে? টেলিফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল, হয়ত কাল ভোরেই দালালের দল হাজির হবে। বলবে, 'এক্সকিউজ মী স্যার। আপনি তো আবার বিদেশে যাচ্ছেন। আপনার টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার, ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ডিনার সেট, ওভার কোট, নাইলন শার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু কিনতেই আমরা রাজী।'

ভাবতেও গা-টা ঘিনঘিনিয়ে উঠল!

কিন্তু কি করবে? এর নাম দিল্লী! দেওয়ালে গান্ধীর ফটো লটকিয়ে ফ্রীজে বিয়ার লুকিয়ে রাখাই এখানকার সামাজিক মর্যাদার অন্যতম নিদর্শন। অতীত দিনের বনেদী বাঙালীর বাড়ীর বৈঠকখানায় যেমন আলমারি ভর্তি 'সবুজপত্র' দেখা যেত, তেমনি আজকের দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মানুষের ড্রইংরুমে দেখা যায় ওয়াইন গ্লাস আর ডিক্যাণ্টার-এর প্রদর্শনী। সারা পৃথিবীর মধ্যে দিল্লীই একমাত্র

শহর যেখানে ড্রইংরুমে ফ্রীজ রেখে প্রচার করা হয় ঐশ্বর্যের মহিমা।

এসব দেখতে ভারী মজা লাগে তরুণের। কূটনীতিবিদদের কদর সব দেশেই আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ কূটনীতিবিদ বা এম্বাসীর কর্মী দেখলে একটু যেন বেশী গদগদ হয়ে পড়ে। টাটা কোম্পানী বা বার্মা শেলের অফিসার এবং ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারদের চাইতে রেঙ্গুন বা ওয়াশিংটন ভারতীয় দূতাবাসের কেরানীর মর্যাদা এখানে অনেক বেশী। সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট হলে তো কথাই নেই। হবে না? ওঁরা যে বিদেশে ঘুরে বেড়ান, টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার-নাইলনের শার্ট আনতে পারেন। ভারতবর্ষের মানুষ নাকি ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শে দীক্ষিত। অথচ একটা সুইস ঘড়ি বা জাপানী ক্যামেরা দেখলে তো অধিকাংশ মানুষের জিভের জল গড়ায়।

তবে হ্যাংলামিটা যেন দিল্লীতেই বেশী।

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং!'

'মিস ভরদ্বাজ বলছি। চিনতে পারেন?'

'মাই গড! যাকে দেখলে অ্যাম্বাসেডররা পর্যন্ত গাড়ী থামিয়ে লিফট দেন, তাঁকে তরুণ মিত্র ভুলবে?'

মিস ভরদ্বাজ কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু বেশ বোঝা গেল বড় খুশী হয়েছেন। ছোট্ট একটু মিষ্টি হাসির রেশ ভেসে এলো টেলিফোনে।

তরুণ মিত্র আবার বলেন, 'বলুন কি খবর? কেমন আছেন?'

'মেনি থ্যাঙ্কস। ভালই আছি।'

ইতালীয়ান এম্বাসীর এক ককটেল পার্টিতে মিস ভরদ্বাজের সঙ্গে তরুণ মিত্রের প্রথম আলাপ। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর মিস ভরদ্বাজ আজে-বাজে খদ্দেরের কাজ পছন্দ করেন না। শুধু বিদেশী ডিপ্লো-

ম্যাটদের কাজ করেন উনি। ইতালীয়ন অ্যাম্বাসেডরের সিটিংরুম ও ড্রই রুমও ডিজাইন করেছেন মিস ভরদ্বাজ। এ কাজ খুব বেশী দিন করছেন না। নতুন বিজনেস শিকারের আশায় কূটনৈতিক তুনিয়ায় নিত্য ঘোরাঘুরি করছেন।

দিল্লীর ইন্টিরিয়র ডেকরেটররা শুধু ড্রইংরুম বা অফিসরুমই সাজিয়ে-গুছিয়ে দেন না, মনে হয় ভাল ভাল খদ্দেরদের মনের অন্দরমহলও সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে ভালবাসেন। তাছাড়া দেশী বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে একটু নিবিড় করে মেলামেশায় ওদের ও আরো অনেকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মিস ভরদ্বাজ সবে এই পথে পা দিয়েছেন। মিস প্রমীলা কাউলের মত নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি অর্জনে এখনও অনেক দেরী।

মিস কাউলকে নিয়ে কত বিদেশী ডিপ্লোম্যাট যে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল। জংপুরার বীরবল রোডে মিস কাউলের ফ্ল্যাটে যান। সকালে, তুপুরে, বিকেলে—যখন ইচ্ছা। সব সময়ই তু'-চারজন ডিপ্লোম্যাটকে দেখতে পাবেন। অবশ্য সন্ধ্যার পর মিস কাউলকে আর পাবেন না। পার্টি, ককটেল, ডিনার। সব শেষ করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়। একটা, দেড়টা, তুটো, আড়াইটে। উইক-এণ্ডের পার্টিগুলো থেকে ফিরতে কখনও কখনও আরো দেরী হয়। মিঃ পার্কার, মিঃ বার্গম্যান বা আরো অনেকে অজন্তা-ইলোরা বা খাজুরাহোর প্রাণহীন মর্মরমূর্তি দেখতে যাবার সময় প্রাণচঞ্চল মন-মাতানো মিস কাউলকে পাশে না পেলে শান্তি পান না।

দিল্লীবাসী বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের অনেকেই সামারে পাড়ি দেন নিজের নিজের দেশে। বিদেশী কূটনীতিবিদদের চারপাশে উপগ্রহের মত যাঁরা নিত্য ঘুরপাক খেয়ে থাকেন, তাঁদের তখন রোদন ভরা বসন্ত। মিস কাউলের মত যাঁরা পার্কারের সঙ্গে একই প্লেনে সামার-কোর্সে যোগ দেবার জন্যে সেই সুদূর সাগর পারের

অচিন দেশে যেতে না পারেন, তাঁরা তখন চেমসফোর্ড ক্লাবে বিজনেসম্যান আর কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গ দান করেন। হয়ত মুসৌরী বা নৈনীতাল ঘুরে আসেন।

মিস ভরদ্বাজ অবশ্য এখনও বিদেশী ইউনিভার্সিটির সামার কোর্সে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাবার মত হতে পারেন নি। তবে—। যাক গে সেসব।

কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, কখনও আবার কিছু না বলেই মিস ভরদ্বাজ তরুণের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করলেন।

'কি ব্যাপার?' তরুণ মিস ভরদ্বাজকে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে প্রশ্ন করে।

'কেন, ডিসটার্ব করলাম নাকি?'

'মাই গড! ব্যাচিলার তরুণ মিত্রের ফ্ল্যাটে আপনার মত অতিথির বিশেষ আগমন হয় না তো, তাই…।'

'সো হোয়াট?'

তরুণ মিস ভরদ্বাজকে অভ্যর্থনা করে ড্রইংরুমে বসায়। গাড়োয়ালী ভৃত্যকে কফি দিতে বলে।

তরুণের ধারণা দিল্লীর মেয়ে আর মাছির চাইতে অসভ্য কিছু হতে পারে না। এরা যে কোথা থেকে কিসের জীবাণু-বীজাণু এনে ছড়িয়ে দেবে, তা কেউ টের পাবে না। মিস ভরদ্বাজ নিবিড়ভাবে মিশতে চাইলেও তরুণ পারে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে। মামুলি কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টা আর কফির পরই ইতি টানতে চায় সে। 'এক্সকিউজ মী মিস ভরদ্বাজ, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে…। সী ইউ এগেন।'

মিস ভরদ্বাজ তবু তরুণের আশেপাশে ভনভন করতে ছাড়ে না। সময় সুযোগ পেলেই হাজির হয়। এমনি করেই একদিন থলি থেকে বেড়ালছানা বেরিয়ে পড়ে।

'আই ওয়াজ টয়িং উইথ দি আইডিয়া অফ গোয়িং টু দি স্টেটস।'

তরুণ খুশী হয়ে বলে, 'আমেরিকা যাবেন? খুব ভাল কথা।'

'কিন্তু....।'

'কিন্তু আবার কি?'

'ইউ মাস্ট হেল্‌প মী'

'বলুন না কি সাহায্য করতে হবে?'

'ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনে একটা টেম্পোরারী অ্যাপয়েন্টমেন্ট...।'

'আই অ্যাম সরি মিস ভরদ্বাজ, ও তো আমার ক্ষমতার বাইরে। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া আবার কি?'

তরুণ মিত্র মিস ভরদ্বাজকে খুশী করেনি। কিন্তু বছর খানেক পরেই এই অনন্যার দেখা পেয়েছিল নিউইয়র্কে।...

তরুণের ভারী মজা লাগে দিল্লীর কথা ভাবতে। আজকের মত তখন কার্জন রোডে এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স হস্টেল, আশেপাশের এম-পিদের বাংলোগুলোকে উপহাস করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। কার্জন রোডের নোংরা স্যাঁতসেঁতে ব্যারাক কনস্টিটিউশন হাউস নাম নিয়ে তখন আভিজাত্যের বড়াই করত। হরেক-রকমের নারী-পুরুষের, বাস ছিল এই কনস্টিটিউশন হাউসে। রাত দশটা সাড়ে দশটায় ডাইনিং হলের সার্ভিস বন্ধ হতো কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃতরসধারা পানের উৎসব শুরু হতো তার পরে। সাধারণ মানুষের আসা-যাওয়ার পালা বন্ধ হতো, শুরু হতো অস্বাভাবিক অসাধারণের আবির্ভাবের পর্ব। সামনের রিসেপশন কাউণ্টার এড়িয়ে ওঁরা যাতায়াত করতেন মাঝরাতের আবছা আলোয়। ঐ রাতের অন্ধকারে কতজনের সৌভাগ্যসূর্য উঠত, আবার অস্ত যেতো।

চেক ন্যাশনাল ডে'র পার্টি অ্যাটেণ্ড করে মিঃ ভোঁসলের বাড়ীতে ডিনার খেয়ে ফিরতে ফিরতে তরুণের অনেক রাত হয়ে গেল। কনস্টিটিউশন হাউসের বড় বড় আলোগুলো তখন নিভে গেছে, ফাঁকা দিল্লী শহরটা প্রায় গ্রামের মত নিঝুম হয়ে পড়েছে। আবছা

আলোতে ঘরের চাবিটা দেখবার সময় স্ফুলিঙ্গের মত এক টুকরো হাসির ঝলক তরুণের কানে আসতেই—

মিস ভরদ্বাজ বললেন, 'দাউ টু ব্রুটাস !'

'তার মানে ?'

'এত সহজ কথাটা বুঝলেন না ?'

'আই অ্যাম সরি মিস ভরদ্বাজ।'

ঐ আবছা আলোতেই মিস ভরদ্বাজের বিদ্রূপ হাসি ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের দৃষ্টি এড়াল না। করিডরেব পিলারটায় হেলান দিয়ে মিস ভরদ্বাজ বললেন, 'আপনিও তাহলে মাঝরাতের খদ্দের।'

মিথ্যা তর্ক করে সময় নষ্ট করে না তরুণ মিত্র। 'একটু ভুল হলো মিস ভরদ্বাজ। আপনার মত আমি মাঝরাতের খদ্দের নই, আমি দোকানদার। খদ্দের আসে কিন্তু ফিরিয়ে দিই···। আচ্ছা, গুড নাইট!'

সে রাত্রে তরুণ মিত্র আর কিছু জানতে পারেননি, কিন্তু স্থির জানতেন মিস ভরদ্বাজ আমেরিকা যাবেনই।

কি করবেন মিস ভরদ্বাজ! শেরওয়ানী-চাপকান পরা পলিটিসিয়ানগুলো যেন এক-একটা নেকড়ে বাঘ। শিকার ধরতে এদের জুড়ি বোধকরি ভূ-ভারতে নেই। জর্ডনের জল না হলে যেমন খৃষ্টানদের কোন শুভ কাজ হয় না, আমাদের দেশেও তেমনি পলিটিসিয়ান না হলে কোন কর্ম বা অপকর্ম সম্ভব নয়। একজিবিশন ওপন করতে এসে বনবিহারীলাল মিস ভরদ্বাজের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এই ওয়াণ্ডারফুল ডেকরেশন করেছে এই সুইট ছোট্ট মেয়েটা!'

বাহাদুর শার পর বিহারীলালই দিল্লীর সর্বময় অধীশ্বর হয়েছেন। তাঁর এই প্রশংসায় জেনারেল সেক্রেটারী মিসেস খাতুম পর্যন্ত গলে গেলেন, 'হাঁ জী, এহি লেড়কী আকেলা সব কুছ···'

সেই হলো শুরু। শেষ? সেকথা তরুণ মিত্র জানে না। যে

দেশে বাঈজীবাড়ী আর ধর্মশালা প্রায় সমান সমান, সে দেশের পবিত্র মাটিতে মিস ভরদ্বাজের কাহিনী যে কোথায় শেষ তা সে জানে না। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মনে মনে ভাবে ডিপ্লোম্যাসী রপ্ত করবার জন্য পয়সা খরচা করে জেনেভায় যাবার কোন অর্থ হয়? দেশের অসংখ্য মেয়েগুলোর সর্বনাশ করেও যাঁরা দেশনেতা বলে পূজ্য, বেবী ফুডে ভেজাল দেবার পরও যাঁরা ধর্মশালা গড়ে হাততালি আদায় করতে পারেন, তাঁদের চাইতে বড় ডিপ্লোম্যাট আর কোন দেশে পাওয়া সম্ভব!

দুই

ইউরোপের সবচাইতে গরীব দেশ পর্তুগালে আইন আছে, রাজধানী লিসবনে সবাইকে জুতো পরতে হবে। পয়সা কোথায়? লিসবনে হাজার হাজার মানুষের জুতো কেনার সামর্থ্য নেই। তবুও জুতোর মতই একটা কিছু পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই হতভাগ্য মানুষের দল। দূর থেকে পুলিশ দেখলেই পরে নেবে। আবার পুলিশ একটু দূরে চলে গেলেই খুলে পকেটে রেখে দেয়।

চোখ মেলে চারদিক দেখলেই এসব দেখা যায়, জানা যায়। টুরিস্টদের মত শুধু বাহ্যিক চোখের দেখাই ডিপ্লোম্যাটদের কাজ নয়। আরো অনেক কিছু দেখতে হয়, জানতে হয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। দশটা-পাঁচটার চাকরি করলে ডেপুটি সেক্রেটারীর দায়িত্ব শেষ হয়, কিন্তু কেনসিংটনে বা ফিফথ্ অ্যাভিনিউতে ককটেল পার্টিতে গিয়ে ছ' পেগ আট পেগ হুইস্কী খাবার পরও ডিপ্লোম্যাটকে সতর্ক থাকতে হয় গোপনে খবর জানার জন্য। হাজার হোক ডিপ্লোম্যাটরা মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বীকৃত গুপ্তচর ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্রেণ্ডশিপ, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং শুধু বুকনি

মাত্র। ক্লোজ কালচারাল টাইস্ তেল দিয়ে খবর যোগাড় করার কায়দা মাত্র। অন্যান্য দেশের মতি-গতি বুঝে নিজের দেশের সুবিধা করে দেওয়া অর্থাৎ স্বার্থরক্ষাই ডিপ্লোম্যাসীর একমাত্র ধর্ম। এসব কথা সারা পৃথিবীর সমস্ত ডিপ্লোম্যাটরা জানেন। ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরাও জানেন।

সব জেনেশুনেও চলেছে এই লুকোচুরি খেলা। এক-এক দেশে এক-এক রকমের লুকোচুরি খেলা চলে। মস্কো বা ওয়াশিংটনের যে কোন ডিপ্লোম্যাটিক মিশনে যান। দেখবেন, কেউ কোন ঘরে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন না। বাইরে বরফ পড়ছে, তবু পরোয়া নেই। ভেতরের গার্ডেনেই কথাবার্তা হবে। কেন? কেন আবার, জুজুর ভয়। কোথা দিয়ে কে সব কিছু টেপ রেকর্ড করে নেয়! আজকাল তো পয়সা দিলেই ওয়াচ রেকর্ডার পাওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাটদের পিছনে টিকটিকি ঘোরাঘুরি করেই। টেলিফোনে কথাবার্তা নিরাপদ নয়। বড় বড় দেশের অনেক সামর্থ্য, কত কিছুই তারা করতে পারে। কিন্তু ঐ ছোট্ট দেশ আফগানিস্থান! এমনই জুজুর ভয় যে কাবুলে সব ডিপ্লোম্যাটকেই টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখতে দেখা যাবে।

আরো কত কি আছে! তবুও এরই মধ্যে হাসিমুখে কাজ করে যান ডিপ্লোম্যাটরা। সুন্দরী যুবতী আর মদের প্রতি পৃথিবীর প্রায় সবদেশের মানুষেরই দুর্বলতা। বিশেষ করে উপঢৌকন হিসেবে, সৌজন্য হিসেবে যখন এসব আসে, তখন অনেক মানুষই লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। মদ বা মেয়েদের বর্জন করে ডিপ্লোম্যাসী করা অনেকটা কলের জলে কালীপূজা করার মত। কাজকর্মের তাগিদেই রোজ সন্ধ্যায় ডিপ্লোম্যাটদের, ককটেল—লাউঞ্জ স্যুট পরে মদ খেতে হয়, মেয়েদের সঙ্গে নাচতে হয়, খেলতে হয়, হাসতে হয়। বারুদ নিয়ে খেলা করলেও বারুদের আগুনে পুড়তে পারেন না ডিপ্লোম্যাটরা। আরো অনেক সতর্কতা দরকার।

পুলিশ সুপারিন্টেনডেণ্ট বা সিভিল সাপ্লাই অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঘুষ খেলে ক্ষতি হয় কিন্তু দেশ রসাতলে যায় না। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের থার্ড সেক্রেটারী বা একজন অতিসাধারণ অ্যাটাচি ঘুষ খেলে দেশের মহা সর্বনাশ হতে পারে। এভাবে বহু দেশের বহু সর্বনাশ হয়েছে, ভবিষ্যতেও নিশ্চয় হবে।

বড় বড় দেশের তুলনায় ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের মাইনে অ্যালাউন্স অনেক কম। তবুও সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেলামেশা করতে হয় ওঁদের। চারিদিক থেকে প্রলোভন কম আসে না।

ইউনাইটেড নেশনস্-এর করিডরে বা ক্যাফেতে মাঝে মাঝে দেখা হতো দু'জনের। 'হাউ ডু ইউ ডু,' 'ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ' পর্যায়েই পরিচয়টা সীমাবদ্ধ ছিল। কদাচিৎ কখনও ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে দেখা হতো, সামান্য কথাবার্তা হতো। এর বেশী নয়।

কিছুকাল পরে আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্টের আমন্ত্রণে যশস্বিনী ভারতীয় নর্তকী কুমারী পদ্মাবতী আমেরিকা ভ্রমণ শেষে এলেন নিউইয়র্ক। ইণ্ডিয়ান মিশনের উদ্যোগে ও নিউইয়র্ক সিটি সেণ্টারের ব্যবস্থাপনায় এই যশস্বিনী নর্তকীর নাচ দেখাবার ব্যবস্থা হলো।

পরের দিনই ভদ্রলোক ইউনাইটেড নেশনস্-এ মিঃ নন্দাকে ধরলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিউজিক, ইণ্ডিয়ান ডান্স আমার ভীষণ ভাল লাগে। যদি কাইণ্ডলি মিস পদ্মাবতীর প্রোগ্রাম দেখার···।'

মিঃ নন্দা বললেন, 'নিশ্চয়ই। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত করে বলবার কী আছে?'

ভাল করে আলাপ পরিচয়ের সেই হলো সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঘনঘটা দেখা দিল। একটা আমেরিকান প্লেন ইউনাইটেড নেশনস্-এর ডিউটি দেবার সময় উত্তর কোরিয়ার আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেল চীনাদের গুলি

খাবার পর। আরোহী ও বিমান-চালকদের সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। প্রায় একবছর পর খবর পাওয়া গেল এগারো জন বিমান-চালক ও তাঁদের সঙ্গীরা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

শুরু হ'লো মারাত্মক স্নায়ুযুদ্ধ। আশঙ্কা দেখা দিল বিশ্ব-যুদ্ধের। ইউনাইটেড নেশনস্-এ ঝড় বইতে লাগল।

এমন সময় ইউ-এন ক্যাফেতে নন্দার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা।

'আপনি বলেছিলেন আপনার কাছে সীটারের অনেক রেকর্ড আছে…।'

'হ্যাঁ, আছে।'

বেশী কিছু নয়, সামান্য টেপ করার অনুমতি চাইলেন। অনুরোধটা ঠিক পছন্দ না করলেও ভদ্রতার খাতিরে না বলতে পারলেন না মিঃ নন্দা। বললেন, 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তবে ক'দিন একটু ব্যস্ত…।'

'কারেন্ট ক্রাইসিস নিয়ে ব্যস্ত বুঝি?'

যাই হোক ক'দিন পর ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই টেপ রেকর্ডার নিয়ে নন্দার ফিফটি সিক্স স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে হাজির হলেন। ডাইরেক্ট রেকর্ডিং চ্যানেলে টেপ রেকর্ডারটা ফিট করে খোস-গল্প শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ আজে-বাজে কথাবার্তা বলার পর এলো সেই প্রশ্ন, 'এতবড় ক্রাইসিসে আপনারা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই?'

নন্দা বললো, 'আর সবার মত আমরাও চিন্তিত।'

'দ্যাটস্ ট্রু, বাট ইণ্ডিয়ার তো একটা স্পেশ্যাল পজিশন আছে। বোথ আমেরিকা আর চীনের বন্ধু হচ্ছে একমাত্র ইণ্ডিয়া।'

'আরো অনেক দেশ আছে।'

'তবুও…।'

'ওয়ার্লড ওয়ার হলে আমাদের এরিয়ার অনেক দেশের ক্ষতি হবে। তাই আমরা চাই ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যাক।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ইউ আর পারফেক্টলি রাইট মিস্টার নন্ডা। আমি সিওর তোমরা চুপচাপ বসে থাকবে না। তাই না?'

উদাসীন ভাবে মিঃ নন্দা উত্তর দিলেন, 'জানি না। আমার মত চুনোপুঁটি ডিপ্লোম্যাট কি এসব খবর জানতে পারে?'

নন্দা যে ইণ্ডিয়ান মিশনের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করছিলেন, এ খবর ভদ্রলোক নিশ্চয়ই জানতেন। তা না হলে ওদের মিশনের পার্টিতে নন্দাকে এতবার করে যাবার কথা কেউ বলতো না এবং ভদ্রলোকও 'সীটার' রেকর্ড করার জন্য ওর ফ্ল্যাটে যেতেন না।

অবস্থা আরো জটিল হলো। ওয়াশিংটনের হুমকি আর পিকিংয়ের অবজ্ঞা চলল সমান তালে। তাড়াহুড়ো করে আমেরিকা ফরমোজার সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করল, মার্কিন নৌবহরের সেভেনথ ফ্লীট চীনের চারপাশে মহড়া দিতে শুরু করল। তবুও চীন বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বার-বার বললো, 'হুঁশিয়ার আমেরিকা।'

ডালেস-ম্যাকার্থীর মতবাদের জোর যখন কমতে শুরু করেছে ঠিক তখন এই আন্তর্জাতিক ঘন-ঘটায় আমেরিকা আবার ক্ষেপে উঠল। ভারতবর্ষ সত্যি চিন্তিত হলো। এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত বলে দুনিয়ার খবরের কাগজে খবর ছাপা হলো। অনেকেই আশা করছিলেন ইউনাইটেড নেশনস্-এ ভারত কিছু করবে ও পিকিং-এর সঙ্গে দিল্লীর নিশ্চয়ই কথাবার্তা হয়েছে।

মিসিসিপি-ইয়াংসী নদীর জল আরো গড়াল। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশীল্ড গেলেন পিকিং। জানুয়ারী মাসের প্রাণান্তকর শীতের মধ্যেও হাসিমুখে চীনা নেতাদের

সঙ্গে দিনের পর দিন কথাবার্তা বললেন। এক ফাঁকে ছ' মাইল দূরে দুঃসাহসিকা মহারাণীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক 'সামার প্যালেস' দেখলেন। এই প্যালেসের পাশে ঐ সুন্দর লেকের স্বচ্ছ জলে হ্যামারশীল্ড হয়ত নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখার অবকাশ পাননি। যদি সে প্রতিবিম্ব দেখতে পেতেন তবে নিশ্চয়ই অন্তরের অস্থিরতা বুঝতে পারতেন। সেক্রেটারী জেনারেল শূন্য হাতেই ফিরে গেলেন নিউইয়র্ক। তবে কেউ কেউ বললেন, আশা পেয়েছেন। আমেরিকাকে আর একটু শিক্ষা দিয়ে চীনারা ঐ আটক বিমানচালকদের মুক্তি দেবে।

এবার সারা পৃথিবীর দৃষ্টি পড়ল দিল্লীর উপর।

ঠিক এমন সময় নন্দা বদলী হলেন আমাদের হংকং মিশনে। 'সীটাব' প্রেমিকেব মত কিছু ডিপ্লোম্যাট অনুমান করলো, স্পেশ্যাল অ্যাসাইনমেণ্টে নন্দা হংকং যাচ্ছে।

সহকর্মীদের সহযোগিতায় ঘর-বাড়ী দেখে সংসার পাতার আগে নন্দা কয়েকদিনেব জন্য হোটেলে আশ্রয় নিলেন। মান্দারিন বা হংকং হিলটনে থাকার মত ট্যাকের জোর কোন ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটেরই নেই। নন্দারও ছিল না। তাইতো তিনি আশ্রয় নিলেন উইনার হাউসে।

পর পর কদিন রাত্রে ডিনার খাবার সময় পাশের টেবিলে এক ভদ্রলোককে দেখেই নন্দার সন্দেহ হলো। পরে ইণ্ডিয়ান মিশনের এক সহকর্মীর সঙ্গে কাম্ লিঙ্ ক্যান্টনিজ রেস্টুরেণ্টে গিয়েও এক কোণায় ডাইনিং হলের ঐ ভদ্রলোককে দেখল। আবার একদিন উইনধাম স্ট্রীটে মার্কেটিং করার সময় মহাপ্রভুর পুনর্দর্শন হওয়ায় নন্দার আর সন্দেহ রইল না।

নন্দা সতর্ক হয়ে গেলেও বুঝতে দিল না। মিশনের দু' একজনকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখল। তারপর একদিন ডিনার টেবিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো।

'তোমাদের ইণ্ডিয়ার মত চার্মিং ও ফ্রি সোসাইটির কোন তুলনা হয় না।'

'মেনী থ্যাঙ্কস্ ফর দি কমপ্লিমেণ্টস্।'

'সত্যি বলছি ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেড চালাতে গিয়ে কত দেশই ঘুরলাম কিন্তু ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্ডিয়া।'

চিকেন-ফ্রায়েড রাইস আর পোর্ক শেষ করে কফির পেয়ালায় হাত দিতেই রাজনীতি এসে গেল।

'আই অ্যাম সিওর ইণ্টারন্যাশনাল আফেয়ার্সে ইণ্ডিয়া ইউনিক রোল প্লে করবে।'

নন্দা ছোট্ট উত্তর দেয়, 'আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আজকাল সব দেশই···।'

দিন কয়েকের মধ্যেই দু'জনের আলাপ বেশ জমে উঠল ও একই সময় ডিনার খাওয়া শুরু হলো।

একদিন ভদ্রলোক যেন একটু তাড়াহুড়ো করে কফির পেয়লায় চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন। 'এক্সকিউজ মী, সিঙ্গাপুর থেকে একটা টেলিফোন আসার কথা।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নন্দার খেয়াল হলো ভদ্রলোকের সিগারেট, লাইটার আর পার্স ডিনার টেবিলে পড়ে আছে। কফি খাওয়া শেষ করে নন্দা তিনটিই হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের ঘরে গিয়ে ফেরত দিল।

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্! পার্সে অনেকগুলো ডলার আছে। অন্য কোথাও ফেললে আর উপায় ছিল না।'

নন্দা জানত, দিল্লী থেকে পিকিং-এ ও পিকিং থেকে দিল্লীগামী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের দেখাশুনা ও লেনদেনের দায়িত্ব যে কূটনীতিবিদদের উপর থাকবে, তাঁকে এমন টোপ অনেকেই গেলাতে চাইবে।

প্রলোভন কি শুধু বাইরে থেকে আসে? বিদেশ-বিভূঁইতে সব

মানুষেরই কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দেয়। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। পটুয়াটোলার গিরীশবাবুর মত লোকও পূজার ছুটিতে সপরিবারে বেনারস বেড়াতে গেলে দু'-একদিন গান-বাজনা শোনার জন্য রাত করে ধর্মশালায় ফিরলে তাতে কেউ কিচ্ছু মনে করত না। কারুর বা আহার-বিহারের তীব্র শাসনে শৈথিল্য দেখা যায়। কলকাতায় যারা চা-সিগারেট খায় না, তারাই বিলেতে গিয়ে বাঁদরের মত মদ গেলে। পরিচিত সমাজজীবন থেকে মুক্তি পেলে সব মানুষই বেশ একটু পাল্টে যায়। প্রথম প্রথম ফরেন পোস্টিং পেলে অনেক ডিপ্লোম্যাট আত্ম-গরিমায় বিভোর হয়ে পড়ে, শৈথিল্য দেখা দেয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে। শৈথিল্য দেখা দেয় আরো অনেক কারণে। তবে সুন্দরী যুবতীর খপ্পরে পড়লে কথাই নেই।

'মে আই কাম ইন ?'

দরজা একটু ফাঁক করে একজন ছিপছিপে সুন্দরী ভারতীয় মেয়ে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রশ্ন করতে চমকে গেল থার্ড সেক্রেটারী সেনগুপ্ত। মুহূর্তের জন্য মনের মধ্য দিয়ে একটা আনন্দ তরঙ্গের ঢেউ খেলে গেল।

একঝলক দেখে নিয়ে সেনগুপ্ত উত্তর দিল, 'ইয়েস প্লিজ।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে হাত থেকে বড় ট্রাভেলিং ব্যাগটা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল, 'এক্সকিউজ মী, আর ইউ মিঃ সেনগুপ্তা ?'

'দ্যাটস্ রাইট।'

এবার পরিষ্কার বাংলায়, 'নমস্কার।'

সেনগুপ্ত চেয়ারে বসে রইল কিন্তু মনটা আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল। ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললেন, 'নমস্কার।'

মেয়েটি একটু হাসল। বললেন, 'বসতে পারি ?'

সৌজন্য দেখাতে ত্রুটি হবার জন্য লজ্জিত হলো ডিপ্লোম্যাট সেনগুপ্ত। 'আই অ্যাম সরী, বসুন, বসুন।'

ইউরোপে এই হচ্ছে সেনগুপ্তের প্রথম পোস্টিং। রেঙ্গুনে থাকার

সময় ভারতীয়দের সান্নিধ্য-লাভ এত দুর্লভ ছিল না কিন্তু বেলজিয়ামে এই একটা বছর ভারতীয় সান্নিধ্য লাভ প্রায় একেবারেই হয়নি। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা ভারতীয় দেখলে বিরক্ত হন। ব্রাসেলস্, দি হেগ বা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার অন্যত্র যাঁদের চাকরি করতে হয়, তাঁরা ভারতীয় দেখলে খুশী হন। বাঙালী বা বাংলা কথা জানা লোক তো দূরের কথা! বেলজিয়ামের স্পেশ্যাল স্টিল কেনার জন্য যে ডেলিগেশন এসেছিল তাতে একজন বাঙালী ছিলেন। ব্রাসেলস্-এর ইণ্ডিয়ান এম্বাসিতে কাজ করতে গিয়ে আর কোন বাঙালীর সাক্ষাৎ পায়নি সেনগুপ্ত। বহুদিন বাদে একজন বাঙালী মেয়ের আবির্ভাবে সেনগুপ্ত সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করল।

'কতদিন পর বাংলা কথা বললাম জানেন?'

সেনগুপ্তের সাধারণ বুদ্ধির জোরেই একথা জানা উচিত ছিল যে এ প্রশ্নের উত্তর সদ্য পরিচিত মেয়েটির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবুও।

'অনেকদিন পর?'

'অ্যাট-লিস্ট ছ'-মাস হবে।'

'কেন, ব্রাসেলস্-এ বাঙালী নেই?'

'শুনেছি কয়েকজন আছেন, তবে এখনও কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি,' আক্ষেপ করে সেনগুপ্ত জানাল।

সেই হলো শুরু। তারপর! অসংখ্য ভারতীয় যুবক-যুবতীর মত চিত্রলেখা সরকারও পড়াশুনা করার আশায় লণ্ডন গিয়ে শেষ পর্যন্ত চাকরি নিল। দেখতে দেখতে বছর তিনেক কেটে গেছে লণ্ডনে। গত বছর একদল ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'কোচে' করে কন্টিনেন্ট ঘুরেছে কিন্তু ঠিক মন ভরেনি। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী দেখেই ফিরে গিয়েছে। তাছাড়া এমন গ্রুপে নানা ধরনের বিচিত্র ছেলেমেয়ে থাকেই এবং দু'-চারজনের ব্যবহার সহ্য করাই দায়।

বিশেষ করে মিউনিকে বেভেরিয়ান ফোক্ ডান্স দেখতে গিয়ে প্রদীপ সরকার, বড়াল ও রায়চৌধুরীর··· ।

'বিশ্বাস করুন মিঃ সেনগুপ্ত, ওদের ঐ বড় বড় জাগে করে দু'-তিনবার বিয়ার খাবার পর এমন বিশ্রী অসভ্যতা শুরু করল যে কি বলব।'

হাসতে হাসতে এক গাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সেনগুপ্ত বললো, 'আপনাদের মত ইয়ং অ্যাণ্ড অ্যাট্রেকটিভ মেয়েরা সঙ্গে থাকলে বেভেরিয়াতে গিয়েও ছেলেরা একটু মাতামাতি করবে না?'

সিগারেটের ধোঁয়া গোল গোল পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নটরাজন ঘরে ঢুকে সেনগুপ্তকে একটা চিঠি দিয়ে বললো, 'হিয়ার ইজ এ ক্লোজড লেটার ফর ইউ।'

'ক্লোজড লেটার বাট কাণ্ট এক্সপোজ এনিথিং' হাসতে হাসতে পাল্টা জবাব দেয় সেনগুপ্ত।

নটরাজন কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, 'অ্যাম্বাসেডর কাল এগারোটায় আমাদের মিট করছেন, জান তো?'

'জানি।'

নটরাজন বিদায় নিল।

চিত্রলেখা বললো, 'একটু সাহায্যের জন্য এম্বাসীতে এসে আপনার নেমপ্লেট দেখে ঢুকে পড়লাম।'

'বলুন না কি করতে হবে?'

'আমার এক পুরনো বন্ধুকে স্টেশনে এক্সপেক্ট করেছিলাম কিন্তু আসেনি। স্টেশন থেকে টেলিফোন করে জানলাম ও আর ওখানে নেই। অথচ····।'

'নতুন ঠিকানাও জানা নেই, এবং যদি এম্বাসীতে লোক্যাল ইণ্ডিয়ানদের ঠিকানা থাকে, তাহলে?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।' স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে চিত্রলেখার।

'আই অ্যাম প্লিজড্ টু ইনফর্ম ইউ মিস সরকার, ইণ্ডিয়ান

এম্বাসীতে সব খবর পাওয়া যায়, শুধু ইণ্ডিয়া আর ইণ্ডিয়ানদের বিষয় ছাড়া।' চরম সত্যি কথাটা হাসতে হাসতে বললো সেনগুপ্ত।

মিস সরকার কত আশা নিয়ে এসেছিলেন এম্বাসীতে কিন্তু এমন মর্মান্তিক হুঃসংবাদ এত সহজে জানতে পারবেন, ভাবতে পারেননি। বেশ মুষড়ে পড়লেন। মুষড়ে পড়বারই কথা। সারা বছর পরিশ্রম করে মাত্র হু'সপ্তাহের ছুটি। সামান্য সঞ্চয় নিয়ে মিস সরকারের মত অনেকেই বেরিয়ে পড়েন দেশ দেখতে। এদের পক্ষে হোটেলে বা মটেলে থাকা অসম্ভব। সেনগুপ্ত সেসব জানে। একটু ভাবল, একটু দ্বিধা করল। হয়ত মনে মনে একটু বিচারও করল।

সেনগুপ্ত বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রস্তাব করতাম।'

'না, না, মনে কি করব।'

'যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন। কোন অসম্মান বা অসুবিধা হবে না।'

সেনগুপ্তের কথাটা শেষ হবার আগেই মিস সরকার বললেন, 'তা তো আমি বলছি না, তবে···!'

হাসতে হাসতে সেনগুপ্ত বললো, 'জাগ্‌ জাগ্‌ বেভেরিয়ান বিয়ার খেয়ে বেভেরিয়ান ফোক্‌ ডান্স দেখাব না। তবে আমার হাতের রান্না খেতে হবে।'

কলকাতা শহরে এমন প্রস্তাব করা বা গ্রহণ করা শুধু অন্যায় নয়, অসম্ভবও। কিন্তু ব্রাসেলস্‌ শহরে এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সহজ নয়। তাছাড়া বছর তিনেক বিদেশ বাস করার পর আমাদের দেশের মেয়েদেরও পুরুষের সঙ্গে মিশতে অ্যালার্জি হয় না।

চিত্রলেখা মিঃ সেনগুপ্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল রান্না করা নিয়ে। চিত্রলেখা বললো, 'আমি থাকতে আপনি রান্না করবেন? অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।'

'দু'-একদিনের জন্য আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করায় আপনাকে খাটিয়ে নেব? অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।'

তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো কেউই রান্না করবে না, বাইরে রেস্তোরাঁয় খাওয়া হবে। চিত্রলেখা আর সেনগুপ্ত গ্রাণ্ড প্লেসে ঘুরে বেড়াল, অপূর্ব গথিক্ স্থপতি দেখল, টাউন হলের সিঁড়িতে বসে গল্প করল। ব্রাসেলস্-এর বিশ্ববিখ্যাত ওপন-এয়ার ফ্লাওয়ার মার্কেটে ঘুরল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর রেস্তোরাঁয় মহানন্দে বেলজিয়াম-বাসীদের প্রিয় হুইস্কী, সস্ দিয়ে গলদা চিংড়ি ও ওয়াটারজুই—চিকেনের ঝোল খেল।

ব্রাসেলস্ ত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় চিত্রলেখা নিজে হাতে রান্না করে সেনগুপ্তকে খাইয়েছিল। খাবার পর সেনগুপ্ত বলেছিল, 'কেন অভ্যাসটা নষ্ট করে দিলেন বলুন তো।'

চিত্রলেখা বলেছিল, 'আপনি কি আমার কম ক্ষতি করলেন?'

'তার মানে?'

'আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বিদেশ-বিভূইতে একলা একলা বেশ ছিলাম। এই আত্মীয়তা করে কেন আমার মনটাকে খারাপ করে দিলেন বলুন তো?'

আর সেনগুপ্তের? সত্যি, নিজের আত্মীয়-বন্ধু সমাজ-সংসার ছেড়ে একলা একলা বিদেশে-বাস যে কত মর্মান্তিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। দূর থেকে মনে হয় ডিপ্লোম্যাটরা কত সুখী। কত অফুরন্ত আনন্দের সুযোগ। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওদের কি ইচ্ছা করে না সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নায় ফেটে পড়তে? কত কি ইচ্ছা করে।

তাইতো দুটি দিনের কাহিনী দুটি দিনেই শেষ হলো না। দু'দিনের স্মৃতির সুর কানে বাজতে লাগল দু'জনেরই। ডিপ্লোম্যাটকে কতরকমের হঠকারিতা করতে হয় কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে

লুকোচুরি খেলা, হঠকারিতা করা যে কত বেদনার, কত দুঃসহ তা সেনগুপ্তের মত নিঃসঙ্গ ডিপ্লোম্যাট ছাড়া কেউ বুঝবে না।

হাজার হোক হিউম্যান মেটিরিয়্যাল, মানুষ নিয়েই ডিপ্লোম্যাট ও ডিপ্লোম্যাসী। তাইতো মাঝে মাঝে মনটা উড়ে যায় চান্সেরী বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে, ঘুরে বেড়ায় টুকরো টুকরো স্মৃতির রাজ্যে। চিত্রলেখার চিত্রকে ঘিরে।

তরুণ এসব জানে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে, আগ্নেয়গিরির আগুন যেমন সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ডিপ্লোম্যাটদেরও মনের দুঃখ, প্রাণের আক্ষেপ নজরে পড়ে না। স্মৃতির জ্বালায় দগ্ধ হবে কিন্তু কর্তব্যে ত্রুটি হলে ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই। হয়ত একটা গোপন খবর বেফাঁস বেরিয়ে যেতে পারে, একটা গোপন সংবাদ জানতে পেরেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে ভুলে যেতে পারে। হতে পারে অনেক কিছু, কিন্তু শিকার ফসকে গেলে ডিপ্লোম্যাটের ক্ষমা নেই।

। তিন ।

এর আগেও যখন কায়রো এয়ারপোর্টে কয়েক ঘণ্টা থেকে আবার বিদায় নিয়েছে, তখন তরুণ ভাবতে পারে নি পরের বার এমন পরিবর্তন দেখবে। এই কায়রো এয়ারপোর্ট? এত বড়, এত চমৎকার?

এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনটা কায়রো এয়ারপোর্টের দীর্ঘ রানওয়ে পার হতে হতেই তরুণ জানালা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে শুধু এয়ারপোর্ট টার্মিন্যাল বিল্ডিংটাই দেখছিল। বিস্ময় যত বেড়েছে টার্মিন্যাল বিল্ডিং তত কাছে এসেছে। সুন্দর স্যাণ্ডস্টোনের অপূর্ব আধুনিক বিল্ডিং। লম্বায় প্রায় এসপ্লানেড-ধর্মতলার মোড় থেকে পার্ক ষ্ট্রীট

হবে। স্ফিংকস-পিরামিডের দেশ যে এমন করে সারা ছুনিয়াকে চমকে দেবে, কেউ ভাবতে পারেনি।

ইতিহাসের কাছে ভাল-মন্দ বলে কিছু নেই। মানুষের আসা-যাওয়ার কাহিনী চিরন্তন। নিত্য ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয়। কায়রো রওনা হবার আগে তরুণ তিন-চার সপ্তাহ হিস্টোরিক্যাল ডিভিশনে কাজ করেছে। শুধু মিশর বা নাসেরের নয়, সারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে ইতিহাসের দ্রুত পট-পরিবর্তনে। ভূমধ্য সাগরের চারপাশে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চার আনা ঘটনা ঘটেছে। ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি ছাড়াও কত রাজা-উজীরের আবির্ভাব ও বিদায়, কত শত শক্তিশালী শক্তির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী এই শান্ত স্নিগ্ধ, সুন্দর ভূমধ্য সাগর। সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে, হয়নি শুধু মানুষের আর প্রকৃতির। আমাদের দেশে পচা ভাদ্দরের পর আশ্বিনের হাসি আর শিউলির খেলা দেখান প্রকৃতি, তেমনি লীলা আছে ভূমধ্য সাগরের চারপাশে। মৃত্যুর মত স্তব্ধ বালুকাময় অনন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের শেষ সীমায় ভূমধ্য সাগরের কোল ঘেঁষে পাওয়া যাবে মিষ্টি মাতাল হাওয়া, গাছে গাছে আছে ফল-ফুলের নিত্য সম্ভার। কেন, মানুষগুলো? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা তো ভূমধ্য সাগর বা নীল নদীর জলে খেলা করেছেন যুগে যুগে।

মরুভূমির দেশগুলো যেন কেমন হয়! মরুপ্রান্তরে কোন প্রাসাদই যেন চিরকালের জন্য নয়। শুধু পিরামিড আর প্রাণহীন মমিগুলোই যেন উত্তরকালের জন্য একমাত্র উপহার!

দিল্লীতে ব্রিফিং-এর সময় জয়েন সেক্রেটারী মিঃ রঙ্গস্বামী বলেছিলেন, অতীত জানবে কিন্তু অতীত দিয়ে বর্তমানকে বিচার করো না সব সময়। আলিবাবার চিচিং ফাঁক আর পাবে না মিডল ইস্টে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ঠিক মত বর্তমানকে জানাই ডিপ্লোম্যাটদের প্রধান কর্তব্য।

রঙ্গস্বামী আরও বলেছিলেন দেখ তরুণ, আমাদের মত ডিপ্লো-ম্যাটদের কাছে সব ভাল, কেউ খারাপ নয়। ইণ্ডিয়া তো বিগ পাওয়ার নয় যে নিজেদের ভাল-মন্দ অপরের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে! আলখাল্লা পরা আরবদের ভালবাসবে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা কোরো ওদের অতীত ইতিহাসকে।

হিস্টোরিক্যাল ডিভিশনের একজন ডেপুটি ডাইরেক্টার বলে-ছিলেন, সুয়েজ খাল শুধু পশ্চিমের সঙ্গে পূবের যোগসূত্র নয়, কায়রো হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম পীঠস্থান।

সত্যি তাই! ঐ বিরাট বিরাট পিরামিডগুলো যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সিংহদ্বার। নীল নদ পাড়ের ঐ বিরাট সিংহমূর্তি যেন পাশ্চাত্ত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে সতর্ক সংকেত। কিং ফারুকের ঐ বিরাট দেহটা যেন অচলায়তনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিল। তিন কোটি মানুষকে পশুর মত অবজ্ঞা করে মদির ছিলেন ক্লিওপেট্রার স্বপ্নে। নীল্ নদীর জল যে গড়িয়ে গড়িয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রাসাদের তলায় এসে পৌঁছেছিল, তা টের পান নি এই মুর্খ সম্রাট!

ইতিহাস বরদাস্ত করল না। যেমন বরদাস্ত করেনি নেপোলিয়ন বা মুসোলিনী বা হিটলারকে। মরুপ্রান্তরে ঝড় উঠল, অতীতের বেদুইনদের মত বালির তলায় হারিয়ে গেলেন সম্রাট ফারুক।

তরুণ মুগ্ধ হয়ে দেখেছে ইতিহাসের এই নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। যে তিন কোটি মানুষ একদিন অভুক্ত থেকেও পিঠে পাথর টেনে প্রাসাদের পর প্রাসাদ গড়েছে, তিলে তিলে মৃত্যুকে কাছে টেনে নিয়েছে, সভ্য পাশ্চাত্ত্যের কাছে যারা উপহাসের পাত্র ছিল, আজ তারাই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম নায়ক। নীল নদীর দেশের সুন্দরীদের নিয়ে যে পাশ্চাত্ত্যের মানুষ ছিনিমিনি খেলেছে যুগ যুগ ধরে, আজ তারাই মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের নায়িকা। ভাবলেও, দেখলেও ভাল লাগে। কায়রোয় গিয়ে বেলি ডান্স দেখাই যেন একমাত্র কাজ ছিল এই

অনাহুত অতিথিদের। আজ কায়রোর রাস্তায় সেই পশ্চিমীরাই নায়েব-গোমস্তার মত আরবদের মোসাহেবী করছে। দেশটাই শুধু স্বাধীন হয়নি অতীতের অত্যাচার অবিচার থেকে, মানুষগুলোও স্বাধীন হয়েছে। সভ্যতার আদিমতম সুপ্রভাত থেকে ইতিহাসের পাতায় পাতায় মিশরের উল্লেখ, কিন্তু মিশরের আরবরা এই প্রথম আত্মমর্যাদার স্বাদ পেল।

ইণ্ডিয়ার এম্বাসীর কন্‌সুলার অফিসের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাটাচি জোসেফ রসিকতা করে বলে, 'ভারতবর্ষ স্বাধীন কিন্তু ভারতবাসীরা পরাধীন!'

মজা করে বললেও কথাটা সত্যি। জোসেফ আবার বলে, 'লালকেল্লায় তেরঙ্গা চড়াবার পরই তো আমাদের দেশের মানুষ সাহেব-সুবাদের পূজা করতে শুরু করল।'

আর কায়রোয়? আলখাল্লা পরা আরবদের দেখলে সাহেবের দল রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবে। কলকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতেও অনেক দেশের ভাইস-কন্সালকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যাবে, আর কায়রোয় অমন অনুষ্ঠানের ইনভিটেশন পেলে অ্যাম্বাসেডরেব দল আনন্দে নাচতে থাকেন।

কায়বোকে কোনদিন ভুলবে না তরুণ। কাজ কবার এমন আনন্দ খুব বেশী দেশে পাওয়া যায় না। লণ্ডন-ওয়াশিংটন-প্যারিস-রোম বা টোকিওর ইণ্ডিয়ান মিশনে প্রথম পদক্ষেপেব সঙ্গে সঙ্গেই অভাবতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। কথায় কথায় নিজের দেশের মানুষকে অবজ্ঞা দেখানো একদল ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটের প্রায় ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেনসেলভিনিয়া অ্যাভিনিউর ইণ্ডিয়ান চান্সেরীতে সারা সপ্তাহে একজন আমেরিকানের আগমন হবে না, কিন্তু যে দু' চারজন ভারতীয় আসেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলার ফুরসৎ হয় না ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের। কায়রোর ইণ্ডিয়ান মিশনে কালো আদমীদেরই পূজা করা হয়।

জোসেফ বলত, 'অল গ্লোরি টু নাসের!'

ঐ আড্ডাখানায় কে হঠাৎ বলে উঠত, 'কেন?'

জোসেফ নাটকীয় ভঙ্গীতে চিৎকার করে উঠত, 'মাই ডিয়ার বেবিজ! তোমরা জান না, আমি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমাদের মিনিস্ট্রির ক্যান্টিন কমিটির সেক্রেটারী পর্যন্ত হতে পারিনি, আর আমাদের ডিয়ার ডার্লিং নাসের চৌত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী নাচিয়ে দিল!'

ডিয়ার ডার্লিং নাসেরই বটে। শুধু মিশরে নয়, সারা আরব তুনিয়ার যৌবনের প্রতিমূর্তি নাসের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারী-পুরুষের হৃদয়ে তাঁর আসন। পৃথিবীর অন্যতম ঘৃণিত মানুষদের সে যে সারা তুনিয়ার সামনে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তাই তো আরব দেশে কালা ভারতীয়দেরও মর্যাদা।

কায়রোর কূটনৈতিক জগতে ইণ্ডিয়ান মিশন সত্যি এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। বড় বড় দেশে ইণ্ডিয়ান মিশনকে থোড়াই কেয়ার করে! প্যাঁচে না পড়লে ইণ্ডিয়ার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। কায়রোয় তা নয়। সমস্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপারে নাসের ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করবেনই। আন্তর্জাতিক পরিবারের মধ্যে ভারত-মিশর পরমাত্মীয়।

কায়রোকে তরুণ ভুলতে পারে না আরো অনেক কারণে।

ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর একদল ডিপ্লোম্যাট ও তাঁদের স্ত্রীরা সেদিন দল বেঁধে 'কায়রো টাওয়ার' রিভলবিং রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গিয়েছিলেন। মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস কলহান, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস পুরি, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস সিং, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস মিশ্র, দিল্লীর নর্দার্ন টাইমসের স্পেশ্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং আরো তিন-চারজন মিলে মহানন্দে ডিনার খাওয়া হলো। স্টিমড মিট আর জোসেফের কমেণ্টারী—তুই-ই একসঙ্গে উপভোগ করলেন সবাই।

ডিনার খাওয়ার পর ইজিপসিয়ান ব্ল্যাক কফি খাবার সময় মিঃ পুরি কফির পেয়ালা তুলে প্রপোজ করলেন, 'আগামী জয়েন্ট ডিনারের আগে তরুণের বিয়ে করতেই হবে, নয়ত ..।'

জোসেফ ফোড়ন কাটল, 'নয়ত ইণ্ডিয়ান ফরেন পলিসি বরবাদ হবেই।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার পথে মিঃ কলহান হঠাৎ একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'হাউ আর ইউ হাসান?'

'ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার,' হাসান উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দেয়।

সৌজন্যমূলক তুটো একটা কথা বলার পর মিঃ কলহান জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসান, হ্যাভ ইউ মেট আওয়ার নিউ কলিগ মিত্র?'

'কই না তো।' বাঙালীর সঙ্গে দেখা করার লোভে হাসান টেবিল ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে বললো, 'উনি আছেন নাকি আপনাদের দলে?'

মিঃ কলহান আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুই বাঙালী এক হয়েছে, এবার তো তোমরা সারা তুনিয়া ভুলে যাবে। সো ক্যারি অন মাই বয়েস। গুড নাইট!'

ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে বাঙালী যেমন তুর্লভ, পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে বাঙালীর প্রাচুর্য ঠিক তত বেশী। এর কারণ অবশ্য পাকিস্তানের সামরিক একনায়কদের বাঙালী-প্রীতি নয়; বরং ঠিক তার উল্টোটাই সত্য। বাঙালী সিনিয়ব অফিসারদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা করাচি রাওলপিণ্ডির পাঠান বীরেবা খুব নিরাপদ মনে করেন না। সেজন্য পাকিস্তানের কৃষি, মৎস্য, পরিবার পরিকল্পনা বা রেডিওতে কিছু ছোট বড় বাঙালী অফিসার পাওয়া যাবে। সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি

সুপারিণ্টেনডেণ্টও বাঙালী হতে পারে কিন্তু তারপর খবরদার! জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা এস-পি বা হোম মিনিষ্ট্রির গোয়েন্দা বিভাগে বা দেশরক্ষা দপ্তরে? নো অ্যাডমিশন ফর ইস্ট পাকিস্তানিজ! তাইতো পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসে কিছু বাঙালীকে ভর্তি করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং করাচি রাওলপিণ্ডি স্ট্যাটিসটিক্স প্রচার করে বাঙালী-প্রীতির ঢাক বাজাচ্ছে।

যাই হোক, পাকিস্তান মিশনে বাঙালী দেখা যায়। চাকরির খাতিরে যাই করুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন বাঙালীকে কাছে পেলে এঁরা সারা দুনিয়া ভুলে যান। রাজনীতির চাইতে পদ্মার ইলিশ মাছের বিষয় আলোচনা করাই পাকিস্তানের বাঙালী ডিপ্লা-ম্যাটরা বেশী পছন্দ করেন। ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যে সব বাঙালী আছেন, তাঁরাও এঁদের পেলে আর কাউকে চান না। তরুণও চায় না। এইত রেঙ্গুনে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে কি আনন্দই করেছে।

সেও এক দুর্ঘটনা! রেঙ্গুন চিড়িয়াখানায় সেদিন লোকে লোকারণ্য। স্নেক-কিসিং—শঙ্খচুড় কোবরা সাপকে সাপুড়ে চুমু খাওয়াব খেলা দেখাবে বলে ভীষণ ভিড়। আমেরিকান টুরিস্টরা তো ভয়ের চোটে কাছেই এগুলো না। একদল বর্মী ছেলেমেয়ের সঙ্গে কিছু ভারতীয়, কিছু চীনা লোকই সামনের দিকে ভিড় করেছিল। সাপকে চুমু খাওয়ার খেলা দেখতে দেখতে আব্বাস-উদ্দীন মুগ্ধ হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই বাংলায় বলে উঠল, 'বাপরে বাপ!'

ব্যস! ঐ বাংলা শুনেই তরুণ আলাপ করেছিল আব্বাসের সঙ্গে। আলাপের শেষে 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ' বলেই তরুণকে ছেড়ে দেয়নি সে। হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ী নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে আম্মাজানকে জানিয়েছিল বাঙালী ধরে এনেছে।

ঐ প্রথম দিনের পর আম্মাজানের স্নেহের আকর্ষণে তরুণ নিজেই যেত। ছুটির দিনে তরুণকে রান্না করে খেতে হয়নি কোনদিন! আম্মাজানের কড়া হুকুম ছিল, 'ছুটির দিনেও যদি আমার এখানে খেতে না পার তবে আর আসতে হবে না। আমাকেও আম্মাজান বলে ডাকবে না, বুঝলে!'

তরুণ মুখে কিছু উত্তর দেয়নি, মুখ নীচু করে মুচকি হেসেছিল।

বেশ কেটেছে রেঙ্গুনের দিনগুলো। কখনও কিচেনের দোরগোড়ায় চেয়ার টেনে নিয়ে আম্মাজানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে, কখনও আবার আব্বাসের লুঙ্গি পরেই সোফায় শুয়ে শুয়ে টেপ রেকর্ডারে ভাটিয়ালী গান শুনেছে।

হাসান পরিবারের সঙ্গেও তরুণের হৃদ্যতা হতে সময় লাগল না।...

'দেশের কথা ব'লো না ভাই, শুনলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়,' প্রায় ছল ছল চোখে তরুণ হাসানকে বলতো।

মন খারাপ হবে না? ঢাকা-উয়াড়ীর অলিতে গলিতে যে ওর জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় স্মৃতি মিশে আছে। পোগোজ স্কুলে পড়া, পুরনো পল্টন, রমনা বা বুড়ীগঙ্গার পাড়ে বিকেলবেলা ঘুরে বেড়ান, খেলাধূলা করা, আড্ডা দেওয়ার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভাল লাগে না। লণ্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটনও ভাল লাগে না। নাইল হিলটনের ডিনার খাবার চাইতে মণি কাকিমার হাতের নারকেলের গঙ্গাজলি বা ঢাকাই পরটা অনেক অনেক বেশী ভাল লাগত।

হাসানের স্ত্রী রাবেয়া, কারমান্নেসা স্কুলের ছাত্রী। কারমান্নেসা স্কুলের কথা মনে হলেই যে মনে পড়ে যায় আরেক জনের কথা। মুহূর্তের মধ্যে মনটা যেন পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গার মত মাতলামী শুরু করে দিল।..

উয়াড়ীর রামকৃষ্ণ মিশন রোডের প্রায় মোড়ের মাথাতেই ছিল তরুণদের বাড়ী। বুড়োরা বলতেন, বরদা উকিলের বাড়ী। অল্প

বয়সীর দল বলতেন, কানাই উকিলের বাড়ী। তরুণের দাছু বরদাচরণ মিত্র সেকালের মস্ত নামজাদা উকিল ছিলেন। ফৌজদারী মামলায় ঢাকা-ময়মনসিংয়ে বরদা মিত্তিরের জুড়ী ছিল না কেউ। বড় বড় মামলায় চট্টগ্রাম-সিলেট থেকেও ডাক পড়ত।

বরদাচরণের সাধ ছিল তিন ছেলেকেই ওকালতি পড়ান। তা হয়নি। বড় তুই ছেলে কোর্ট-কাছাড়ীর ধার দিয়েও গেলেন না। বড় ছেলে পোস্টাফিসে ও মেজ ছেলে রেল কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। বরদা উকিলের সাধ পূর্ণ করলেন ছোট ছেলে কানাইবাবু। বাপের মত পসার বা নাম ডাক না হলেও উয়াড়ীর মধ্যে ইনিও বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

বাবা কানাইবাবুর মত তরুণও পড়ত পোগোজ স্কুলে, খেলত রমনার মাঠে। বাকি সময় কাটাত টিকাটুলির গুহবাড়ীতে। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণের মিষ্টি মধুর সোনালী দিনগুলিতে গুহবাড়ীই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে বলেই মানুষ পৃথিবীতে আছে, নয়ত কোথায় সে চলে যেত। প্রত্যেক মানুষের জীবনেও এমনি একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করে—যে শক্তি তাকে প্রেরণা দেয়, শক্তি জোগায়। যার জীবনে এই অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা নেই, সে মহাশূন্যে বিচরণ করে।

টিকাটুলির গুহবাড়ীর ইন্দ্রাণীকে ঘিরেই তরুণের জীবনের সব স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল। সে কাহিনী কেউ জানত, কেউ জানত না। কিন্তু ওরা তু'জনে জানত, বিধাতাপুরুষ ওদের বিচ্ছিন্ন করবেন না, করতে পারেন না। বুড়ীগঙ্গার জল শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু তরুণের জীবন থেকে ইন্দ্রাণী বিদায় নিতে পারে না বলেই সেদিন মনে হতো।

মনে তো! কত কিছুই হয়। ভেবেছিল কি অমন সর্বনাশা দাঙ্গায় সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? কোর্টে অতবড়

মামলায় জেতার পর তরুণের মার জন্য অমৃতি কিনে বাড়ী ফিরছিলেন কানাইবাবু। সে অমৃতি আর খাওয়া হলো না তরুণের মার। একটা ছোরার আঘাতে সব আনন্দ চিরকালের মত শেষ হলো তাঁর।

সারা ঢাকা শহরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কত সংসারে যে আগুন লাগল, তার ইয়ত্তা নেই। কত নিরপরাধ মানুষের রক্তে যে বুড়ীগঙ্গার জল লাল হলো, সে হিসাবও কেউ রাখল না।

বাবার মৃতদেহ কোনমতে দাহ করে বাড়ী ফিরে এসে ঐ লাইব্রেরী ঘরে পাথরের মত বসে রইল তরুণ। যখন হুঁশ হলো তখন সারা টিকাটুলি প্রায় শ্মশান হয়ে গেছে। পাগলের মত চীৎকার করে সারা টিকাটুলি ঘুরেও ইন্দ্রাণীর হদিশ পেল না তরুণ।......

টিকাটুলির শ্মশানের আগুন আজো তার মনের মধ্যে অহরহ জ্বলছে। মাকে হারাবার পর নিঃসঙ্গতা যখন বেড়েছে ইন্দ্রাণীর কথা তত বেশী মনে পড়েছে।

হাসানের স্ত্রী রাবেয়ার কথায় তাই তো তরুণ হারিয়ে ফেলে নিজেকে। হাজার হোক ডিপ্লোম্যাট। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'দিদি, ওসব কথা আর বলো না। তার চাইতে মাংসের গরম গরম পকোড়া খাওয়াও।'

পকোড়ার পর কফি খেতে খেতে হাসান বলে, 'রাবেয়া, অন্নদাশঙ্করের কবিতা পড়েছ?'

রাবেয়ার উত্তর পাবার আগেই হাসান আবার বলে—

'ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল
অ্যাণ্ড হাসান অ্যাণ্ড তরুণ......'

তরুণের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বললো, 'উঁহু! হলো না।'

হাসান জিজ্ঞাসা করল, 'হলো না আবার কি?'

'হবে—নজরুল অ্যাণ্ড রাবেয়া অ্যাণ্ড...'

রাবেয়া মুচকি হাসতে হাসতে হাসানাকে বললো, 'হেরে গেলে তো আমার ডিপ্লোম্যাট দাদার কাছে।'

হাসান আর হারতে পারে না। 'তুমি যদি অকে ডিপ্লোম্যাট কও, আমি হালা কমু।'

কি আনন্দেই কেটেছে কায়রোর দিনগুলো। রাজনৈতিক-কুটনৈতিক ক্ষেত্রে অহর্নিশি ইণ্ডিয়ান-পাকিস্তান এম্বাসীর লড়াই চলত। ভারতবর্ষে মুসলমান নির্যাতনের অলীক কাহিনী প্রচার করে পাকিস্তান এম্বাসী আরবদের মন জয় করার চেষ্টা করত। আর অতীতের পশ্চিমী আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আরবদের জয়যাত্রাকে প্রতি পদক্ষেপে স্বাগত জানাত ইণ্ডিয়ান এম্বাসী। বোম্বে থেকে জাহাজ বোঝাই করে হজযাত্রীরা মক্কা যান। অনেক স্পেশ্যাল প্লেনও যায় বোম্বে থেকে। ওমান উপসাগরের মুখে এমনি হজযাত্রী একটা ভারতীয় জাহাজের নজরে পড়ল দূরের একটা পাকিস্তানী কার্গো জাহাজ। কার্গোর ক্রেটগুলো দেখে সন্দেহ হয়েছিল ভারতীয় জাহাজের কয়েকজন অফিসারের। ক্যাপ্টেন একটা কোড মেসেজ রেডিও মারফত পাঠিয়ে দিলেন বোম্বে। কয়েকদিন পর কাবুল রেডিওর একটা ছোট্ট খবরে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো। ইতিমধ্যে আম্মান থেকে একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেসপ্যাচে জানা গেল কদিন আগে একটা ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে জর্ডন ফরেন মিনিষ্ট্রির একজন সিনিয়র অফিসার ইজরাইল-আরব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে মন্তব্য করেছেন যে বন্ধু মুস্লিম রাষ্ট্রও যদি ওদের হেল্প করে তাহলে কি করা যাবে? এই সব বিন্দু বিন্দু খবর যখন এক করা হলো তখন আর সন্দেহ রইল না। এসব খবর কায়রোর ইণ্ডিয়ান এম্বাসীতে পৌঁছতে দেরী হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব দেশে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে

গেল। পাকিস্তান ও পাক এম্বাসী কি ফাঁপরেই না পড়েছিল।

কায়রোয় ভারত-পাক এম্বাসীর মধ্যে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক মেঘ জমে উঠেছে, কখনও গর্জন—কখনও বর্ষণ হয়েছে, তখনও বেসুরো সুরে হাসান আর তরুণ গেয়েছে—

'আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালবাসি!

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে

ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে—

ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে

আমি কী দেখেছি মধুর হাসি...'

রাবেয়া পাশের ঘর থেকে প্রায় তেড়ে এসে বলেছে, 'এমন গর্দভ রাগিণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না...চল চল, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সিনেমায় যাবে না?'

আড্ডা দিতে দিতে হাসান আর তরুণের খেয়ালই ছিল না কায়রো প্যালেসের টিকিট কাটা আছে।

তিনজনে দল বেঁধে সিনেমায় গেছে, ওমর খৈয়ামে ডিনার খেয়েছে ও অনেক রাতে তিনজনে বাড়ী ফেরার পথেও অল তারির স্কোয়ারে বসে গল্প করেছে।

ভোলা যায় কি সেসব স্মৃতি? তরুণ ভুলতে পারে না কায়রোকে। ভুলবে কেমন করে? কারমান্নেসা স্কুলের ছাত্রীকে দেখেই তো মনের মধ্যে অতীত দিনের ঝড় উঠেছিল। ইন্দ্রাণীর স্মৃতির আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল এই কায়রোতেই।

। চার।

ভাইকাউন্টের চারটে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। পাখাগুলো বন-বন করে ঘুরতে শুরু করল। তারপর কোন ফাঁকে প্লেনটা পালামের মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করল। কাবুলের ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর সেকেণ্ড সেক্রেটারী-ডেজিগ্‌নেট তরুণ মিত্রের মনটাও হঠাৎ উড়তে শুরু করল অতীত আকাশের কোলে।...

সেই কোন সুদূর অতীতে আর্যরা এই পথ দিয়েই এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কোথা থেকে এসেছিলেন, কে জানে। কেউ বলেন, পামির থেকে, কেউ বলেন, মধ্য ইউরোপ বা জার্মানী থেকে। মানব সভ্যতার প্রায় আদিমতম সুপ্রভাতে আর্যরা আফগানিস্থানে বসেই লিখেছিলেন বেদ—ঋগ্‌ বেদ। কলকাতার রাস্তায় ঐ পাগড়ী পরা কাবুলীওয়ালাদের দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এঁদের ঘরের দাওয়ায় বসে আমাদের আর ওঁদের পূর্বপুরুষ লিখেছিলেন বেদ। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে আর্যদের কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী। সভ্য আর্যদের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করি আমরা কিন্তু বাইরের জগতে আর্য বলে প্রচার করতে কত কুণ্ঠা আমাদের। আর ঐ কাবুলীরা? মুসলমান আফগানরা? সারা দুনিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে বলেন ওরা আর্য। ওদের যেসব বিমান সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পরিচয়পত্রে বড় বড় হরফে লেখা আছে, আরিয়ানা আফগান এয়ারলাইন্স। কাবুলের সব চাইতে প্রাচীন সরকারী হোটেলের নাম, হোটেল আরিয়ানা।...

ভাইকাউন্টের ডিম্বাকৃতি বড় জানলা দিয়ে তরুণ আর একবার নীচের দিকে তাকায়। কত গিরি-পর্বত নদী-নালা মাঠ-ঘাট পেরিয়ে এই পথ দিয়েই এসেছেন ইতিহাসের কত অসংখ্য নায়ক।

আলেকজাণ্ডার, ইবন বতুয়া, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর, বাবর ও আরো কত কে। এসেছিলেন কনিষ্ক, এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজকের দল। মার্কো পোলো পর্যন্ত লিখে গেছেন এই পথের কথা। হিমালয়ের এই অলিগলি ডিঙিয়েই আফগানিস্থান থেকে ভগবান বুদ্ধের বাণী ছড়িয়েছিলেন চীনে, জাপানে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো কত দেশে।

উল্টো-পাল্টা, ছোট-বড়, শাদা-কালো মেঘের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ভাইকাউন্টটা। তরুণের চিন্তার ধারাটাও ওলট-পালট হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তাতে কি আসে যায়? তাতে কি ইতিহাসের গুরুত্ব কমে? নাকি কম রোমাঞ্চ লাগে? ইরাণের বিখ্যাত কবি তো বলে গেছেন, মা যি আঘায যি আনজাম-ই জাহান বে-খবর-ইম, আওয়াল-ও-আখের ই-ইন্ কুহনা কেতাব উফ্‌তাদ আস্ত। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিকথার প্রথম ও শেষ পাতাটাই খোয়া গেছে, তাইতো আদি-অন্তের হিসেব-নিকেশ পাওয়াই দুষ্কর। ভাইকাউন্টের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উল্টো-পাল্টা চিন্তা করতে করতে সান্ত্বনা পায় তরুণ।

মিঃ যোগীকে টোকিও থেকে কাবুলে বদলি করা হয়েছিল। বদলির অর্ডার পাবার পর প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম। টোকিও থেকে কাবুল! বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন চড়ার পর সাইকেল রিক্সা। কমপ্যাশানেট গ্রাউণ্ডে যোগীসাহেব আপীল করলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, স্ত্রীর স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া গোল্লায় যাবে। দোহাই আপনাদের।

শুধু যোগীসাহেব নয়, ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অনেকেরই এই মনোভাব। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, প্যারিস, রোম বা টোকিও ছাড়া সারা দুনিয়াটা যেন মনুষ্য-বাসের অনুপযুক্ত। মস্কো বা ইউরোপের অন্য কোন রাজধানীতে খুব জোর দু'-তিন বছরের একটা টার্ম চললেও চলতে পারে, কিন্তু তাই বলে এশিয়া

আফ্রিকায়? কল্পনা করতে পারেন না এঁরা। কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট আছেন যাঁরা অতীত দিনের প্রভুদের সমাজে মর্যাদা পাবার লোভে অথবা যৌবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছেন। এখন এসব মেমসাহেবের দল মাইশোর সিল্কের শাড়ী পরেন, ইণ্ডিপেনডেন্স ডে রিসেপশনের সময় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে 'নমসটে' করেন সত্য, কিন্তু ইণ্ডিয়াতে থাকার কথা ভাবতেও ওদের গাটা শিউরে ওঠে। কি বিশ্রী ফ্লাইজ! মসকুইটো! বেগার! নেকেড সাধুস্!

বরিশাল ঝালকাঠির পোলা হয়েও সরকারসাহেব এমনি এক মেমসাহেবের খপ্পরে পড়ে এক নাগাড়ে ষোল বছর ইণ্ডিয়ার বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিলেন। ইণ্ডিয়ার নন-অ্যালাইনমেণ্ট ও অ্যাফরো এশিয়ান প্রেমের নীতি রক্ষা করার জন্য একবার দু'বছরের জন্য কলম্বো ছিলেন। ব্যস! সরকারসাহেব সাউথ ব্লকে এসে প্রাইম মিনিস্টারের ঘরটা চিনলেও ফরেন সেক্রেটারীর ঘরে যেতে হলে বেয়ারা-চাপরাশীদের জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না।

সরকারসাহেবের কথা তরুণ জানে। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করত না। ফরেন মিনিস্ট্রির মোটা মোটা নিয়ম-কানুনের বইতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, তিন বছর পর বদলী হতে হবে। একই রিজিয়নে পরপর পোস্টিং হবে না। দুটো টার্মের বেশী এক সঙ্গে বিদেশে থাকা চলবে না এবং আরো কত কি। কিছু ডিপ্লোম্যাট ডিপ্লোম্যাসী করেন, কিছু ডিপ্লোম্যাট তৈল মর্দন করেন, কিছু আবার কাশ্মীরে শ্বশুরবাড়ী বলে এসব নিয়মকে এড়িয়ে চলছেন বেশ হাসিমুখে।

কেন মিঃ জোহর? বাইশ বছরই বিদেশে। মাঝে মাঝে তাজমহল দেখার জন্য সরকারী পয়সায় ইণ্ডিয়া আসেন কিন্তু ইণ্ডিয়াতে পোস্টিং? জোহরসাহেবকে সে কথা বলার সাহসও কারুর নেই, কেউ বলেন, মিসেস জোহরের স্বর্গত পিতা আর

ফরেন মিনিস্টার নাকি বন্ধু ছিলেন। কেউ বলেন, ওসব বাজে কথা।
ফরেন সেক্রেটারীর ছেলেকে জোহরসাহেব নিজের কাছে ভি-আই পি সমাদরে রেখে ব্যারিস্টারী পড়িয়েছেন বলেই……। কেউ আবার ফিস-ফাস করেন, মিসেস জোহর এককালের নামকরা অভিনেত্রী। এখনও বহুজন তাঁর সাহচর্যে দু'-এক পেগ স্কচ পেলে ধন্য মনে করেন।

নানা মুনির নানা মত। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা তরুণ জানে না। জানতে চায়ও না। তবে সে বেশ বুঝতে পারে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জোহরসাহেবের কিছু আণ্ডার গ্রাউণ্ড কানেকশন আছে। আমাদের টপ এ-ওয়ান অ্যাম্বাসেডররা পর্যন্ত মিঃ ও মিসেস জোহরকে যেভাবে মর্যাদা দেন, মেলামেশা করেন, তা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

যাকগে সেসব। যোগীর অত হাই কানেকশনস নেই। তবে তৈল মর্দন! জাপানী ট্রানজিস্টার, হংকং-এ ফ্রি পোর্ট তো আছে।

ইন্দুরকার তিন বছরের জন্যে কাবুল গিয়েছিল। দু'বছর পরেও বদলী হতে চায় নি সে। ইন্দুরকার তরুণের সমসাময়িক, একই ব্যাচের ছেলে ওরা। দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব। দু'জনে পৃথিবীর দু'প্রান্তে থাকলেও নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। ছাত্রজীবনে ইতিহাস পড়ে নয়, ইন্দুরকারের চিঠি পড়েই আফগানিস্থান সম্পর্কে তরুণের মনে গভীর আগ্রহ জন্মায়। তাই তো অনেক দিন আগে একবার সুযোগ মত এক জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে বলেছিল, 'স্যার, শুনেছি কাটমাণ্ডু-কাবুলে অনেকেই পোস্টিং চান না। আই উইল বী গ্ল্যাড ইফ আই গেট এ চান্স টু সার্ভ দেয়ার।'

জয়েণ্ট সেক্রেটারী মনে রেখেছিলেন তরুণের অনুরোধ। তাইতো মিনিষ্ট্রির ট্রান্সফার-পোস্টিং কমিটির মিটিং-এ যোগীর আপীলের বিষয় উঠতেই তরুণের নাম উঠল।

যোগীর বদলে কাবুল চলেছে তরুণ মিত্র। হিন্দুকুশ দেখবে, বামিয়ানে পৃথিবীর বৃহত্তম বুদ্ধমূর্তি দেখবে, গজনী যাবে, কান্দাহার যাবে। আরো কত কি দেখবে সে। খুব খুশী। তারপর আছে বীণাদি!

'মে আই হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন প্লিজ!'

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ভাইকাউন্ট এসে গেল কাবুল।

বিমান থেকে বেরিয়ে আসতেই ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ মেটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল তরুণ। হাজার হোক সিনিয়ার অফিসার। কৃতজ্ঞতা জানাল বারবার, 'সো কাইণ্ড অফ ইউ......'

'ডোণ্ট বী টু ফরম্যাল টরুণ! তুমি আসছ আর আমি এয়ারপোর্টে আসব না?'

থার্ড সেক্রেটারী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও কমার্শিয়াল অ্যাটাচ এবং আরো তিন-চারজন এসেছিলেন অভ্যর্থনা জানাতে। আলাপ পরিচয় হলো সবার সঙ্গে।

যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে থাকেন তাঁরা এয়ারপোর্ট দেখেই সেই দেশ সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা করে নিতে পারেন। লণ্ডন ও নিউইয়র্ক—দুটি এয়ারপোর্টই বিরাট ও অত্যন্ত কর্মচঞ্চল এবং আধুনিকতমও বটে। তবু বেশ বোঝা যায় যে, দুটি দেশের মাঝখানে রয়েছে আটলান্টিক! ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মস্কো এয়ারপোর্টও বিরাট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক মুহূর্ত দেখলেই দুটি দেশের জনজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

মস্কোর তুলনায় কাবুল এয়ারপোর্ট অনেক ছোট হলেও বেশ সুন্দর। রাশিয়ার সাহায্যে তৈরী কাবুল এয়ারপোর্ট বড় প্রাণহীন। তবুও ভাল লাগল তরুণের। দাঁড়িয়েই মনে পড়ল দমদম, পালাম··· কোন তুলনাই হয় না।

এম্বাসী থেকে তরুণের জন্য কোয়ার্টার ঠিক করা হয়েছিল কিন্তু মিঃ মেটা কিছুতেই ছাড়লেন না। 'বীণা উইল কিল মী, যদি তোমাকে বাড়ী না নিয়ে যাই।'

তরুণ এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরুবার সময় হাসতে হাসতে বললো, 'দ্যাট আই নো। তবে কি জানেন, একবার বীণাদির খাতির যত্ন পেতে শুরু করলে কি আর কোনদিন নিজের কোয়ার্টারে যাব?'

অ্যাড অ্যাটাচি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে চান্সেরীতে চলে গেলেন। অন্যান্যদের কেউ চান্সেরী, কেউ বাড়ী গেলেন।

পাখতুনিস্থান অ্যাভিনিউ ধরে মিঃ মেটার গাড়ীতে যেতে যেতে তরুণের মনে পড়ল অনেক দিন আগেকার কথা।—বীণাদি আর তরুণ একই সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছিল। বিয়ের পর বীণাদি যেদিন মিঃ মেটার সংসার করা শুরু করেন, তরুণও সেইদিন প্রথম ফরেন পোস্টিং পেয়ে কাজ শুরু করে। একই প্লেনে দু'জনে দিল্লী থেকে রোম গিয়েছিল কিন্তু তখন পরিচয় ছিল না। রোম এয়ারপোর্টে মিঃ মেটা একই সঙ্গে দু'জনকে অভ্যর্থনা করেন।

ফরেন সার্ভিসের অফিসার বা তাদের পরিবারকে নিয়ে সাধারণ মানুষের বিচিত্র ধারণা। অনেকের ধারণা ওরা বোধ হয় দিনরাত্রি কেবল মদ খান, চরিত্র বলে কোন পদার্থ ওদের নেই। সমাজ সংসারের বন্ধনহীন এই মেয়েপুরুষরা শুধু স্ফুর্তি করেই দিন কাটায়। কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যা নয়, তা তরুণ বা বীণাদি জানে। কিন্তু তাই বলে কি ওরা মানুষ নয়? ফরেন সার্ভিসের অফিসার বা তাঁদের পরিবারের লোকজন তো রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁদেরও হৃৎপিণ্ড আছে, মন আছে; আছে দয়া-মায়া—ভালবাসা। আব আছে মনুষ্যত্ব।

একে সৌরাষ্ট্রের মানুষ, তারপর ভবনগর রাজ কলেজের ভুতপূর্ব লেকচারার। মিঃ মেটা নিতান্তই একজন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক। কিন্তু রোমের হাওয়া আর ইতালীর মাটি কেমন যেন সবাইকে চঞ্চল করে তোলে। তারপর বীণাদির মত সুন্দরী ও বিদুষী ভার্যা! মিঃ মেটা সত্যিই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মারলোত্ বা মার্টিনীর বোতল

উজাড় না করেও মেটাসাহেবের বেশ একটু মদির হয়ে উঠলেন। বীণাদিকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামীর এই রোমান্টিক উন্মাদনা তাঁরও নিশ্চয়ই ভাল লাগতো। হাজার হোক কাকারিয়া লেক—অ্যাপলো বন্দর থেকে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে ইউরোপের আনন্দ-উৎসবের অন্যতম প্রাণবিন্দুতে এসে মিঃ মেটার মত স্বামী পেলে যে কোন ভারতীয় মেয়ের পক্ষেই অমন হওয়া স্বাভাবিক।

উইক-এণ্ডে দু'জনে মিলে ঘুরে বেড়ালেন ফ্লোরেন্স, সান মারিনো, ভেনিস, জেনোয়া, মিলান, পাডুয়া, পিসা ও আরো কত জায়গা। চললেন আল্‌পসে, ভেসে বেড়ালেন সমুদ্রে।

তারপর একদিন বীণাদিই বললেন, 'চলুন মিঃ মিত্র, ক্যাপরী বেড়িয়ে আসি।'

তরুণ মনে মনে হাসে বীণাদির আকস্মিক পরিবর্ত্তনে। বুদ্ধিমান কূটনীতিবিদ। একটু চিন্তা করেই কারণটা খুঁজে পায়। ইতালীর মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চায়। আমেরিকানরা অর্থের নেশায় পাগল, ইংরেজরা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে মত্ত, জার্মানরা শক্তিসামর্থ্য দেখাতে ব্যস্ত, কিন্তু ইতালীর মানুষ জীবনের সমস্ত রস আহরণ করতে চায়। ছেলে-ছোকরা বুড়ো-বুড়ী যেই হোক, সবাই চায় প্রাণভরে হাসতে, কাঁদতে। শুধু হাসতে-কাঁদতে নয়, পৃথিবীর মধ্যে বোধ করি একমাত্র এরাই পারে প্রাণ-মন দিয়ে ঝগড়া করতে। দর্শক হতে এরা জানে না, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় প্রতিটি ঘটনায় এরা অংশ গ্রহণ করবে। রোম বা মিলানের রাস্তায় ট্রাফিক অ্যাকসিডেণ্ট হলে এরা কলকাতার মানুষের মত শুধু ভিড় করে না, মতামত দেয়, ঝগড়া করে মারামারি করে। পরে আবার হাসতে হাসতে দল বেঁধে কোর্ট-কাছারিও যাবে। বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্রতর এর মানুষ। এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে, হৃদয়-নিংড়ে চোখের জল ফেলতে আর কেউ পারে না।

বীণাদিও কি এই দেশে এসে এদেরই মত-জীবন-উৎসবে মেতে উঠেছে ?

তরুণ ড্রাই মার্টিনীর গেলাসে চুমুক দিয়ে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিঃ মেটাকে কথাটা বললো। মিঃ মেটা একটু লজ্জিত হলেন। কথার মোড় ঘোরাল তরুণ, ক্যাপরী গিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে চলুন গ্রাণ্ডস্থইপে গিয়ে গল্প করতে করতে বাদাম চিবুই।

বীণাদি বললেন, 'বাজে কথা বাদ দিন। মোট কথা জেনে রাখুন। সামনের উইক-এণ্ডে আপনি আমাদের সঙ্গে ক্যাপরী যাচ্ছেন।'

আত্মসমর্পণ করার আগে তরুণ বললো, 'অমন রোমান্টিক জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? আই অ্যাম গিভিং ইউ দি লাস্ট চান্স টু থিংক ইট ওভার।'

নেপলস্-এর পাশে ক্যাপরী দ্বীপে গিয়েছিল ওরা তিনজনে। গান আর কাব্যের খ্যাতিসমৃদ্ধ এই ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল তিনজনেই। ফুল-পাতায় ভরা ব্লু গ্রোতোতে ছবি তুলেছে, ছবির মত সুন্দর অ্যানাক্যাপরী গ্রামে ঘুরেছে, মোর্গানো খেয়েছে, দড়ির জুতো কিনেছে। কিন্তু শেষে মেরিনা পিকোলো বীচ থেকে ফেরার পথে এক অপ্রত্যাশিত মোটর দুর্ঘটনায় নিদারুণভাবে আহত হলেন মিঃ মেটা।

সে ইতিহাস দীর্ঘ। তবে এই দুর্ঘটনার ফলে মেটা দম্পতির জীবনে একটা পাকাপাকি আসন হলো তরুণের। বীণাদির বিশ্বাস, তরুণের জন্যই মেটাসাহেব সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন। বীণাদি তাই কৃতজ্ঞ। মেটাসাহেবও ভুলে যান নি তরুণের সেবা-যত্ন তদ্বির-তদারক।

আর তরুণের ? তার রুক্ষ জীবন-প্রান্তরে মেটা-দম্পতি এক পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বীণাদিকে সে এয়ারপোর্টে আশা করে নি। নিশ্চিত জানত সে খাবার দাবার তৈরীতে এত ব্যস্ত থাকবে যে, এয়ারপোর্ট গিয়ে সময় নষ্ট করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তরুণকে দেখে বীণাদি যেন হাতে স্বর্গ পেল। 'তুমি এসে বাঁচালে আমাকে।'

'কেন বীণাদি?'

'দু'দিন থাকলেই বুঝবে কেন?' বীণাদি প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন।

মিঃ মেটা বললেন, 'এত তুচ্ছ ব্যাপারে আমাদের কলিগরা নিজেদের ব্যস্ত রাখেন যে বীণা তা টলারেট করতে পারে না।'

তরুণ আক্ষেপ করে বললো, 'এইত আমাদের রোগ।'

পরে লাঞ্চ খাবার সময় বাণাদি বলেছিলেন, 'জান ভাই, আজ প্রায় তিন মাস বাড়ীর বাইরে যাইনা বললেই হয়।'

'কেন?'

'লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম বা কলম্বোর মত সোসাইটি বলে কোন পদার্থ তো এখানে নেই। তোমার দাদার কলিগদের বাড়ী গিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টের গল্প আর ভাল লাগে না।'

সত্যি, বিচিত্র আমাদের দেশ। বিচিত্রতর হচ্ছে ফরেন সার্ভিসের এক শ্রেণীর অফিসার। শুধু ফরেন সার্ভিস কেন? সব সার্ভিসেস-এরই এক অবস্থা। আজ যেসব আই-সি-এস গভর্নর হয়েও মনে শান্তি পান না, তাঁরা যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে রিটায়ার করার। দেড়শ' বছরের ইংরেজ রাজত্বের মেয়াদ আর একটু বাড়লেই হয়েছিল আর কি! ওয়েলেসলী-সাজাহান-মথুরা রোডের বাংলো চোখে দেখতে হতো না, গোল মার্কেটের আশপাশের কোন অলিগলিতেই এঁদের ভবলীলা সাঙ্গ হতো। ফরেন সার্ভিসের সিনিয়রদের জীবনকাহিনী আরো চমকপ্রদ। যে পুরী সাহেব স্বপ্ন দেখতেন হাথরাশ বা গোরক্ষপুরের ডেপুটি কমিশনার হয়ে রিটায়ার করার পর ড্রইংরুমে বার লাইব্রেরীর ফেয়ারওয়েলের গ্রুপ ফটো টাঙাবেন, তিনি আজ লণ্ডন-ওয়াশিংটন মস্কো-টোকিও ছাড়া পোস্টিং নেন না। কেন? উনি যে সাতচল্লিশ

সালে ময়ূরের পালক পরে ফরেন সার্ভিসে জয়েন করে আজ টপ এক্সপার্ট।

সেই ডামাডোলের বাজারে আরো কত খাল-বিলের জল ঢুকে গেছে। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের কেমিস্ট্রির ডিমোনোস্ট্রেটর, লাহোর হেরল্ড-এর জুনিয়র সাব-এডিটর, আরউইন হাসপাতালের অফিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট, কনট প্লেসের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের ম্যানেজার, কেষ্টনগর কলেজের লাইব্রেরীয়ান ও আরো কত বিচিত্র মানুষ ইমার্জেন্সী রিক্রুটমেণ্টে ফরেন সার্ভিসের প্রথম বা দ্বিতীয় সারি দখল করল।

বীণাদির কথায় তরুণ অবাক হয় না। এরা সিঙ্গাপুর থেকে ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টের স্বপ্ন দেখবে, নাকি ভারত-আফগান মৈত্রীকে আরো দৃঢ় করবে?

বীণাদি বলতেন, 'আফগানিস্থানকে ওরা চিনবে? সে বিদ্যা-বুদ্ধি বা ইচ্ছা আছে ওদের?'

মিঃ মেটা প্রতিবাদ করতেন, 'যত বুদ্ধি তোমার আছে।'

বীণাদি দু'বছর কাবুলে আছেন। শুধু হিন্দুকুশের নতুন চ্যানেলই দেখেন নি, ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর অনেক রথী-মহারথীর দুর্বলতার খবরও তিনি জানেন। তাইতো মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর কথার প্রতিবাদ জানান, 'তোমাদের মত বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকতে পারে, তবে মন আছে, ইচ্ছা আছে··· ।'

বীণাদি পলিটিক্যাল কাউন্সেলরকে কেন ড্রাই ফ্রুট কাউন্সেলার বলে ঠাট্টা করতেন, তা জানতে তরুণের সময় লাগে নি। কোন জানাশুনা লোক কাবুল থেকে দিল্লী গেলেই হলো, পলিটিক্যাল কাউন্সেলার পাঁচ কিলো কিসমিস, পাঁচ কিলো ক্যাস্থনাট জয়েণ্ট সেক্রেটারীর বড় মেয়ে পলির জন্য পাঠাবেনই। বেশী দিন এমন কোন প্যাসেঞ্জার না পেলে প্লেনের পাইলট মারফত কিছু না কিছু পাঠিয়েই দিল্লীতে একটা মেসেজ পাঠাবেন, পলি···সাজাহান

রোড, নিউদিল্লী····প্লিজ কালেক্ট প্যাকেট পাইলট ফ্লাইট···· ফ্রাইডে···।

চান্সেরীর ক্লার্করা তো ওকে ডি এফ সি—ড্রাই ফ্রুট কাউন্সেলার বলেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে।

চান্সেরীতে শুধু দিনগত পাপক্ষয় করত তরুণ। কাজ করে আনন্দ পায়নি একটুও। যে চান্সেরীতে চাঞ্চল্য নেই, উত্তেজনা নেই, কোন রাজনৈতিক রেষারেষি নেই, সেখানে কি কাজ করে কোন সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট খুশী হয়? পাখতুনিস্থান নিয়ে আফগানিস্থান-পাকিস্তানের রাজনৈতিক লড়াই চলছে। সেই সাতচল্লিশ থেকে পুস্তুভাষী আফগানরা সহ্য করতে পারে না পাকিস্তানকে। আর আফগানিস্থানের শতকরা ষাট-সত্তর জনই হচ্ছে পুস্তুভাষী। তবুও পাকিস্তান কেমন টুকটুক করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আর ইণ্ডিয়ান এম্বাসী? স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরই যদি উদাসীন হন, যদি ডিপ্লোম্যাটিক রিশেপসনে রাজা বা প্রাইম মিনিস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাই তাঁর স্বপ্ন ও একমাত্র কাজ হয়, তবে এম্বাসী-চান্সেরীর অন্যেরা কি করবেন। পাকিস্তান এম্বাসীর প্রচার বিভাগ কেমন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে। আর ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর প্রেস অ্যাটাচির কৃপায় প্যারিস থেকে ছাপান ফ্রেন্টি জার্নাল ও তেহেরানে ছাপা পারসী ভাষার জার্নালের বাণ্ডিলগুলো স্টোরের মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। কাবুলের হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, এয়ারপোর্টে—সর্বত্র—পাকিস্তানের কত কি নজরে পড়বে। কাবুল ইউনিভার্সিটির রিডিংরুমে পাকিস্তানী প্রচার পুস্তিকার বন্যা বইছে। কিন্তু কোথাও ভারতবর্ষের কোন কিছুর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না।

কি করবে তরুণ বা মেটা সাহেব? অসহায় হয়ে চাকরি করে গেছে।

চান্সেরীর বাইরে কিন্তু প্রাণভরে আনন্দ পেয়েছে, উপভোগ

করেছে কাবুলবাসের প্রতিটি মুহূর্ত। এমন স্বাধীনতাপ্রিয় জাত ইতিহাসে বিরল বললেই চলে। সব কিছু বরদাস্ত করবে এরা, বরদাস্ত করবে না অন্য জাতের কর্তৃত্ব। শুধু আজ নয়, কোন দিনই করেনি। প্রায় হাঁটতে হাঁটতেই দেশ দখল করেছেন আলেকজাণ্ডার, কিন্তু আফগানিস্থানে এসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন পাঠান-শক্তির মারাত্মক স্বাদ! পরবর্তীকালে শিক্ষা পেয়েছিল সাম্রাজ্যলোভী আরবরা। কেন ইংরেজরা? ঝড়ের বেগে এশিয়া-আফ্রিকার ডজন ডজন দেশ দখল করেছে, উড়িয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক। একবার নয়, ত্ব'বার নয়, তনবার বিরাট ইংরেজ বাহিনীর বিপর্যয় হয়েছে এই পাঠান বীরদের হাতে। যখন সামনা-সামনি পারেনি, তখন রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে চক্রান্ত করে খিড়কির দরজা দিয়ে কাবুলে সংসার পাততে চেয়েছিল বীরের জাত ইংরেজ। তাও পারেনি!

ইদানীংকালে আফগানিস্থান শত শত কোটি সাহায্য নিচ্ছে আমেরিকা-রাশিয়ার কাছ থেকে, কিন্তু তার জন্য মাথা হেঁট করছে না সে; বরং সাহায্য নিয়ে কৃতার্থ করেছে ওদের। কাবুলে ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে আফগান সরকারের হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট—হেড ক্লার্করাও নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁরা না এলে হোস্ট অ্যাম্বাসেডররা দুঃখ পান। তরুণ ভাবে নিজের দেশের কথা? একটা ফিল্ম শো দেখার জন্য ভি-আই-পি'দের কি ব্যাকুলতা!

কলকাতা বা দিল্লীতে আফগানদের নিয়ে কতজনকে হাসি-ঠাট্টা করতে শুনেছে তরুণ। শুনেছে ওরা নাকি পিছিয়ে থাকা মধ্যযুগীয়।

কলকাতা-দিল্লী-বোম্বের মিল্ক বুথের মত সারা কাবুলে ছড়িয়ে আছে সরকারী 'নান'-এর দোকান। সরকার লরী ভর্তি আটা পৌঁছে দেয় এই সব দোকানে, কর্মচারীরা তৈরী করেন 'নান'। সেই 'নান' খেয়ে বেঁচে থাকেন কাবুলের চার লক্ষ মানুষ। দীনদুঃখী

থেকে প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ীর ডাইনিং টেবিলে পর্যন্ত এই 'নান' পৌঁছে যায়। কোন 'নান'-এর ওজন এক তোলা কম হবে না।

তরুণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'একটুও ওজনের হেরফের হয় না ?'

সহিদুল্লা খাঁ হেসে ওঠে কথা শুনে।—'ওজনের হেরফের হবে কেন ?'

হাসি থামলে খাঁ সাহেব বললেন, 'একবার ওজন কম দেবার দায়ে দু'জনের ফাঁসি হয়। সেই থেকে…'

'ফাঁসি ?'

'হ্যাঁ, তাইতো শুনেছি।'

'ক'বছর আগের কথা ?'

'তা জানি না। তবে বেশ কিছুকাল আগে।'

কিংবদন্তীর মত এসব কাহিনী ঘরে ঘরে শোনা যায়। সঠিক খবর কেউ জানে না, তবে সবাই জানে ওজন কম দেবার সাহস কারুর নেই। আরো অনেক কিছু জানে ওরা। জানে মাঝরাতে কাবুলের নির্জন পথেও নিঃসঙ্গ অর্ধনগ্ন যুবতীর গায়ে হাত দেবার সাহস কোন আফগানের নেই। 'কি বললে ? চুরি-ডাকাতি ? ডাকাতি করলে জোশন গ্রাউণ্ডে শূলে চড়ান হয়।' তরুণ বহুজনকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি দেখেছেন ?' কেউ দেখেনি। তবে সবাই জানে শূলে চড়ান হয়।

কাবুলের রাস্তায় উর্দীপরা পুলিস ওয়্যারলেশ গাড়ী নিয়ে ছুটে বেড়ায় না, অ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্টের কৃতিত্ব সরকারী প্রেস নোটে প্রচার করার অবকাশ নেই আফগানিস্থানে। অনেক দেশের সঙ্গেই তুলনা করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় তরুণ।

মরুভূমি ও চিরতুষারাবৃত পর্বতের সমন্বয়-ভূমি আফগানিস্থান সত্যি বিচিত্র দেশ। অন্য দেশে সৎ মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু অসৎ মানুষ জেলখানায় গিয়ে আহার-বিহার প্রমোদ উপভোগ করে সরকারী খরচায়। আফগানিস্থানে ? যে অসৎ, যে ঘৃণিত

তাকে জেলখানায় পাঠায় শাস্তি দেবার জন্যে। তাইতো সরকারী কোষাগার শূন্য করে কয়েদীদের সেবা-যত্ন আহার-বিহারের ব্যবস্থা নেই আফগানিস্থানে। কয়েদীদের আহার আসে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে। যে কয়েদীর আত্মীয়স্বজন নেই, সে হাতে-পায়ে হাতকড়া পরে শুক্রবারে শুক্রবারে ভিক্ষা করবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং সেই ভিক্ষার পয়সায় তার দিন গুজরান হবে। এ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, তা জানে না তরুণ। তবে জানে এর পেছনে যুক্তি আছে, কারণ আছে।

স্নিগ্ধ-রুক্ষ প্রকৃতির সন্তান আফগানরাও কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত; কখনও সৌজন্য-ভদ্রতার প্রতীক, কখনও নির্মম পাষাণ। শত্রু নিপাত করে এরা হাসিমুখে। আবার আশ্রয়প্রার্থী চরম শত্রুকেও সন্তান জ্ঞানে সমাদর করে। কিন্তু অপমানের প্রতিশোধ অপমান করেই নেবে, রামধুন গেয়ে নয়।

হঠাৎ ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে কাবুল ছাড়তে যেন তরুণের কষ্টই হচ্ছিল। সে রাত্রে সব কিছু একসঙ্গে মনে পড়ল। বছরের প্রথম তুষারপাতের সময় আফগানদের মত 'বরফি' খেলার সময় কি মজাই না হয়েছিল বীণাদির সঙ্গে।

ফেয়ারওয়েল ডিনারের অতিথিরা একে একে সবাই বিদায় নিলেন। অত বড় ড্রইং রুমের তিন কোণায় তিনটি সোফায় তিনজনে চুপচাপ করে বসে রইলেন কতক্ষণ, তা কেউ জানে না।

অনেকক্ষণ পর বীণাদি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমাদের এতটা ঘনিষ্ঠতা না হলেই ভাল হতো! যাদের থাকা না থাকার ঠিক-ঠিকানা নেই, যারা আজ কাবুলে কাল ক্যালিফোর্নিয়ায় বা কোরিয়ায়, তারা যে কেন মানুষকে ভালবাসে, আপন করে, তা বুঝি না।'

মিঃ মেটা একটু সান্ত্বনা দেন, 'বছর তিনেকের মধ্যেই আবার যাতে আমরা একই মিশনে থাকতে পারি······।'

বীণাদি প্রায় গর্জে উঠলেন, 'বাজে বক্‌বক্ করো না তো! তোমার ঐ ধাপ্পাবাজি অনেক শুনেছি।'

এবার তরুণ কথা বলে, 'নিত্য নতুন দেশ দেখছি আর তোমাদের ভালবাসা পাচ্ছি বলেই তো আমি বেঁচে আছি। নয়ত আমি কি করে বাঁচি বল তো?'

এতদিনে যে প্রশ্ন অনেক কষ্টে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবার বীণাদি সেই প্রশ্নই করলেন, 'আচ্ছা, ঢাকার কোন খবর পেলে?'

অতি দুঃখেও তরুণ হাসে। বলে, 'আর কি খবর পাব? শেষ সর্বনাশের কনফারমেশন?'

'ছি ছি, ওকথা বলছ কেন?'—বীণাদি উঠে এসে তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা জানান।

একটু থেমে আবার বলেন, 'তুমি তো কোন অন্যায় করনি তরুণ। দেখবে ভগবানও তোমার প্রতি অন্যায় করবেন না। একদিন তুমি ওকে খুঁজে পাবেই।'

পরদিন সকালে কাবুল এয়ারপোর্টে ভাইকাউন্টের চারটে ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল, পাখাগুলো বন বন করে ঘুরে উঠল। ঝাপসা চোখেও প্লেনের জানলা দিয়ে তরুণ যেন স্পষ্ট দেখে বীণাদিকে। আর প্লেনের গর্জন স্তব্ধ করে বীণাদির শান্ত কণ্ঠ শুনতে পায়, 'একদিন তুমি ওকে খুঁজে পাবেই।'

। পাঁচ ।

খবরের কাগজ বা চলতি রাজনৈতিক ডিক্সনারীর ভাষায় 'বিগ পাওয়ারে'র এম্বাসীগুলোব ব্যাপারই আলাদা। ওখানে যে কি হয়, আর কি হয় না, তা স্বয়ং অলমাইটি গডও জানেন না। অনেকটা মধ্যযুগীয় হারেমের মত আর কি! কিছু বোঝা যায়, কিছু দেখা যায়, কিছু শোনা যায়, কিছু অনুমান করা যায়। তবুও সব কিছু জানা অসম্ভব। ওদের ওখানে কে সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট বা প্রেস অফিসার বা গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তা স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরের অন্তর্যামীও জানেন না।

বিগ পাওয়ারের অ্যাম্বাসেডরদের অবস্থা অনেকটা বড় বড় কোম্পানীর পাবলিক রিলেশান্স ম্যানেজারের মত। কোম্পানীর পরিচালনা বা অর্থকরী ব্যাপারে বা গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক রিলেশান্স ম্যানেজারের কোন ভূমিকা নেই কিন্তু প্রচার বেশী। অ্যাম্বাসেডর বক্তৃতা দেবেন, ছবি ছাপা হবে, এম্বাসীর সবাই তাঁকে মান্যগণ্য করবে, কিন্তু রাজনৈতিক চাবিকাঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের কাছে থাকে।

ভাগ্যবান ডিপ্লোম্যাটেরও অভিভাবক থাকবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিগ পাওয়ারের ডিপ্লোম্যাটদের প্রায় ছায়ার মত অনুসরণ করে ওদেরই সহকর্মী—গোয়েন্দা। আবার এই গোয়েন্দাদের নজর রাখার জন্যও আছে ব্যাপক ব্যবস্থা—কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স!

বিগ পাওয়ারের চান্সেরীগুলো যেন এক-একটি সতীনের সংসার! কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কাউকে ছাড়তেও পারে না! তাইতো সবার মনেই সন্দেহ আর অশান্তি।

ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ওসব বালাই নেই। বিগ পাওয়ারের লুকোচুরি খেলার প্রয়োজন আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এদের দেশে কত কি হচ্ছে। বিপরীত পক্ষের সেসব গোপন খবর জানার জন্য ওরা হরির লুঠের বাতাসার মত শত-শত সহস্র-সহস্র কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করতে দ্বিধা করে না। আমাদের দেশের মানুষকে খেতে-পরতে দেওয়ারই পয়সা নেই; সুতরাং লুকিয়ে লুকিয়ে অপরের সর্বনাশ করার জন্য অর্থ ব্যয় করা অসম্ভব। আমাদের চান্সেরীগুলো সতীনের সংসার নয়। কিছু কিছু অহঙ্কারী বা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক থাকলেও অবিশ্বাসের অন্ধকার নেই কোথাও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সবাই এক বৃহত্তর পরিবারের মত বসবাস করেন। ভাগাভাগি করে নেন নিজেদের সুখ-দুঃখ।

ফরেন সার্ভিসে ঢুকে প্রথম ফরেন পোষ্টিং পাবার পরই দয়ালের বিয়ে হলো। বিয়ের পর মৃণালিনীকে নিয়ে যখন বন-এ ফিরল, তখন কি কাণ্ডটাই না হলো।...

...কর্মচঞ্চল ফ্রাঙ্কফার্ট এয়ারপোর্টের চির কর্মব্যস্ত কর্মচারীরাও থমকে দাঁড়ালেনঃ শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মেয়ের দল সারি বেঁধে লাইন করে দাঁড়ালেন। কারু হাতে শাঁখ, কারুর হাতে বরণডালা। মাস্টার অফ সেরিমনিজ শ্রীবাস্তব কোন ত্রুটি করেনি। এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছিল টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে, ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের কাছে এই অনন্য অভ্যর্থনা জানাবার। টেলিভিশন কোম্পানীতে খবর দিয়েছিল, ট্রাডিশনাল ইণ্ডিয়ান ওয়েলকাম সেরিমনি 'টেক' করে টেলিকাস্ট করাব জন্য।

এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনটা ট্যাক্সি করে এসে থামতেই মাস্টার অফ সেরিমনিজ ইঙ্গিত করল। জন-পঞ্চাশেক ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে শুরু করল রাজস্থানী ফোক সঙ। এসো রাজপুত্র, এসো রাজকন্যা, নতুন জীবনের পরিপূর্ণ সুরাপাত্র

পান কর। প্লেনের দরজা খুলতেই শুরু হলো শঙ্খধ্বনি। দয়াল আর মৃণালিনী মুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল দরজার মুখে। নীচে নেমে আসতেই মেয়েরা বরণ করল নববধূকে। ধুতি-পাঞ্জাবি শেরওয়ানী-চাপকান পরে পুরুষের দল মালা পরালেন দয়ালকে, মৃণালিনীর হাতে তুলে দিলেন ফুলের তোড়া।

অ্যাম্বাসেডর আসেননি ইচ্ছা করেই। তাই স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন, 'যাও, যাও, তুমি যাও। আমার সামনে হয়ত ওরা ঠিক সহজ হয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে না।'

মাস্টার অফ সেরিমনিজ সব অনুষ্ঠান শেষে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অ্যাম্বাসেডর-পত্নীকে। সন্তানতুল্যা দয়ালকে আশীর্বাদ করলেন, নববধূর সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন সিঁদুর।

সন্ধ্যায় জার্মান টেলিভিশনে এয়ারপোর্টের এই অনুষ্ঠান টেলিকাস্ট করা হলো। রাতারাতি দয়াল ও মৃণালিনী বিখ্যাত হয়ে গেল। বন-এ দয়াল মৃণালিনীকে নিয়ে কতদিন ধরে চলল আনন্দোৎসব।

সেদিন বন ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বাসীর যাঁরা দয়াল মৃণালিনীকে নিয়ে এই আনন্দোৎসব করেছিলেন, তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন সারা দুনিয়ায়। কেউ অস্ট্রেলিয়া কেউ ভিয়েৎনাম, কেউ ওয়াশিংটন কেউ মস্কো। কত কি হয়ে গেছে এর মধ্যে। কত উত্থান কত পতন। তবুও কেউ ভুলতে পারেননি দয়াল আর মৃণালিনীর কথা। যে মৃণালিনীকে নিয়ে ওঁরা এত আনন্দ করেছিলেন, সে মা হতে পারল না জেনে সবাই দুঃখিত, মর্মাহত। পর পর তিন তিনটি সন্তান নষ্ট হলো মৃণালিনীর। একটা ফুটফুটে সুন্দর শিশু দেখলে কাঙালিনীর মত ছুটে যায় মৃণালিনী। চান্সেরীর বন্ধু-বান্ধবদের বাচ্চাদের নিয়েই আজ সে দিন কাটায়।

তরুণ দুঃখ পায় মৃণালিনীকে দেখে, সান্ত্বনা পায় দুঃখের এতগুলো অংশীদার দেখে।

মৃণালিনী তরুণকে বলত, 'জানেন ভাই, প্রথম প্রথম নিজেকে সামলাতে পারতাম না। একলা থাকলেই চুপচাপ বসে বসে চোখের

জল ফেলতাম। পার্টিতে রিসেপশনে ককটেল-এ গিয়েছি কিন্তু মুহূর্তের জন্য মনে শান্তি পাইনি। কিন্তু আজ?'

বন্ধুপত্নীকে আর বলতে হয় না। বাকিটুকু তরুণ জানে। জানে নায়েক, রঙ্গস্বামী, চ্যাটার্জী, শ্রীবাস্তবের ছেলেমেয়েরাই ওর সারা জীবন জুড়ে রয়েছে। অষ্ট্রিয়ায় থাকবার সময় মিসেস শ্রীবাস্তব অসুস্থ হলে দুটি বাচ্চাই তো মৃণালিনীর কাছে থেকেছে! ছোট বাচ্চাটা তো নিজের বাপ-মার কাছে যেতেই চায় না! দয়াল যেখানেই বদলী হোক না কেন, মৃণালিনীর একটা সংসার সেখানে আছে।

'আচ্ছা দাদা, তোমার বাচ্চা হলে আমার কাছে রাখবে তো?' মৃণালিনী সত্যি সত্যি জানতে চায় তরুণের কাছে।

তরুণ মুচকি হাসে।

'হাসছ কেন দাদা?'

'হাসব না?' একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। একটু পরে, একটু যেন তালিয়ে যায়। বলে, 'ওসব কথা আজ আর ভাবি না, ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না।'

সত্যিই কি সেসব ভাবে না তরুণ? লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে নিঃসঙ্গ তরুণ নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখে। কত কি ইচ্ছে করে, কত কি মনে পড়ে তার!

'জান মা, কলেজের একজন লেকচারার আমার হাত দেখে কি বললেন?'

'কি বললেন?'

'বললেন আমার নাকি অনেক দেরীতে বিয়ে।' তরুণ মুচকি হাসে।

'বাপ-বেটায় বেরিয়ে যাবে আর আমি একলা একলা এই ভূতের বাড়ী পাহারা দেব, তাই না?' মা বেশ রাগ করেই বলেন।

রাগ করবেন না? উনি যে বরাবর স্বপ্ন দেখেছেন বি-এ পাশ করার পরই ছেলের বিয়ে দেবেন, ইন্দ্রাণীর মত একটা বৌ আনবেন ঘরে। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে কতদিন ইন্দ্রাণীকে বলেছেন, 'দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে আমার। খুব ইচ্ছা করে ছেলে-বৌয়ের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই। ঢাকায় যেন আর মন টেঁকে না।'

'কেন মাসিমা, আমরা তো আছি,' হাসি হাসি মুখে ইন্দ্রাণী বলে।

'তোকে কি আর আমার কাছে চিরকাল ধরে রাখতে পারব মা? কত বড় ঘরে তোর বিয়ে হবে, কোথায় চলে যাবি তার কি কোন ঠিক ঠিকানা আছে?' কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ছোট্ট নিঃশ্বাসও পড়ে।

পরে ইন্দ্রাণী তরুণকে বলেছিল, 'জান মাসিমা কি বলছিলেন?'

'কি?'

'বলছিলেন আমার কত বড় ঘরে বিয়ে হবে, আমি নাকি কোথায় চলে যাব।'

বইটা উল্টে রেখে তাচ্ছিল্য ভরে তরুণ জবাব দেয়, 'ডাকাতদের মত কোঁকড়া চুল-ওয়ালা মেয়েকে রমনার কোচোয়ানরা ছাড়া আর কেউ বিয়ে করলে তো?'

চোখ দুটো ঘুরিয়ে ইন্দ্রাণী জবাব দেয়, 'তুমি বুঝি এবার পরীক্ষার পর কোচোয়ানগিরি শুরু করবে?'

তরুণ হাসতে হাসতে নিজের হার স্বীকার করে।

'এই বুদ্ধি নিয়ে তোমার কোন্ চুলোয় জায়গা হবে, তাই ভাবি। আমি না থাকলে যে তোমার কি দুর্গতিই হবে?'

শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে এখন যৌবনের প্রতিটি দিন পাশে পাশে পেয়েছে ইন্দ্রাণীকে, সাহায্য নিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে।

সেদিনের ঢাকা হারিয়ে গেছে তরুণের জীবন থেকে, কিন্তু দূরে সরে যায়নি ইন্দ্রাণীর স্মৃতি। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র কত মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর স্মৃতি চাপা দিতে পারেনি কেউ। বিধাতাপুরুষের নির্দেশে সে যেন আজও তারই পথ চেয়ে বসে আছে। বন্ধু-বান্ধব সহকর্মীদের হাসি-খুশিভরা সংসার দেখে তাঁদের ছেলেমেয়েকে আদর করে, ভালবাসে। কত আনন্দ পায়। দিনের শেষে যখন নিজের শূন্য ফ্ল্যাটে ফিরে আসে, তখন পিকাডেলি সার্কাস—টাইমস স্কোয়ার—গিঞ্জার সব নিওন লাইটগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠলেও তরুণের অন্ধকার মনে একটুও আলোর ইসারা দিতে পারে না। ইন্দ্র-পত্নী ইন্দ্রাণীর মত হয়ত তার ইন্দ্রাণী সুন্দরী ছিল না সত্য, কিন্তু সে ছিল অপরূপা, অনন্যা। কিশোরী ইন্দ্রাণী যখন ম্যাট্রিক পাশ করে ইডেন কলেজে ভর্তি হলো, শাড়ী পরতে শুরু করল, তখন যেন রাতারাতি ওর দেহে বন্যা এলো। চোখের নিমেষে যেমন পদ্মার ভাবান্তর হয়, ইন্দ্রাণীর সর্বাঙ্গে তেমন ভাবান্তর দেখা দিল। মেঘ দেখলেই যেমন মেঘনার জল নাচতে থাকে তেমনি তার অতদিনের অত পরিচিতা মেয়েটাকে দেখেও তরুণের মনে দোলা দিতে শুরু করল।

শীতের সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তরুণ একটু দাঁড়ায়। ফেন্সিং-এ ভর দিয়ে টেমস-এর দিকে তাকায়। চারিদিকে কুয়াসা যেন তরুণকেও গ্রাস করে।—এই ক'বছরে ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই আরো পূর্ণ, পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ওর ঐ স্বচ্ছ কালো চোখের বিদ্যুৎ আরো উজ্জ্বল, আরো স্পষ্ট হয়েছে। ওর ঐ ঘন কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো কোনদিনই শাসন মানত না। যে এক গোছা চুল সব সময় কপালের পর উড়ে বেড়াত, সেগুলো তো এতদিনে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ঘন কুয়াশা পাতলা হলো। ও-পারের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলের আলোগুলো যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তরুণের মনের স্বপ্নময় কুয়াশাও

কেটে যায়, ফিরে আসে রূঢ় বাস্তবে, নির্মম ইন্দ্রাণী-বিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে।

মনটা কদিন ধরেই ভাল না। ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে কাজ করতে একটুও ইচ্ছা করে না। বুড়ো-হাবড়া হাই-কমিশনার দেশসেবার বিনিময়ে কেনসিংটনের ঐ বিরাট প্রাসাদ ও রোল্‌স ওয়েস ভোগ করছেন। কিছু কাগজপত্র সই করতে হয় বটে, তবে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব-কর্তব্যের বালাই নেই। ডেপুটি হাই-কমিশনারই সর্বময় কর্তা।

ডেপুটি হাই-কমিশনার মিঃ ব্যাস নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের কূটনীতিবিদ। বেনিয়া ইংরেজ পর্যন্ত দর কষাকষিতে মাঝে মাঝে হার মানতে বাধ্য হয়। এর আগে উনি যখন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন তখন ভারতীয় ইমিগ্রাণ্টদের নিয়ে এক মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার কিছু সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদ এমন হাহাকার করে উঠলেন যেন কয়েক জন ব্ল্যাক ইণ্ডিয়ানকে অস্ট্রেলিয়ায় পাকাপাকি ভাবে থাকার অনুমতি দিলে আকাশ ভেঙে পড়বে। মিঃ ব্যাস তখন কানে কানে ফিস-ফিস করে ওঁদের বলেছিলেন, 'কিছু মধ্যযুগীয় অধিবাসী ছাড়া অস্ট্রেলিয়ান বলে কোন জাত নেই। তোমরা সবাই একদিন ইমিগ্রাণ্ট হয়েই এ দেশে এসেছিলে। সুতরাং ইণ্ডিয়ানদের এত ঘেন্না করছ কেন?'

এই ছোট্ট একটা চিমটি কাটাতেই অস্ট্রেলিয়ার ঐ সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদরা হুঁশ ফিরে পেয়েছিলেন এবং কাজ হয়েছিল।

কূটনীতিবিদ ব্যাস সাহেবের নিন্দা তাঁর চরম শত্রুরাও করবে না। তবে সন্ধ্যার পর বা কাজ-কর্মের অবসরে সুন্দরী-সান্নিধ্য পেলে ভুলে যান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়। হাজার হোক সাবেকী মানুষ! শিকার করেন শুধু ভারতীয়।...

এডিনবরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য ভারতবর্ষ থেকে একদল শিল্পী এলেন লণ্ডনে। কলকাতার মিস বলাকা রায় ও বোম্বের সুজাতাও

এলেন। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছলেন কিন্তু মিঃ ব্যাস গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন, 'ডোণ্ট বদার অ্যাবাউট আওয়ার আর্টিস্টস্। আমাদের আর্টিস্টদের থাকার ব্যবস্থা আমরাই করব।'

ব্যাস সাহেব আর্টিস্টদের জানিয়ে দিলেন, 'ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করলেই বড় বড় হোটেলে থাকতে হবে ও তার ফলে আপনাদের সীমিত ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে বিপদে পড়বেন। তাই আমরাই ব্যবস্থা করছি।'

কলকাতা থেকে মিস রায় লিখলেন, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ইনভিটেশন পাঠিয়েছেন বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাত্র ২৭ পাউণ্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর করেছে। দশ দিনের জন্য সাতাশ পাউণ্ড! ভাবলেও মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম এসকর্ট হিসেবে ছোট ভাইকে সঙ্গে নেব, কিন্তু এই ফরেন এক্সচেঞ্জ···।'

শেষে লিখলেন, 'আপনার ভরসাতেই আসছি। দয়া করে দেখবেন। এয়ারপোর্টে যদি কাউকে পাঠান তবে বিশেষ কৃতজ্ঞ হবো।'

ব্যাস সাহেব মনে মনে হাসলেন। উত্তর দিলেন পরদিনই, 'কিছু ঘাবড়াবেন না মিস রায়। আপনাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য। সব ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। যদি কাইণ্ডলি একুশে বি-ও-এ-সি ফ্লাইট থ্রি-সিক্স-ওয়ানে আসেন, তবে বড় ভাল হয়।'

ডেপুটি হাই-কমিশনার সাহেব এমনভাবে প্রোগ্রাম ঠিক করলেন যে, দু'জন আর্টিস্ট একসঙ্গে এলেন না। তাছাড়া এক একজনকে এক-একটা হোটেলে ব্যবস্থা করলেন। কার্লটন টাওয়ারে সুজাতা, স্ট্রাণ্ড প্যালেসে মিস রায়। বোম্বের উঠতি নায়ক প্রেমকুমার? কেনসিনটন প্যালেসে।

সবাইকেই এক কৈফিয়ত, 'লণ্ডনে এখন পুরোপুরি টুরিস্ট সীজন। ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক চাটার্ড ফ্লাইটে রোজ কয়েক হাজার আমেরিকান আর কানাডিয়ান আসছে। কিভাবে যে আমরা হোটেলে রিজার্ভেশন পেয়েছি, তা ভাবলেও অবাক লাগে।'

সুজাতা দেবী বছর তিনেক আগে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখে দেশে ফেরার পথে মাত্র দু'দিনের জন্য লণ্ডনে এসেছিলেন শুধু বোম্বের বাজারে নিজের দাম বাড়াবার জন্য। সুতরাং ধরতে গেলে তিনজনেই একেবারে আনকোরা। নিউকামারদের হাত করা খুব সহজ। টালিগঞ্জের ফিল্ম পাড়ায় বা পার্ক স্ট্রীটের ঐ দু'-চারটে রেস্তোরাঁয় চালিয়াতি করা সহজ, কিন্তু লণ্ডনের মত মহা মহানগরে এসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে রীতিমত কেরামতি দরকার। অজস্র অর্থ থাকলে তবু সম্ভব, কিন্তু সাতাশ পাউণ্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে?

হিথরো এয়ারপোর্টে মিঃ ব্যাস ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস রয়। দিস ইজ ব্যাস।'

'গুড আফটারনুন! গুড আফটারনুন! আপনি নিজে কষ্ট করে এয়ারপোর্টে এসেছেন?'

কেবিন-ব্যাগ হ্যাণ্ড ব্যাগ ঠিক করে ধরতে ধরতে বললেন, 'ছি ছি, আমাদের জন্য আপনাকে কি দুর্ভোগই না সহ্য করতে হলো।'

ব্যাস সাহেব মনে মনে ভাবলেন, 'আসব না সুন্দরী! তোমার মত সুন্দরী অথচ ইগনোরেন্ট গেস্টদের শিকার করবার জন্য রোজ এয়ারপোর্টে আসতে রাজী আছি।'

নিজের অজ্ঞাতেই ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। '—হাজার হোক আপনি একজন সেলিব্রেটেড আর্টিস্ট। আপনাদের সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।'

নিজের গাড়ীতে নিজে ড্রাইভ করে মিস রায়কে নিয়ে গেলেন স্ট্রাণ্ড প্যালেস। গাড়ী থেকে নামার আগে মিস রায়ের কোটের

দুটো বোতাম আটকে দিয়ে উপদেশ দিলেন, 'বোতামগুলো ভাল-করে আটকে নিন। হঠাৎ কখন ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তা টেরও পাবেন না।'

ফিল্ম স্টার হলেও বাঙালী মেয়ে তো। ব্যাস সাহেব অত আপন জ্ঞানে কোটের বোতাম লাগাবার সময় বলাকা রায় একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। কিন্তু একে লণ্ডন, তারপর এমন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী; তাই আপত্তি করা তো দূরের কথা, হাসিমুখেই ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তাছাড়া সিনেমা-অ্যাকট্রেস হয়েও কলকাতা শহরে ঠিক সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা পান না মিস রায়। একটু হাসি, একটু কথা, একটু মেলামেশা অনেকেই পছন্দ করেন, কিন্তু স্বীকৃতি-মর্যাদা দিতে ওঁদের বড় কুণ্ঠা। লণ্ডনে ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনারের এমন সহজ সরল মেলামেশা ও সাহায্যে মিস রায় বরং কৃতজ্ঞ হলেন।

একটু জল, একটু সার ছড়ালে ফসল হবেই। জমিটা উর্বর হলে সে ফসল আরো ভাল হয়।

এই সামান্য সৌজন্যের সার ছড়িয়েই ব্যাস সাহেব শান্তি পেলেন না। ওয়েস্ট মিনিস্টার, সেণ্ট জেমস পার্ক, বাকিংহাম প্যালেস, রিজেণ্ট পার্ক, হাইড পার্ক, মার্বেল আর্চ, জুলজিক্যাল গার্ডেন, কেন-সিংটন গার্ডেন দেখালেন, বেড়ালেন! তারপর মিস রায় এডিনবরা থেকে ফিরে এলে উদার ডেপুটি হাই-কমিশনার সাহেব তাঁকে নাইট ক্লাব দেখালেন, উইক-এণ্ডে ব্রাইটনের সমুদ্র পাড়েও নিয়ে গেলেন।

মৌমাছি শুধু মধুর জন্যই ফুলের কাছে যায়, ফুলের সৌন্দর্য বা সান্নিধ্য উপভোগের জন্য নয়। ব্যাস সাহেবও ঠিক তাই। নিজের কাজ-কর্ম কাউন্সিলার ও তরুণের উপর চাপিয়ে দিয়ে মিছিমিছি বলাকা রায়ের পিছনে ঘুরে বেড়াননি, একথা হাই-কমিশনের সবাই জানত।

মিসেস ব্যাস তখন ইণ্ডিয়ায় থাকায় ব্যাস সাহেবের লীলাখেলা আরো জমেছিল। বলাকাকে বিদায় দেবার পর সুজাতাকে তো নিজের আস্তানাতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনারে ডিনারা-ককটেল হলো। ডেইলি মীরর-এর ফটোগ্রাফারকে এনে ফিচার ছাপাবার ব্যবস্থাও হলো।

বিদেশ-বিভুঁইতে বলাকা রায় বা সুজাতার মত কত কে আসেন। ভারতবর্ষের পরিচিত সমাজ-সংসার থেকে দূরে এসে এঁরা যেন কেমন মুক্ত হন বহুদিনের বহু রীতি নীতি সংস্কার থাকে। কেমন যেন শিথিল হয় সব বন্ধন। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ দেখার আনন্দে মেতে ওঠে বলাকা রায়, সুজাতা ও আরো অনেকে। আর সেই বন্ধনহীন আনন্দের ফাটলের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঢুকে পড়েন ব্যাস সাহেব।

যে তরুণ সারা জীবন ধরে ভালবেসেছে, স্বপ্ন দেখেছে শুধু ইন্দ্রাণীকে, সে সহ্য করতে পারে না ব্যভিচারী ব্যাসকে। অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অল্ডউইচের বিরাট হাই-কমিশনে শুধু ঐ একটি মানুষকে নিয়েই তার সংসার! কূটনৈতিক দুনিয়ার বিরাট চাকচিক্য-রোশনাইয়ের মধ্যেও তরুণ যেন আলোর নিশানা খুঁজে পায় না। কতদিনের কত স্বপ্নের লণ্ডনও যেন ভাল লাগে না তার। এত বড় শহরের এত পরিচিতের মধ্যেও নিঃসঙ্গতার দাহ যেন তাকে আরো পীড়া দেয়।

। ছয় ।

কেনসিংটন গার্ডেনস্, হাউড পার্কের বাঁদিক দিযে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তার নাম বেজওয়াটাব বোড। এজওয়ার রোড ও পার্ক লেনের মোড়ে মার্বেল আর্চকে স্পর্শ করতেই বেজওয়াটার বোডের নাম হারিয়ে গেল, শুরু হলো অক্সফোর্ড স্ট্রীট।

সবুজের মেলার পাশের শান্ত বেজওয়াটার রোড নাম পাল্টাতেই চরিত্র হারিয়ে ফেলল। প্রাণ-চঞ্চল অক্সফোর্ড স্ট্রীট যেন মানুষের উন্মত্ত আকাক্ষার তীর্থক্ষেত্র। দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ-সম্ভোগের প্রদর্শনী হচ্ছে এই অক্সফোর্ড স্ট্রীট পাড়া। অক্সফোর্ড স্ট্রীট, বেকার স্ট্রীট, নিউ বণ্ড স্ট্রীট, রিজেন্ট স্ট্রীট, উইগমোর স্ট্রীট, টটেনহাম কোর্ট রোড, চারিং ক্রশ ও আশে-পাশে মানুষ গিজগিজ করছে। সীমাহীন লালসা নিয়ে বেড়াচ্ছে সবাই।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট সোজা আরো এগিয়ে গেল। মানুষের ভিড় একটু পাতলা হলো। রাস্তার নামও পাল্টে গেল। এবার নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীট। এর পর আবার পরিচয় ও চরিত্র পাল্টে গেল ঐ একই রাস্তার। হলো হাই হোবর্ন। আবার বদলে গেল। এবার শুধু হোবর্ন।

রাস্তাটা ধনুকের মত একটু ডান দিকে বেঁকে যেতেই আরো কতবার ঐ একই রাস্তার পরিচয় ও চরিত্র পাল্টে গেল।

বেশ মজা লাগে তরুণের। কোনদিন কাজকর্মের মাঝে সুযোগ পেলে অফিস থেকে বেরিয়ে স্ট্রাণ্ড ধরে এগিয়ে যায় চারিং ক্রশ। তারপর যেদিকে খুশী চলে যায়। হারিয়ে যায় সর্বজনীন মহামেলায়। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হাজির হয় টি সেণ্টারে।

শুধু ক্লান্ত হয়ে নয়, মাঝে মাঝে ভুল করে, অন্যমনস্ক হয়েও তরুণ হাজির হয় টি সেণ্টারে।

কাউণ্টারের কাছে যাবার আগেই মিস বোস এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান, 'আসুন, আসুন। এতদিন কোথায় ছিলেন?'

তরুণ একটু হাসে, এক ঝলক দেখে নেয় মিস বোসের অশান্ত, অবাধ্য চুলগুলো আর ঐ দুটো মিষ্টি চোখ। তারপর বলে, 'কোথায় আর যাব?'

বন্দনা বোস বলে, 'আজও কি মানুষের শোভাযাত্রা দেখতে এদিকে এসেছেন?'

'যদি বলি আপনার কাছেই এসেছি।'

রাশ-আওয়ার না হলেও তখনও বেশ কিছু কাস্টমার ছিলেন। তবুও বন্দনা হেসে উঠল। ভ্রূ দুটো টেনে উপরে উঠিয়ে বলল, 'ফর গড্স সেক, এমন মিথ্যা বলবেন না।'

'যাকগে, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। চলুন আপনার বাড়ী যাই।'

'এক্ষুনি?'

'তবে কি? মিসেস অরোরাকে বলুন আমাকে মাছ রান্না করে খাওয়াবেন বলে...!'

বন্দনা আবার একটু হেসেই চলে গেলেন মিসেস অরোরার কাছে।

দু'-এক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এসে বললেন, 'আপনার বহিনজী আপনাকে ডাকছেন।'

হাইকমিশনের সবাইকেই মিসেস অরোরা একটু খাতির করেন। তবে তরুণকে উনি ভালবাসেন। হাইকমিশনের আর কেউ ওঁকে বহিনজী বলেন না, উনিও আর কাউকে ভাইসাব বলেন না। লণ্ডন শহরে এসব সম্পর্ক দুর্লভ হলেও মনটা তো ভারতীয়।

কদাচিৎ কখনও কখনও তরুণ এদিকে এলে বন্দনার সঙ্গে দেখা করবেই। সেই সেবার চার্চ হলে নববর্ষ উৎসবে আলাপ হবার পর

থেকেই দু'জনের মধ্যে একটা বেশ মৈত্রীর ভাব জমে উঠেছে। বন্দনার ঐ চুল আর ঐ চোখ দুটো দেখে তরুণের যে অনেক কথা মনে পড়ে, অনেক স্মৃতি ফিরে আসে। কিন্তু সেকথা একটি বারের জন্যও প্রকাশ করে না। তবে বন্দনা জানে, বোঝে, তরুণ তাকে পছন্দ করে, হয়ত একটু ভালবাসে। সে পছন্দ বা ভালবাসায় অবশ্য মালিন্যের স্পর্শ নেই। টি এক্সপোর্ট ব্যুরোর চেয়ারম্যানের মত নোংরা চরিত্রের লোক তরুণ নয়, সেকথা বন্দনা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

বৃদ্ধ চেয়ারম্যানের কথা মনে হলে ঘেন্নায় বন্দনার সারা মন ঘিন ঘিন করে ওঠে।

···বিশ্বের বাজারে ইণ্ডিয়ান টি'র চাহিদা কমে যাচ্ছে। এককালে যেসব দেশে শুধু দার্জিলিং বা আসামের চা বিক্রী হতো, সেসব দেশের বাজারে সিংহল ও সাউথ আফ্রিকার চায়ের বেশ চাহিদা হচ্ছে। লণ্ডন চা নিলামের বাজারে ক'বছর আগেও ইউরোপ আমেরিকার কাস্টমাররা দার্জিলিং টি কেনার জন্য হুড়োহুড়ি করত। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, জেনেভা, ব্রাসেলস্, টারান্টো উরস্টার, জনারিও'র বড় বড় রেস্তোরাঁয় ক'বছর আগেও ইণ্ডিয়ান চা সার্ভ করে নিজেদের কৌলীন্য প্রচার করত। বড় বড় নিওন-সাইনের বিজ্ঞাপন দিত, 'ফর বেস্ট ইণ্ডিয়ান টি, ভিজিট····।' ক'বছরের মধ্যে সব নিওন-সাইনের আলো নিভে গেল।

কর্মবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের প্রতিভাবান কমার্শিয়াল অ্যাটাচির দল এসব ব্যাপারে নজর দেবার তাগিদবোধ করলেন না। কলকাতা থেকে বেস্ট ইণ্ডিয়ান টি'র স্যাম্পল প্যাকেট পেয়েই ওঁরা মহাখুশী রইলেন।

দু'-চারটে খবরের কাগজের রিপোর্ট ও পার্লামেন্টে কিছু কোশ্চেন হবার পর কুম্ভকর্ণ ভারত সরকারের যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উদ্যোগ ভবনে নতুন ফাইলের জন্ম হলো, ততদিনে ওসব দেশের

কয়েক কোটি মানুষের অভ্যাস পাল্টে গেছে। সাউথ আফ্রিকা ও সিংহল গ্যাঁট হয়ে বসেছে লণ্ডন টি অকসানে।

রোগটা যখন ক্যান্সারের পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন সর্বরোগবিনাশিনী বটিকা আবিষ্কারের প্রয়াসে এক ডেপুটি মন্ত্রী তিন সপ্তাহে ন'টি দেশ ভ্রমণ করে দিল্লী ফিরে গেলেন। এই ভ্রমণে রোগের কোন সুবাহা হলো না বটে, তবে ডেপুটি মন্ত্রীর গাল দুটি কাশ্মীরী আপেলের মত লাল হলো।

প্রথম প্রিলিমিনারী রিপোর্ট ও প্রেস কনফারেন্স হতে দেরী হলো না। মাস তিনেকের মধ্যেই মিনিস্টার-ডেপুটি মিনিস্টার-সেক্রেটারীর মিটিং হলো। পরের চার মাসে সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারীদের নিয়ে দু'-তিনবার মিটিং করলেন। এর পর দু'জন ডেপুটি সেক্রেটারী ও একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী টি এক্সপোর্টার্সদের সমস্যা ও মতামত জানার জন্য বার-কয়েক কলকাতা-দার্জিলিং গৌহাটি-শিলং ঘুরে এলেন পরের ছ'-সাত মাসের মধ্যেই। জয়েন্ট সেক্রেটারী দার্জিলিং গিয়ে একটু গ্যাংটক ঘুরে আসায় তাঁর মনে হলো পাঞ্জাবের বেড কভারের ডিমাণ্ড ওখানে বেশ ভালই। দিল্লী ফিরে একটা রিপোর্টও দিলেন, বেড কভার বিক্রী হলে সিকিমের কমন ম্যান ভীষণ খুশী হবে ও ইণ্ডিয়া-সিকিমের কালচারাল সোশ্যাল ইকনমিক্যাল সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

কেরালার কোট্টায়াম জেলার অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী এই রিপোর্ট পড়েই বললেন, 'ডিড আই নট টেল ইউ যে ওখানে কেরালার কয়ার ম্যাটের ভীষণ ডিমাণ্ড আছে।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি! সেবার শিলিগুড়ি এয়ারপোর্টে সিকিম প্যালেসের একজন হাই-অফিসারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় উনিই জানালেন কয়ার ম্যাট-কার্পেটের ভাল ডিমাণ্ড হতে পারে সিকিমে।'

'কোয়াইট ন্যাচারাল।'

'তাইতো বলছিলাম, আপনি একবার কেরালা ঘুরে আসুন। তারপর একটা কমপ্রিহেনসিভ রিপোর্ট দিন।'

চায়ের সমস্যা চাপা পড়ল। জয়েন্ট সেক্রেটারী ছুটলেন কেরালা।

যাই হোক, এমনি করে আবার মন্ত্রী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে চা রপ্তানী শিল্পের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হলো। সার্জিক্যাল অপারেশন করে অনতিবিলম্বে রোগ সারাবার জন্য মিঃ বহুগণার নেতৃত্বে সাতজনের এক কমিটি নিয়োগ করে বলা হলো সরকারী পয়সায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে চটপট রিপোর্ট দিন।

এই কমিটির শিরোমণি হয়েই বহুগুণা সাহেব লণ্ডন এসেছিলেন। টি সেন্টারের ম্যানেজারের ঘরে হলো অফিস। অস্থায়ী আবাস-স্থান হলো কাছেরই মাউন্ট রয়্যাল হোটেলে।

দু'-চার দিন টি সেন্টারে আসার পরই বহুগুণা সাহেব বললেন, 'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড মিসেস অরোরা, মিস বোস আমার কাজে একটু হেল্প করুন।'

কথাটা বলতে না বলতেই আবার বললেন, 'অবশ্য যদি আপনার এখানকার কাজের কোন ক্ষতি না হয়।'

মিসেস অরোরা একজন সামান্য ম্যানেজার। চেয়ারম্যান বহুগুণা সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা কবার কথা উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। উনি দিল্লীতে না থাকলেও ভূতপূর্ব সেন্ট্রাল মিনিস্টার বহুগুণা সাহেবের ইনফ্লুয়েন্সের কথা ভালভাবেই জানেন। চায়ের রপ্তানীর বাজার স্টাডি করতে এলেও এয়ার ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার থেকে হাইকমিশনার পর্যন্ত ওঁকে নিয়ে মহাব্যস্ত। সুতরাং মিসেস অরোরা কৃতার্থ হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। যদি আমাকে দরকার হয়, বলতে দ্বিধা করবেন না।'

তোমাকে বহুগুণা সাহেবের দরকার নেই। তোমার বসন্ত

বিদায় নিয়েছে। চৈত্র দিনের ঝরা পাতার বাজারে তোমাকে নিয়ে কি হবে।

'না, না, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। মিস বোস হলেই সাফিসিয়েন্ট।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার। উই আর অ্যাট ইওর ডিসপোজ্যাল।'

'মেনী থ্যাঙ্কস মিসেস অরোরা।'

কয়েক দিন পর কমিটির অন্য সদস্যরা কন্টিনেণ্টে চলে গেলেন। বহুগুণা সাহেব একাই থেকে গেলেন লণ্ডনে।

'আমি তো এখন একাই কাজ করব। আমি আর কেন একলা টি সেণ্টারে যাই? তুমিই না হয় হোটেলে চলো এসো।'

চেয়ারম্যানের আদেশ শিরোধার্য করে নিল বন্দনা।

একদিন বেশ কেটে গেল।

পরদিন।

'এখন থেকে রোজ সকালেই আমি কেনসিংটনে হাইকমিশনারের বাড়ী যাব। তুমি বিকেলের দিকেই এসো।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার।'

বন্দনা দরজা নক্ করার আগে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। হ্যাঁ, চারটেই বাজে।

'কাম ইন।'

আমন্ত্রণ শুনে ঘরে যেতেই হাসিমুখে বহুগুণা সাহেব অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

বন্দনা পাশের সোফাটায় বসে একটু মুচকি হেসে বললে, 'সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যার।'

'দেখ বন্দনা, অত ফরম্যাল হবে না।'

বহুগুণা সাহেব বন্দনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার কাছে এত ফরম্যাল হবার দরকার নেই। বী ইনফরম্যাল, কম্ফর্টেবল।'

এই বলে বন্দনাকে নিয়ে বড় সোফাটায় পাশে বসালেন। 'বলো কফির সঙ্গে কি খাবে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। আমি এখন কিছু খাব না!'

'আবার ফর্মালিটি?' ডান হাত দিয়ে বন্দনাকে একটু জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বিলেতে থেকে একেবারে বিলেতী হয়ে গেছ? বলো কি খাবে?'

'ওনলি কফি স্যার।'

'তাই কি হয়?'

টেলিফোন তুলেই ডায়াল করলেন, 'রুম সার্ভিস! প্লিজ সেণ্ড টু প্লেটস অফ চিকেন স্যাণ্ডউইচ, সাম পেস্ট্রি অ্যাণ্ড কফি ফর টু।'

বন্দনা ঈশান কোণে একটা ছোট্ট কালো মেঘ দেখতে পেল। মনের মধ্যে অনিশ্চিতের আশঙ্কা দোলা দিল। অনুমান করতে কষ্ট হলো না বহুগুণা সাহেবের অন্তরের ক্ষীণ আশা।

আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই বন্দনার। তাই যেন একটু মুচকি হাসল। লণ্ডনে আসার প্রথম কয়েক মাসে এমনি কত বিপদের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। তাইতো কেমন যেন একটু বিদ্রূপের হাসি উঁকি দিল তার ঐ দুটো ঠোঁটের কোণে।

'জান বন্দনা, এতবার তোমাদেব এই বিলেতে এসেছি কিন্তু সব সময়ই কাজকর্ম নিয়ে এমন বিশ্রী ব্যস্ত থেকেছি যে কিছুই দেখা হয়নি।'

'তাই নাকি স্যার?'

'তবে কি! ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা উইণ্ডসর ক্যাসেল-এর পাশ দিয়ে গেছি হাজার বার কিন্তু ভিতরে যাবার সময়-সুযোগ হয় নি।

বন্দনা মনে মনে ভাবে, হোটেলের এই ঘরে মাঝে মাঝে তোমার আলিঙ্গন ও আদর উপভোগ করার চাইতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান অনেক ভাল।

'আমিও যে সব কিছু দেখেছি তা নয়; তবুও চলুন না, সব কিছু দেখিয়ে দেব।'

'দ্যাটস লাইক এ ওয়াণ্ডারফুল গার্ল', বলেই বহুগুণা ডান হাত দিয়ে বন্দনাকে একটু কাছে টেনে আদর করলেন।

বন্দনা লোহার মত শক্ত হয়ে থাকে, নিজের বুকের পর দুটি হাত রেখে ছোটখাট আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করে।

'আঃ! তুমি বড় রিজিড, বড় কনজারভেটিভ। এতদিন বিলেতে থাকার পরও একটু ফ্রিলি মিশতে পার না? তাছাড়া আমার মত ওল্ডম্যানের কাছে লজ্জা কি?'

'না না, লজ্জা কি!'

সকাল সাড়ে এগারটায় বাকিংহাম প্যালেসের সামনে একদল বাচ্চা ও টুরিস্টদের সঙ্গে বহুগুণা সাহেবকে 'চেঞ্জিং অফ দি গার্ড' দেখাল। তারপর ন্যাশনাল গ্যালারী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

'বুঝলে বন্দনা, এ তো মিউজিয়াম নয়, একটা দুনিয়া। ভালভাবে দেখতে হবে। আর একদিন আসব। চলো আজকে একটু রিজেন্ট পার্ক বা কেনসিংটন গার্ডেনে যাই।'

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই বহুগুণার আরো গুণ প্রকাশ পেল।

'শুনেছি তোমাদের এই লণ্ডনে ওয়ার্ল্ড ফেমাস নাইট ক্লাব আছে। কে যেন বলেছিল 'ফোর হানড্রেড ক্লাব', 'রিভার ক্লাব' ও আরো কি কি সব নাইট ক্লাব আছে। কত বারই তো এলাম অথচ কিছুই দেখলাম না। তুমি আমাকে একটু নাইট ক্লাব ঘুরিয়ে দাও তো।'

লণ্ডনের নাইটক্লাবগুলি যে পৃথিবীবিখ্যাত, তা বন্দনা শুনেছে। কখনও দূর থেকে, কখনও পাশ দিয়ে যাবার সময় নাইট ক্লাবগুলোর নিওন সাইন দেখেছে। সেরকম বন্ধু ও অপব্যয় করার মত টাকাকড়ি থাকলে হয়ত একদিন ভিতরে ঢুকে দেখত। সে সুযোগ ওর আসে নি। তবে শুনেছে সবকিছু। ও জানে যৌবন-

পসারিণীরা নাচে, দর্শকদের নাচায়। রাত যত গভীর হয় সবাই তত বেশী আদিম হয়। যৌবন-পসারিণীদের দেহ থেকে ধীরে ধীরে পোশাকের ভার যত কমে আসে আর দর্শকরা তত বেশী মদির হয়, উন্মত্ত হয়, আরো কত কি!

বহুগুণার মত বৃদ্ধকে নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত 'ফোরহানড্রেড ক্লাবে' যাবাব কথা ভাবতেও বন্দনার বিশ্রী লাগল। একবার ভাবল, মিসেস অরোরাকে বলে। তারপর মনে হলো, বহুগুণা সাহেবের এই সব গুণের কথা জানাজানি হলে ওকে নিয়েও নিশ্চয়ই সরস আলোচনা শুরু হবে। নিশ্চয়ই অনেকে অনেক কিছু ভাববে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এ'দিক-ওদিক সেদিক চিন্তা করে বন্দনা বলল, 'ঠিক আছে, আমি আপনার একটা রিজার্ভেশন করে দেব।

'ইউ নটি গার্ল! আমাকে একলা একলা নেকড়ে বাঘেব মুখে ঠেলে দিতে চাও?'

বন্দনার হাসি পেল।

নাইট ক্লাবে গেলেন বহুগুণা সাহেব। মিস বন্দনা বোসকে পাশে নিয়ে উপভোগ করলেন যৌবন-পরারিণীদের নাচ। লাস্ট ফাইন্যাল সিনে লাইট অফ হয়ে গেলে মুহূর্তের জন্য আতিশয্যের আধিক্যে বন্দনার হাতটা চেপে ধরেছেন। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বারোটা বাজার আগেই নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফেরার পথে বেশ একটু নিবিড় হয়ে বসলেন।

'জান বন্দনা, তোমাকে বলতে একেবারেই ভুলে গেছি। কাল সকালেই চারজন ব্রিটিশ অকসনার্স আসছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাইকমিশনের অফিস থেকে যে ব্রীফ দিয়েছে, সেই তার বেসিসে তোমাকে আজ রাত্রেই একটা ছোট্ট নোট ঠিক করে দিতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?' বন্দনা চমকে ওঠে। নাইট ক্লাব থেকে

ফেরার পর বহুগুণা সাহেবের সঙ্গে হোটেলে ওই কাজ করতে হবে?
'আমি বরং স্যার কাল ভোরে এসেই···।'

কথা শেষ হবার আগেই বহুগুণা বাধা দিলেন, 'নট অ্যাট অল! আজ রাত্রেই ওটাকে রেডি করতে হবে।'

হোটেলের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বহুগুণা সাহেব নিজে বন্দনার কোট খুলে দিলেন। মুহূর্তের জন্য একবার যেন কী ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আগুনের হল্কার মত নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর! চিড়িয়াখানার নেকড়ে বাঘও তখন ওঁকে দেখলে হয়ত ভয় পেত।

বহুগুণা সাহেব আরো এগিয়ে এলেন। বন্দনা একটু পিছিয়ে যেতেই বহুগুণা সাহেব দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'প্লিজ ডোণ্ট ডিসিভ মী টুনাইট।'

বন্দনার মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না। বহুগুণা সাহেব হঠাৎ আলোটা নিভিযে দিয়ে দানবের বেগে জড়িয়ে ধরলেন বন্দনাকে!

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দরজায় ঠক্ ঠক্ করে নক্ করল।

ঘরে আলো জ্বলে উঠল। বন্দনা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে পাশে সরে দাঁড়াল। বহুগুণা সাহেব একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাম ইন।'

দরজা খুলে অপ্রত্যাশিত ভাবে তরুণ মিত্র একটা গোলাপী কভার নিয়ে ঘরে ঢুকল, 'এক্সকিউজ মী স্যার! দিল্লী থেকে একটা আর্জেণ্ট মেসেজ আছে। আজ রাত্রেই রিপ্লাই দিতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?'

'ইয়েস স্যার।'

একটা ব্রিটিশ নিউজ পেপারের রিপোর্টের ভিত্তিতে বহুগুণা সাহেবের কমিটি নিয়ে পার্লামেণ্ট সর্ট নোটিশ কোশ্চেন টেবিল করেছেন আট-দশজন অপোজিশন এম-পি।

'স্যার আমাদের হাইকমিশনের একজন স্টাফকে সঙ্গে এনেছি।

আপনি কাইণ্ডলি ওকে আপনার রিপ্লাইটা ডিকটেট করে নীচে একটা সই করে দেবেন। উই উইল সেণ্ড এ কেবল্ টু ডেল্‌হি!'

এবার তরুণ বন্দনার দিকে তাকায়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হয়ত স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'এক্সকিউজ মী মিস বোস, চলুন আমাদের অফিস কারে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো।'

বন্দনা সেদিন মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়েছিল ভগবানকে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল তরুণকে।

সেই থেকে তরুণের প্রতি বন্দনার একটা অদ্ভুত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। হয়ত ভালওবাসে। বন্দনা বুঝতে পারে তরুণ যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়ায়। ওর মত এক সাধারণ মেয়ের দুটি চোখের ছোট্ট দুটি তারার মধ্য দিয়ে বিরাট এক দুনিয়া দেখছে। যেন ক্যামেরার ছোট্ট লেন্সের মধ্য দিয়ে সুন্দর অরণ্য-পর্বতের ছবি তোলা। ক্যামেরাম্যান প্রকৃতির ঐ অনন্ত সৌন্দর্যকে বন্দী করতে চায়, উপভোগ করতে চায় সর্বক্ষণ। তাইতো সে ক্যামেরার লেন্সকে যত্ন করে, ভালবাসে। বন্দনা জানে সে শুধু ক্যামেরার লেন্স মাত্র, অপরূপ প্রকৃতি নয়।

তবু তার ভাল লাগে, তবু সে খুশী। তরুণ মাছ খেতে চাইলে সে এক পাউণ্ড-দেড পাউণ্ড খরচা করে মাছ কেনে, মাংস কিনে কত যত্ন করে রান্না করে।

গ্যাসে মাছটা চাপিয়ে দিয়ে কোণার সোফাটায় বসে বন্দনা প্রশ্ন করে, 'একটা কথা বলবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'কাকে আবার!'

'আপনি জানেন আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি বিশ্বাস করি আপনি মিথ্যা কথা বলেন না।'

'না, না, মিথ্যা বলব কেন? খুঁজি না কাউকে। তবে মনে

পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা, ছোটবেলার কথা, ছাত্র-জীবনের কথা।’

একটু নিবিড় হয়ে মিশলেই বেশ বোঝা যায় তরুণ যেন কারুর ভালবাসার কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পৃথিবীতে থেকেও সে যেন এক মহাশূন্যে বিচরণ করছে। পুরুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, কিন্তু মেয়েদের? অসম্ভব।

তরুণের জীবনের, মনের দুঃখের ইঙ্গিত প্যাবার জন্য বন্দনা যেন ওকে আরো ভালবাসে।

তরুণও ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে বন্দনাকে। কি নিদারুণ পরিশ্রম করে মেয়েটা ক’টা বছরে সারা পরিবারকে রক্ষা করল।

দুটি বছরে দু’জনে কত কাছে এলো।

‘বন্দনা, এবার তো আমার যাবার পালা।’

‘তোমার ট্রান্সফার অর্ডার এসে গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

বন্দনা যেন বাক্‌শক্তিটাও হারিয়ে ফেলল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তরুণ একটু কাছে টেনে নেয় বন্দনাকে। মাথায় হাত দিয়ে বলে, ‘আমার একটা কথা শুনবে বন্দনা?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘তুমি একটা বিয়ে কর।’ তরুণের দৃষ্টিটা ঘুরে আসে লণ্ডনের মেঘলা আকাশের কোল থেকে। ‘আমার খুব ইচ্ছা করে তোমার বিয়েতে আমি খুব হৈ-চৈ করি, খুব মজা করি, খুব মাতব্বরি করি।’

‘আর একটা বছর। ছোট ভাইটা যাদবপুর থেকে বেরিয়ে যাক। তারপর তুমি একটা ছেলে ঠিক করে দিও, নিশ্চয়ই বিয়ে করব।’

বন্দনার এমন সুন্দর আত্মসমর্পণে মুগ্ধ হয় তরুণ। এমন অধিকার ক’জন আধুনিকা দিতে পারে অপরিচিত ডিপ্লোম্যাটকে?

‘নিশ্চয়ই আমি ছেলে খুঁজে দেব। তবে বিলেতী বাঁদরদের সঙ্গে কিন্তু আমি বিয়ে দেব না!’

বন্দনা শুধু মাথা নিচু করে হাসে।

দু'দিন পর হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে তরুণ বিদায় নিল। বন্দনা ঐ এয়ারপোর্টের ভিড়ের মধ্যেই প্রণাম করে বলল, 'আমাকে কিন্তু ভুলে যেও না।'

'পাগলী মেয়ে কোথাকার।'

। সাত ।

উনিশশ' ষাট সালের তেসরা মে তুরস্কস্থিত মার্কিন বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে একটা ছোট্ট খবর প্রচার করা হলো : আদানা এয়ার বেস থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা বিমান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ওড়বার পর নিখোঁজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ওয়্যার সার্ভিসের অসংখ্য চ্যানেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ছোট্ট খবরটি ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়। কিন্তু কেউই বিশেষ গ্রাহ্য করল না। কোন কাগজে খবরটা বেরুল, কোন কাগজে বেরুল না। ডিপ্লোম্যাটরাও বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

দু'দিন পর পাঁচই মে সুপ্রীম সোভিয়েটের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভ ঘোষণা করলেন, একটা পরিচয়বিহীন মার্কিন বিমান সোভিয়েট ইউনিয়নের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করায় গুলি করে নামান হয়েছে।

চমকে উঠল দুনিয়া।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটন থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো, ১৯৫৬ সাল থেকে যে ইউ—টু বিমান পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুর আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, এমনি ঐ বিমানের পাইলট তুরস্কের লেক ভ্যান-এর উপর দিয়ে ওড়ার সময় জানায় তার অক্সিজেন সাপ্লাইতে গণ্ডগোল

হচ্ছে। হয়ত এমনি পরিস্থিতিতে বিমানটি রাশিয়ায় ঢুকে পড়ে।

শুধু এইটুকু বলেই ওয়াশিংটন থামল না। ঐ একই ঘোষণায় জানাল নিরস্ত্র ঐ পাইলটের নাম।

ওয়াশিংটন থেকে মস্কোতে একটা নোট পাঠিয়ে আবহাওয়ার তথ্য-সন্ধানী ঐ বিমানের বিশদ খবরও জানতে চাইল '

মার্কিন সরকার স্থিব ধবে নিয়েছিলেন যে পাইলট ফ্রান্সিস গ্রে পাওয়ার্স বেঁচে নেই। বিমানটিকে গুলি করে নামাবার পর সে বেঁচে থাকতে পারে না।

সেই আশায় ও ভরসায় ৬ই মে মার্কিন পববাষ্ট্র দপ্তর থেকে জোব গলায় প্রচার কবা হ'লো, সোভিয়েট আকাশ সীমা লঙ্ঘনের কোন কথাই উঠতে পারে না।

সেই তেসবা মে'ব ঘোষণাব পব ক্রুশ্চভ ক'দিন ধরে শুধু মুচকি মুচকি হাসলেন। সাতই মে আব সে হাসি চেপে বাখতে পারলেন না। সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতা দেবার সময় ইউ—টু বিমানেব নাড়ি-নক্ষত্র জানিয়ে ঘোষণা করলেন, ফ্রান্সিস গ্রে জীবিত ও সোভিয়েট কাবাগারে। ফ্রান্সিস গ্রে স্বীকাবোক্তি কবেছে ও তার সঙ্গে প্রচুব টাকা, আত্মহত্যাব সরঞ্জাম, সোনা, অস্ত্রশস্ত্র ও এক থলি ভর্তি ঘড়ি ও আংটি ছিল।

এই বক্তৃতার শেষে ক্রুশ্চভ নরওয়ে, তুরস্ক ও পাকিস্তানকে সতর্ক করে বললেন, যে সব দেশ থেকে এইসব গোয়েন্দা বিমান উড়বে, তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

মার্কিন সরকারকে কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করলেও ক্রুশ্চভ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সম্পর্কে একটুও কটূ কথা বললেন না।

সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটরা ক্রুশ্চভের এই রসিকতা ঠিক হয়ত ধরতে পারলেন না। সবাই ভাবলেন, হয়ত তেমন কিছু হবে না।

সাতই মে ওয়াশিংটন থেকে আবার বিবৃতি। প্রায় প্রত্যক্ষ-

ভাবেই তাঁরা স্বীকার করলেন গোয়েন্দা বিমানের অভিযান কাহিনী— তবে ঠিক অনুমতি দেওয়া হয় নি।

এবার শুধু ক্রেমলিনেব নেতৃবৃন্দ নয়, সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটরাও মুখ টিপে হাসতে শুরু করলেন। আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী তাহলে সবকারেব বিনা অনুমতিতেই এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পাবে।

আর কোন গত্যন্তর না থাকায় শেষ পর্যন্ত ইউ—টু ফ্লাইট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ঘোষণা করলেন এগারোই মে।

ঐদিন প্রায় একই সময়ে মস্কোর ফরেন করেসপনডেন্টদের ক্রুশ্চভ নেমন্তন্ন করে ইউ—টু ফ্লাইটের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম দেখালেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাইক্লোন উঠল। আমেরিকার দুই দোস্ত—ফরাসী ও ব্রিটিশ সবকার ভাবল যে ওদের দেশের উপর দিয়েও নিশ্চয়ই অমনি গোয়েন্দা বিমান ঘুরে বেড়ায়। জ্ঞাতি-শত্রু।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্রুশ্চভের ধমক খেয়ে নরওয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠাল ওয়াশিংটনে। ব্ল্যাক সী'র এ-পাবের তুরস্ক, প্রভু-সেবা করতে গিয়ে এমন বিপদের মুখো-মুখি হবে ভাবতে পারেনি। মার্কিন সাহায্যে তুরস্ক বেঁচে আছে বলে নরওয়ের মত প্রতিবাদও পাঠাতে পারল না ওয়াশিংটনে। ফাঁপরে পড়ল পাকিস্তান। আয়ুব খাঁ একই সঙ্গে ক'বছর দুধ আর তামাক খাচ্ছিলেন কিন্তু এবার ক্রুশ্চভের ধমক খেয়ে তাঁর পাতলুন ঢিলা হয়ে গেল।

ক'দিন পরই প্যারিস সামিট! দীর্ঘদিনের পৃথিবীব্যাপী প্রচেষ্টার পর বিশ্বের চার মহাশক্তি বিশ্ব সমস্যার সমাধানের আশায় ক'দিন পরই প্যারিসে বসবে। তারপর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার

ক্রুশ্চভের আমন্ত্রণে যাবেন সোভিয়েট ইউনিয়ন। এমনি এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তের ঠিক আগে অ্যালান ডালেস পাঠালেন ইউ—টু ?

অভাবিত আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়করা। সবার মুখে এক কথা, প্যারিস সামিট হবে তো? ক্রুশ্চভ আসবেন তো ?

শেষ পর্যন্ত ওরলি এয়ারপোর্টে এরোফ্লোটের স্পেশ্যাল প্লেন ল্যাণ্ড করল। হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন ক্রুশ্চভ।

আঠারোই মে প্যারিসে সারা দুনিয়ার সাংবাদিকদের একটা গল্প শোনালেন ক্রুশ্চভ।——ছোটবেলায় বড় গরিব ছিলাম আমরা। আমার দুঃখী মা একটু দুধ, একটু ক্ষীর অতি যত্নে লুকিয়ে রাখতেন আমাদের দেবার জন্য। কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে ঐ দুধ, ঐ ক্ষীর একটু খেয়ে গেলে মা রাগে দুঃখে জ্বলে উঠতেন। শেষকালে বিড়ালটার মুণ্ডু ধরে ঐ ক্ষীরের মধ্যে ঘষে দিতেন। কেন জানেন ? বিড়ালটাকে শিক্ষা দেবার জন্য।

গল্পটা বলে ক্রুশ্চভ সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের দেশের মানুষের একটু দুধ, একটু ক্ষীর যে সব ছ্যাবলা বিড়াল চুরি করে খেতে চায়, তাদের শিক্ষা দেবার জন্য একটু নাক ঘষে দেব। আর কিছু নয়।

শীর্ষ সম্মেলন শুধু বর্জন করেই শান্ত হলেন না ক্রুশ্চভ, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করতে নিষেধ করলেন।

যত সহজে এসব ঘটনাগুলো খবরের কাগজের রিপোর্টাররা লিখতে পারেন, ডিপ্লোম্যাটদের পক্ষে ঠিক তত সহজে এর তালে তালে চলা সহজ নয়! যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির সেই স্মরণীয় দিনগুলিতে মস্কো, লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন ও ইউনাইটেড নেশনস্থিত ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের দিবারাত্র শুধু ওয়ারলেস ট্রান্সক্রিপ্টের ফাইল নিয়ে কাটাতে হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন এমন মহিলার সন্তান, ছেলে না মেয়ে, তা অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক জানেন বলে দাবি করেন। কিন্তু রাশিয়া বা ক্রুশ্চভের মনে কি আছে তা কেউ বলতে পারেন না। তবুও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতবর্ষ প্রায় একই পথের পথিক। তাইতো দুনিয়ার নানা কোণা থেকে সম্ভাবিত সোভিয়েট পদক্ষেপ সম্পর্কে ভারতীয় দূতাবাসে ঘন ঘন তাগিদ।

বাইরের দুনিয়াকে না জানালেও মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস-এর ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা অনুমান করলেন, ক্রুশ্চভ ঐখানেই যবনিকা টানবেন না। নতুন রঙ্গমঞ্চে এবার নাটক শুরু হবে।

মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস থেকে ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশন টপ সিক্রেট কোডেড্ মেসেজ পাঠালেন দিল্লীতে। সতর্ক করে দেওয়া হলো সম্ভাবিত সোভিয়েটের পদক্ষেপ সম্পর্কে। দিল্লীতে ক্যাবিনেট ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে একবার ঐ নোট নিয়ে আলোচনাও হলো। মোটামুটিভাবে ঠিক করা হলো বিশ্বশান্তির জন্য ক্রুশ্চভের আবেদন অগ্রাহ্য করার প্রশ্নই উঠে না।

তারপর সত্যি একদিন এরোফ্লোটের ইল্যুসিন চড়ে ক্রুশ্চভ এলেন নিউইয়র্ক, এলেন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাতিন আমেরিকা থেকে আরো অনেকে। মার্কিন ডিপ্লোম্যাসি'র রাহুর দশা যেন শেষ হয় না।

ডিপ্লোম্যাট ও সাংবাদিকদের অনেকে বিনিদ্র রজনী যাপনের পর এরোফ্লোটের ইল্যুসিন আবার ক্রুশ্চভকে নিয়ে নিউইয়র্ক ইণ্টার ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল। উড়ল আরো অনেক বিমান। বিদায় নিলেন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাতিন আমেরিকার নেতৃবৃন্দ।

অনেক দিন পর ডিপ্লোম্যাটরা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

'মিশ্র, আর খেও না!'

'প্লিজ ডোণ্ট স্টপ মী টু নাইট। আই মাস্ট ড্রিংক লাইক ফিস।'

ইণ্ডিয়ান মিশনের তিন তলার রিসেপশন হলের জানলা দিয়ে মিশ্র একবার বাইরের আকাশটা দেখে নিয়ে তরুণকে বলল, 'ইজিপশিয়ান গার্ডেনে নাচ দেখতে যাবে?'

'এত ড্রিংক করার পর কি ইজিপশিয়ান গার্ডেনের বেলি ডান্সারদের বেলি দেখাব অবস্থা থাকবে?'

'আই অ্যাম নট এ পিউরিটান লাইক ইউ।'

'তবু···।'

'ঐ তবু টবু ছেড়ে দাও। আমি তো তুমি নই যে কবে কোনকালে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছি বলে আর কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাব না?'

অ্যাম্বাসেডব এদিক ওদিক ঘুবতে ঘুবতে মিশ্রের পাশে এসে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মিশ্র, আর ইউ হ্যাপি?'

গেলাসের বাকি স্কচটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মিশ্র জবাব দিল, 'সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যাব? লাইফে আপনার মত বস আর স্কচ হুইস্কী পেলে আমি আর কিছু চাই না।'

ইণ্ডিয়া শো-রুমের মিস মাজিথিয়াকে একটু পাশে আবিষ্কার করতেই অ্যাম্বাসেডর সরে গেলেন।

মিশ্র এগিয়ে এলো, 'হাউ আব ইউ ডিয়ার ডার্লিং স্যুইটহার্ট?'

বাঁ চোখটা একটু ছোট কবে, ডান চোখে একটু ঈষৎ দুষ্টু ইঙ্গিত ফুটিয়ে মিস মাজিথিয়া বললেন, 'ডোণ্ট বি সিলি ইউ নটি বয়?'

'স্যুইট ডার্লিং, স্কচ পেলে দুনিয়া ভুলে যাই, আর তোমাকে পেলে স্কচও ভুলে যাই।'

মিস মাজিথিয়া তরুণকে বললেন, 'ডু ইউ বিলিভ হিম, মিস্টাব মিত্র?'

'সার্টেনলি আই বিলিভ মাই কলিগ।' তরুণ হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

'এত বিশ্বাস করবেন না, বিপদে পড়বেন।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় তরুণ, 'যেমন আপনি বিপদে পড়েছেন, তাই না?'

হাসতে হাসতে বললেও বিদ্রূপটা কাজে লাগে। মিস মাজিথিয়া স্কচ হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান।

মিস মাজিথিয়াকে অমনভাবে পালিয়ে যেতে দেখে তরুণ না হেসে পারে না। মিশ্রকে নিয়ে নেপথ্যে অনেক আলোচনা, সমালোচনা হয়। কোন আড্ডাখানায় নিউইয়র্কবাসী দু'পাঁচজন ভারতীয় এক হলেই মিশ্রের নিন্দা হবেই। কিছু হাফ বেকার-হাফ এমপ্লয়েড ছোকরা তো রেগে বলেই ফেলে, 'স্কাউণ্ড্রেল, ডিবচ, ড্রাংকার্ড।'

বলবে না? মিশ্র যে মেয়েদের সাবধান করে, সতর্ক করে দেয় ঐসব নোংরা ছেলেগুলো সম্পর্কে। 'মিস যোশী, ইউ আর এ গ্রোন আপ গার্ল। লেখাপড়াও শিখেছ, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তোমার চাইতে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। একটু সাবধানে থেকো।'

মিস যোশী শুধু বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।'

তখন বয়সটাই এমন যে কারুর উপদেশ শুনতে মন চায় না। আগ্নেয়গিরির মত দেহের মধ্যে যৌবনের আগুন লুকিয়ে লুকিয়ে টগবগ করে ফুটছে। ফিফথ্ অ্যাভিনিউ আর টাইমস্ স্কোয়ারে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আগ্নেয়গিরি যেন আর শাসন মানতে চায় না, অধিকাংশ মেয়েরা সে শাসন মানেও না। সে শাসন মানবে কেন? ফিফথ্ অ্যাভিনিউ-টাইমস্ স্কোয়ার দিয়ে সন্ধ্যার আমেজী পরিবেশে একটু ধীর পদক্ষেপে মিস যশোদা যোশীর মত মেয়েরা

যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন কে যেন বার বার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'বিশ্ব সংসারে এসেছ দু'দিনের জন্য। আনন্দ কর, উপভোগ কর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ তোমার মত মেয়েরা কিভাবে রসের মেলায় পসারিণী হয়ে···!'

মিশ্রের উপদেশ বেসুরো ঠেকে যশোদার কানে। তবুও যে সে শুনেছে, তার জন্যই মিশ্র কৃতজ্ঞ। যশোদা তো অপমান করেও বলতে পারত, 'আমি কি করি বা না করি সেটা নান্ অফ্ ইওর বিজনেস।'

ঘরপোড়া গরু যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। মিশ্রও তাইতো এসব মেয়েরা বিদেশে এসে এমন স্বচ্ছন্দ হয়ে ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে ভয় পায়।

'জান তরুণ, কাল রাত্রে চৌবের বাড়ী থেকে আমার ফিরতে ফিরতে রাত দেড়টা-দুটো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো সিগারেট নেই। টাইমস্ স্কোয়ারের কাছে গাড়ী পার্ক করে সিগারেট কেনার জন্য দু' পা এগিয়েই দেখি দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল মালহোত্রার সঙ্গে যশোদা···।'

তরুণ বলল. 'ওদের নিয়ে তুমি অত ভাববে না।'

বোতলখানেক হুইস্কী খেয়েও মিশ্র বেহুঁশ হয় না। একবার মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে। 'না ভেবে যে থাকতে পারি না তাই। ওদের দেখলেই যে আমার অমলার কথা মনে হয়।'

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে মিশ্র পাথরের মত নিশ্চুপ নিশ্চল হয়ে বসে পড়ে। চোখের জলও গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

তরুণের মনে পড়ল সেই পুরনো দিনের কথা।···

সেকশন অফিসার প্রকাশচন্দ্র প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে তরুণকে খবর দিল, 'জানেন স্যার, জেনেভা থেকে এক্ষুনি একটা মেসেজ এসেছে, মিশ্র সাহেবের মেয়ে সুইসাইড করেছে।'

তরুণ চমকে ওঠে, 'হোয়াট আর ইউ সেইং? অমলা সুইসাইড করেছে?'

পাঁচ হাজার মাইল দূরে ছিলেন মিশ্র। কিন্তু খবরটা ওয়েস্ট ইউরোপিয়ান ডেস্কে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল দিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘরে ঘরে। বাইরের দুনিয়ার লোক মিঃ মিশ্রকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবলেও ফরেন মিনিস্ট্রির সবাই তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আপনজ্ঞান করে।

যে সমস্যার কথা কাউকে বলা যায় না, মিশ্র সাহেবকে হাসিমুখে সে কথা বলা যায়; যে সমস্যার সমাধান করতে আর কেউ পারবেন না, তাও মিশ্র সাহেব হাসতে হাসতে ঠিক করে দেবেন। সন্ধ্যার পর হুইস্কী না খেয়ে যেমন তিনি থাকতে পারেন না, তেমনি সহকর্মী ও বন্ধুদের উপকার না করেও স্থির থাকতে পারেন না।

লাঞ্চের পর অফিসে এসেই মিশ্র টেলিফোনের 'বাজার' বাজিয়ে হীরালালকে তলব করলেন, 'চলে আসুন।'

মিশ্র তখনও সিগারেট খাচ্ছেন। তিন-চারটে ফাইল নিয়ে হীরালাল ঘরে ঢুকতেই কেমন যেন খটকা লাগল। ভ্রূ-কুঁচকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতেই বুঝলেন হীরালাল বেশ চিন্তিত।

হীরালাল মিশ্র সাহেবের সামনে ফাইলগুলো নামিয়ে রাখলেন।

মিঃ মিশ্র সিগারেটের শেষ টানটা দিতে দিতে বাঁকা চোখে আরেকবার হীরালালকে দেখে নিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে আপনার?'

'না স্যার, তেমন কিছু না।'

'দেখ হীরালাল, আমার কাছে বলতেও তোমার দ্বিধা হয়?'

সকৃতজ্ঞ হীরালাল বলে, 'আপনার কাছে আর কি দ্বিধা করব। তবে…।'

'তবে আবার কি? টেল মী ফ্র্যাঙ্কলি হোয়াট্‌স্ রং উইথ ইউ?'

হীরালাল আর চেপে রাখতে সাহস করে না। জানে এবার না বললে বকুনি খাবে।

'কালকেই চিঠি পেয়েছি আবার মেয়েটার শরীর খারাপ হয়েছে, অথচ ...।'

'আপনি তো জানেন আমার ডিক্সনারিতে 'ইফস্' অ্যাণ্ড 'বাট' লেখা নেই।'

ড্রয়ার থেকে বার্কলে ব্যাঙ্কের চেক বই বের করে একশ' পাউণ্ডের একটা চেক দিলেন হীরালালকে। 'পাতিয়ালার ঐ অপদার্থ শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েটাকে আর ফেলে না রেখে এখানেই নিয়ে আসুন।'

'আপনি আবার ।'

'ফরেন সার্ভিসে কাজ করে করে বড় বেশী ফরম্যালিটি করতে শুরু করেছেন। আচ্ছা, আজ যদি আমারই দু'তিনটে মেয়ে থাকত ?'

এর পর কি আর কিছু বলা যায় ? না। হীরালাল টেবিলের ওপর ফাইলগুলো রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।...

'কি বললে ? ব্যাভেরিয়ান বিয়ার খেতে ইচ্ছা করছে ?'

'তারপর ঐ তাজ-এ একটু সিম্পল চিকেন রাইস-এর লাঞ্চ', ছোকরা ডিপ্লোম্যাট বড়ুয়া আর্জি পেশ করে।

'দ্যাখ ছোকরা, তুমি তো জান আমি ডিসআর্মামেণ্ট—সামিট—বিগ পাওয়ার রিলেশান্স ডিল করি। সুতরাং এত ছোটখাট সামান্য বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আমার কাছে এসো না।'

প্রাইম মিনিস্টার, ফরেন মিনিষ্টার, ফরেন সেক্রেটারী থেকে শুরু করে ক্লার্ক বেয়ারাবারা পর্যন্ত মিশ্রকে ভালবাসে। ভাল না বেসে যে উপায় নেই।

সেই মিশ্র সাহেবের আদুরে দুলালী অমলা আত্মহত্যা করেছে শুনে সবাই মর্মাহত হলেন।—

বছর খানেক পরে তরুণ মিঃ মিশ্রকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। সন্ধ্যার পর বোতল বোতল মদ গেলেন আর ইয়ং ইণ্ডিয়ান মেয়ে দেখলেই বলেন, 'মনে হয় অমলাও ওদের মত কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্ষুনি দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে।'

অমলা তখন আট ন' বছরের হবে আর কি। মিসেস মিশ্র মারা গেলেন ক্যান্সারে। বহুদিন ধরেই ভুগছিলেন। বিশেষ করে শেষের বছর দু'য়েক অমলার সব কিছুই মিশ্রসাহেব করতেন। স্ত্রী মারা যাবার পর মুষড়ে পড়লেও অমলাকে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে অমলা বড় হলো। সেই ছোট্ট কিশোরী অবলা অমলা প্রাণ-চঞ্চলা হয়ে উঠল। দিগন্তবিস্তৃত অতল সমুদ্রের এই ছোট্ট দ্বীপে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুললেন মিশ্র সাহেব।

ঘরে কোন ভাইবোন—মাকে না পেয়ে সাহচর্যের জন্য অমলা বাইরের দুনিয়ায় তাকিয়েছিল। কত ছেলে, কত মেয়ে ছিল তার বন্ধু। মিঃ মিশ্র বাধা দেন নি, বরং উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সাহচর্য, বন্ধুত্বের সুযোগে এমন সর্বনাশ!

'হ্যাঁ হ্যাঁ তরুণ, ঐ ছোকরাগুলো দেহের আগুন, যৌবনের জ্বালা, চোখের নেশা চরিতার্থ করার জন্য যদি অমলার মত ঐ যশোদারও চরম সর্বনাশ করে? যদি নিজের লজ্জা লুকোবার জন্য অমলার মত যশোদাও যদি…।'

আর বলতে পারেন না। কাঁপা কাঁপা হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরেন তরুণকে। ছলছল চোখ দুটো জলে ভরে যায়।

একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'এই বিশ-বাইশ বছরের মেয়েগুলোকে সুন্দর শাড়ী পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরতে দেখলেই কেবল অমলার কথা মনে হয়।'

তরুণ কি জবাব দেবে? কিচ্ছু বলতে পারে না। একটু

সন্তানস্নেহ দেবার জন্য এমন কাঙ্গালকে কি বলবে সে? মায়ের কোল খালি করে শিশু সন্তান চলে গেলে সে মা উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। মিশ্র সাহেবের মনের মধ্যে অমনি জ্বালা করে দিন-রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা।

'আচ্ছা তরুণ, অনেকে তো অন্যের মাকে মা বলে ডাকে, অন্যের বাবাকে বাবা ডাকা যায় না?'

এবার তরুণের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আর যেন সে সহ্য করতে পারছে না। শুধু বলে, 'নিশ্চয়ই ডাকা যায়।'

হাসিতে লুটিয়ে পড়েন মিশ্র। 'ডোণ্ট টক ননসেন্স তরুণ। তুমি কি ভেবেছ আমি মাতাল হয়েছি? যা বোঝাবে তাই বুঝব?'

ইউ-টু ফ্লাইট, প্যারিস সামিট ও তারপর ইউনাইটেড নেশনস নিয়ে এতদিন ব্যস্ত থাকায় বেশ ভাল ছিলেন মিঃ মিশ্র। একটু অবসর পেয়ে আবার সব অতীত ভিড় করছে ওর কাছে।

পার্টি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রায় সবাই চলে গেছেন। এক কোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিশ্র তরুণের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

ধীরে ধীরে অ্যাম্বাসেডর এসে পাশে দাঁড়ালেন। মিশ্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কাল কত তারিখ মনে আছে?'

'টুমরো ইজ টোয়েন্টি সেকেণ্ড।'

'কাল আমার মেয়ে আসছে, তা জান?'

'সিওর স্যার। বি-ও-এ-সি ফ্লাইট সিক্স-জিরো-ওয়ান।'

অ্যাম্বাসেডর খুশীতে হেসে ফেললেন। 'দ্যাটস্ রাইট। আমি তো আবার পরশু দিনই জেনেভা যাচ্ছি। সুতরাং ভুলে যেও না টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট গার্ল।'

'নো স্যার, নট অ্যাট অল।' মিশ্র এবার একটু মুচকি হাসতে হাসতে বলেন, 'ইফ আই মে সে ফ্রাঙ্কলি স্যার, রীণা আপনার চাইতে আমাকেই বেশী পছন্দ করে।...'

অ্যাম্বাসেডর তরুণের কানে কানে বললেন, 'প্লিজ টেল মিশ্র যে আমি তার জন্য আনন্দিত।'

আর কোন কথা না বলে অ্যাম্বাসেডর বিদায় নিলেন। 'গুড্ নাইট! সী ইউ টুমরো।'

'গুড নাইট স্যার '

। আট ।

কবি রবার্ট ফ্রস্ট রসিক ছিলেন। কবির মতে ডিপ্লোম্যাটরা মহিলাদের জন্মদিন মনে রাখেন, ভুলে যান তাঁদের বয়স। জন্মদিনের ঐ আনন্দটুকু, ঐ রসটুকুই কূটনীতিবিদদের প্রয়োজন; কালের যাত্রায় বিলীয়মান যৌবনের হিসাব রাখতে তাঁদের আগ্রহ নেই।

ডিপ্লোম্যাট হয়েও অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জী মহিলাদের জন্মদিনই মনে রাখেন না, স্মরণ রাখেন তাদের বয়স। বিলীয়মান যৌবনের হিসাব। শুধু আনন্দ, শুধু রস, শুধু মধু পান করেই উনি নিজের মনকে খুশী রাখতে পারেন না। বেদনাবিধুর আবছা অন্ধকার মনের কথাও তিনি জানতে চান।

হঠাৎ দেখলে ঠিক টপ্ কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট বলে মেনে নিতে মন চায় না। আর পাঁচজন ডিপ্লোম্যাটের মত চাকচিক্য স্মার্টনেস্, গ্ল্যামার একেবারেই নেই। মাথায় টপ হ্যাট বা হাতে লম্বা সরু ছাতা না থাকলেও পরনে পুরনো কালের ইংরেজদের মত ঢিলেঢোলা থ্রি-পিস্ স্যুট্। সিলভার চেন-এর সঙ্গে মোটা পকেট ওয়াচ্ না ব্যবহার করলেও অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীকে অনেকটা কেম্ব্রিজের বিখ্যাত সেলউইন কলেজের ওরিয়েন্টাল ফিলসফির অধ্যাপক মনে হয়।

সবাই যে অ্যাম্বাসেডর রঘুবীর হবেন তার কি মানে আছে? ভরা যৌবনে আই. সি. এস. হয়ে দেশে ফেরার বছরখানেকের

মধ্যেই রঘুবীর ডেরাডুনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। মাস ছ'য়েক ঘুরতে না ঘুরতে লাহোরের স্যার বীরেন্দ্রবীরের পুত্র রঘুবীর প্রভু ভক্তির অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। গান্ধীজী ও সঙ্গীদের 'টিল দি কোর্ট রাইজ' পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

ঘটনাটা নেহাতই সামান্য। তবু এমন সুযোগ তো বার বার আসে না! মীরাট থেকে মজঃফরনগর, রুরকি, ডেরাডুন হয়ে গান্ধীজী মোটরে মুসৌরী যাচ্ছিলেন। মীরাট আর মজঃফরনগরে মিটিং ছিল, কিন্তু রুরকি বা ডেরাডুনে কোন প্রোগ্রাম ছিল না। তবে অভ্যর্থনার জন্য ডেরাডুন শহরের ধারে বেশ ভিড় হয়েছিল।

রঘুবীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট পাঠালেন, 'ডেরাডুন শহরে মিলিটারী অ্যাকাডেমির ছেলেরা হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইচান্স গান্ধীজী যদি ক্লক টাওয়ারের পাশ দিয়ে যাবার সময় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন তবে মিলিটারী অ্যাকাডেমির ছাত্ররাও নিশ্চয়ই·····। তাছাড়া যেমন অভ্যর্থনার উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে তাতে রিস্ক না নেওয়াই ঠিক হবে।'

সুতরাং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টম জোন্স্ সাহেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রঘুবীর আদেশ জারী করলেন, 'মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইজ হিয়ারবাই নোটিফায়েড দ্যাট ইন দি ইন্টারেস্ট অফ সিকিউরিটি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ল অ্যাণ্ড অর্ডার ইন দি রিজিয়ন, আপনি ও আপনার সাঙ্গপাঙ্গরা ডেরাডুন শহরে যাবেন না।'

ডেরাডুন শহরের প্রান্তে কয়েক শ' দেশী-বিদেশী সিপাহী নিয়ে রঘুবীর মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানালেন।

গাড়ী থেকে নেমে একটু মুচকি হেসে গান্ধীজী বললেন, 'কত দিনের জন্য অতিথি হতে হবে?'

রঘুবীর জানালেন, 'না না, ওসব কিছু না। তবে স্যার, ডেরাডুন শহরটা এড়িয়ে যান।'

গান্ধীজী আইনজীবীর মত পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মহামান্য সরকার মুসৌরী যাবার জন্য নতুন কোন রাস্তা তৈরী করছেন নাকি ?'

'নো স্যার, দিস ইজ দি ওনলি রোড টু মুসৌরী।'

'তবে কি আমি উড়োজাহাজে...... ?'

গান্ধীজী দলবল দিয়ে এগিয়ে যেতেই রঘুবীর গ্রেপ্তার করে কোর্টে নিয়ে গেলেন। বিচারে 'টিল দি কোর্ট রাইজ' . . ।

সেই রঘুবীর স্বাধীন ভারতবর্ষের অ্যাম্বাসেডর হয়ে আমেরিকায় গিয়ে বললেন, 'তোমাদের অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন আর আমাদের গান্ধীজী বিশ্বমানব-সমাজের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত।' ইটালীতে অ্যাম্বাসেডর হবার পর ভ্যাটিকান প্রধান পোপের কাছে পরিচয়পত্র দেবার সময় বললেন, 'ত্রাণকর্তা যীশুকে আমি দেখিনি। কিন্তু ভারত-ত্রাণকর্তা মহাত্মা গান্ধীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই মহামানবের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে আমি মহাপ্রাণ যীশুকে উপলব্ধি করেছি।'

রঘুবীর সাহেব অ্যাম্বাসেডর হয়ে নানাভাবে দেশসেবা করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। আমরা বাঙালীরা বড়বাজার-পোস্তার হোলসেলার দেখেই কুপোকাৎ। সুতরাং জার্মান ভারতের সে বাণিজ্য চুক্তির হিসেব রাখাই আমাদের পক্ষে দায়। একশ' পঁয়ত্রিশ বেসিকের কেরানী বা একশ' পঁচাওরের লেকচারার হয়েই মাটির পৃথিবী থেকে যাঁদের উদাস দৃষ্টি নীল আকাশের কোলে উড়ে যায়, তাঁদের পক্ষে কি শত শত সহস্র কোটি টাকার বিজনেসের অনুমান করা সম্ভব? ওঁরা বলেন মিলিয়ন, বিলিয়ন। বাঙালী ইন্টেলেকচুয়ালরা খবরের কাগজের প্রথম পাতা পড়েই গরম হন। কিন্তু যাঁরা ঐ মিলিয়ন-বিলিয়নের প্রসাদ পান তাঁরা খবরের কাগজের প্রথম পাতার চাইতে

ভিতরের পাতার স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোম্পানী মিটিং-এর রিপোর্ট বেশী পড়েন।

অ্যাম্বাসেডর রঘুবীরের জীবন-সঙ্গিনীর আদরের ছোট ভাইও খবরের কাগজের ঐ ভিতরের পাতার পাঠক ছিলেন। ভাগ্যবান ছোট শালাবাবু জিজাজীর কাছে একবার আব্দার করেছিলেন, 'ইন্দো-জার্মান ট্রেডের কিছু একটা পাওয়া যায় না?'

'হোয়াই নট? একটু মনে করিয়ে দেবার জন্য দিদিকে বলে দিও।'

রাইন নদীর জলে ওয়াটার জেট লঞ্চে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দূরের কারখানার চিমনিগুলো চোখে পড়তেই মিসেস রঘুবীর স্বামীকে বলেছিলেন, তোমার মনে আছে আমার ঐ ছোট্ট ভাইয়ের কথা?

'হাঁ জী।'

ক'দিন বাদেই বিখ্যাত এক জার্মান ফার্ম থেকে কোয়েরি এলো, মিলিয়ন মিলিয়ন মার্ক-এর মেসিনারী ইণ্ডিয়াতে পাঠাতে হবে কিন্তু আমরা অফিস খুলব না, রেসিডেণ্ট রিপ্রেজেনটেটিভ ও এজেন্সী দিতে চাই।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পাইপটা নামিয়ে রাখলেন রঘুবীর। তারপর বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এত বড় একটা ব্যাপার, আমাকে একটু ভাবতে হবে।'

'বেশ তো ভাবুন না। তবে দেখবেন ঐ ফার্ম যেন আর কোন ফেমাস ওয়েস্টার্ন এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের কাজ না করে।'

অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতে বললেন, 'ইউ আর মেকিং মাই টাস্ক মোর ডিফিকাল্ট।'

'ইওর একসেলেনসী অ্যাম্বাসেডর্স আর নট ফর অর্ডিনারী...।'

এক সপ্তাহ পরে তাগিদ এলো অ্যাম্বাসেডরের কাছে। জবাব গেল, ইণ্ডিয়াতে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে।

তিন সপ্তাহ পরে অ্যাম্বাসেডর রঘুবীর রেকমেণ্ড করলেন জলন্ধরের ছোট শালার ফার্মকে।

ফরেন সার্ভিসের দু'চারজন বিশ্বনিন্দুক বলেন, 'ছোট শালাবাবু গুরু দক্ষিণা স্বরূপ জামাইবাবুকে দিল্লীতে ফ্রেণ্ডস কলোনীর একটা আড়াই লাখ টাকার কটেজ উপহার দিয়েছেন।

রঘুবীরের মত আরো অনেক আদর্শহীন বীর আছেন ইণ্ডিয়ান ফরেন-সার্ভিসে। অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জী একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। টেবিলে যদি ফাইলের স্তূপ না থাকে তবে সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক জমান নিজের ঘরে। নানা কথার পর থার্ড সেক্রেটারী হঠাৎ বলে ওঠেন, 'স্যার, আপনার মত সহজ সরল মানুষ ইণ্টারন্যাশনাল ডিপ্লোম্যাসীতে যে কিভাবে সাকসেসফুল হলেন, তাই ভেবে অবাক হই।'

হাসতে হাসতে অ্যাম্বাসেডব জবার দেন, 'ভেরী সিম্পল রঙ্গস্বামী।

'To Thomas Moore'-এ বায়রন বলেছেন,

> "Here's a sigh to those who love me,
> And a smile to those who hate,
> And, whatever sky's above me,
> Here's a heart for any fate."

আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

> "নিজেরে করিতে গৌরবদান
> নিজেরে কেবলই করি অপমান
> আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
> ঘুরে মরি পলে পলে।
> সকল অহঙ্কার হে আমার
> ডুবাও চোখের জলে॥"

এই হচ্ছে ব্যানার্জী সাহেবের জীবন দর্শন। দৃষ্টিটা একটু সুদূর-

প্রসারী। তাইতো মিশ্র সাহেবের মাতলামীর পিছনে তাঁর অশান্ত স্নেহকাতর পিতৃ-হৃদয়টাই ওঁর চোখে পড়ে।

'জান তরুণ, এর চাইতে বড় সর্বনাশ, বড় ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আর নেই। শিশুর জন্মের পর মায়ের বুক স্তন্যরসে ভরে যায়। কিন্তু ভাগ্যের দুর্বিপাকে যদি সে শিশু মায়ের কোল খালি করে হঠাৎ চিরকালের জন্য লুকিয়ে পড়ে তবে ঐ বুকের যন্ত্রণায় মা পাগল হয়ে ওঠেন।'

এবার মুখটা উঁচু করে মিঃ ব্যানার্জী বলেন, 'ওটা শুধু দেহের যন্ত্রণা নয়, ওর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যর্থ মাতৃত্বের বেদনা।'

তরুণ কথা বলতে পারে না। শুধু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর দিকে।

ইন্টার সেশন পিরিয়ডে ইউনাইটেড নেশনস্ হেড কোয়ার্টার্সে বেশী ভিড় থাকে না। এমন কি ঐ ছোট্ট ক্যাফেটেরিয়াটাও যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। অধিকাংশ দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি-অ্যাম্বাসেডররা হয় ছুটিতে না হয় বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। জুনিয়র ডিপ্লোম্যাটরাও একটু ঢিলে দেন কাজকর্মে।

সেদিন সকালে ট্রাস্টিশিপ্ কাউন্সিলের একটা ছোট্ট সাব-কমিটির মিটিং ছিল। আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে অত বিরাট ইউনাইটেড নেশনস হেড কোয়ার্টারটা প্রায় খালি হয়ে গেল। আট তলায় ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের ঘরে মিঃ ব্যানার্জী আর তরুণ বসে কথা বলছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নোংরামি থেকে হঠাৎ যেন ইউনাইটেড নেশনস্ হেড-কোয়ার্টার্স একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। তাইতো মনের কথা, প্রাণের ভাষা বলতে পারছিলেন অ্যাম্বাসেডর সাহেব।

দৃষ্টিটা হাডসন নদীর এপার-ওপার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে নীল আকাশের কোলে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন মিঃ ব্যানার্জী। রিভলভিং চেয়ারটা একটু নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'মিশ্রকে দেখলে বড় কষ্ট

হয়। রীণাকে কাছে পেলে ওর মনের শূন্যতা, ব্যর্থ পিতৃত্বের জ্বালা যেন আমাকে আরো বেশী আপসেট করে দেয়।'

মিসেস ব্যানার্জী ভাবতে পারেন নি ব্যানার্জী সাহেব এখনও ইউ এন-এ আছেন। তরুণের ফ্ল্যাটে ফোন করে জবাব না পেয়ে ভাবলেন নিশ্চয়ই ওরা দু'জনে কোন জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন। ওদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়েই এয়ারপোর্ট রওনা হতে হবে। তাইতো মিশ্রকে ফোন করলেন। 'ভাইসাব, ব্যানার্জী সাহেবের কি খবর বলো তো ?'

'কেন এখনও ফেরেন নি ?'

'না। কোন জরুরী কাজে গিয়েছেন কি ?'

'তেমন কোন জরুরী কাজের কথা তো আমি জানি না। আচ্ছা একবার তরুণকে ফোন করছি।'

'তরুণও বাড়ীতে নেই···।'

মিসেস ব্যানার্জীর কথা শেষ হবার আগেই মিঃ মিশ্র বললেন, 'দেন ডোণ্ট ওরি। দু'জন সেন্টিমেন্টাল বেঙ্গলী ঠিক কোথাও বসে আকাশ দেখছেন, না হয় আমার দুঃখের ব্যালান্স-সীট মেলাচ্ছেন।'

মিশ্রের কথা শুনে মিসেস ব্যানার্জীও হেসে ফেলেন। 'তাহলে ভাই একটু দেখুন না। আবার তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে রীণাকে আনতে···।'

'তাতে ব্যানার্জী সাহেবের কি ? সে তো আমার আর আপনার চিন্তা।'

মিশ্র টেলিফোন নামিয়ে রেখে আর দেরী করলেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হলেন ইউ এন-এ। গাড়ী পার্ক করতে গিয়ে দেখলেন দুটি পরিচিত গাড়ী প্রায় পাশাপাশি রয়েছে। অ্যাম্বাসেডর সাহেবের ড্রাইভারটাও কোথাও আড্ডা দিতে গেছে। মিশ্র দুষ্টুমি করে এমনভাবে নিজের গাড়ীটা পার্ক করলেন যে ঐ দুটি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব! লিফট দিয়ে উঠতে

উঠতে যদি ঐ দু'জন সেন্টিমেন্টাল বাঙালী নেমে আসেন, তাহলে বুঝবেন, যার সুখ-দুঃখের ব্যালান্সসীট তৈরী করতে ওরা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন, সে এসে গেছে।

অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর ঘরের সামনে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়ালেন মিঃ মিশ্র। একবার ভাবলেন নক্ করবেন; আবার ভাবলেন, না-না, ওসব ফর্মালিটির কি দরকার।

আস্তে দরজাটা ঠেলে মিশ্র ভিতরে ঢুকতে দু'জনেই অবাক।

অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জী আর তরুণ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'মিশ্র, ইউ আর হিয়ার?'

হাসিমুখে মিশ্র জবাব দেয়, 'হোয়াট এলস কুড আই ডু?'

একবার নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিশ্র অ্যাম্বাসেডর সাহেবকে বললেন, 'স্যার, মিসেস ব্যানার্জি বলছিলেন আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে তবে উনি এয়ারপোর্ট···!'

'ও, তাই তো!'

তাড়াহুড়ো করে সবাই উঠে পড়লেন। নীচে এসে গাড়ীতে উঠবার সময় মিঃ ব্যানার্জী বললেন, 'তোমরাও বরং আমার ওখানেই চল। হোয়াটএভার ইজ দেয়ার, উই উইল শেয়ার ইট।'

মিশ্র হাসতে হাসতে বলেন, 'স্যার, রীণাকেই যখন প্রায় আমাকে দিয়ে দিয়েছেন তখন আর খাওয়া-দাওয়া শেয়ার করতে লজ্জা কি?'

মিশ্র আর মিসেস ব্যানার্জী এয়ারপোর্টে হাজির হবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, বি-ও-এ-সি অ্যানাউন্স দি অ্যারাইভাল অফ ফ্লাইট সিক্স-জিরো-ওয়ান ফ্রম লণ্ডন।

রীণা ঢিপ করে মাকে একটা প্রণাম করেই মিঃ মিশ্রকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানতাম আংকল, তুমি আসবেই!'

রীণার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মিশ্র উত্তর দিলেন, 'তোমরা

যা এক-একটা বিচিত্র শত্রু! তোমাদের কি চোখের আড়ালে রাখা যায়?'

রীণা আংকলের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে।

মিশ্র একগাল হাসি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডোণ্ট ওরি ডিয়ার ডার্লিং মামি!'

মিসেস ব্যানার্জীব মুখ খুশির আলোয় ভরে গেলেও একটু যেন বিরক্তির সুরে বললেন, 'আংকলকে বিরক্ত করা শুরু হলো, তাই না?'

আংকল মনে মনে হাসেন। ভাবেন পৃথিবীর সব রীণারাই যদি ওর গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিস ফিস করে অমন আব্দার করত, তাহলে হয়ত অমলাকে…।

সেদিন রাত্রে মিশ্রের থার্টি-টু স্ট্রীট ও ইস্টের ফ্ল্যাটে বিরাট উৎসবের আয়োজন হলো রীণার অনারে। অ্যাম্বাসেডর ও মিসেস ব্যানার্জী ছাড়াও ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের প্রায় সবাই এলেন।

নবাগত ইনফরমেশন অ্যাটাচি ভার্মা তরুণকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, মিঃ মিশ্রের এমন ডিনারে কোন ড্রিংকস নেই?'

'রীণার সামনে উনি ড্রিংক করেন না।'

'কেন?'

'বলেন মেয়েদের সামনে ড্রিংক করা উচিত না। তাছাড়া…।'

'তাছাড়া কি?'

'তাছাড়া বলেন, রীণাকে কাছে পেলে ওঁর কোন দুঃখ থাকে না, সুতরাং ড্রিংক করবেন কেন?'

এত বিরাট ব্যাপক আয়োজন। তরুণ খাবে কি? শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখে মিশ্রকে। কপালের সেই চিন্তার রেখাগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে, ক্লান্ত মানুষটির বিষণ্ণ শূন্য দৃষ্টি যেন আর নেই।

কাজকর্মের পর যে মিশ্র রোজ সন্ধ্যার পর নিজেকে ভুলে যান, স্থবির হয়ে বসে বসে শুধু বোতল বোতল মদ গেলেন, তিনি যেন নবযৌবন ফিরে পেয়েছেন। কত চঞ্চল, কত প্রাণবন্ত! কত সুন্দর, কত প্রিয়!

তরুণ এগিয়ে গেল অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর কাছে। 'স্যার, আপনি বাড়ী যাবেন না? রাত্রেই তো সব পেপার্স ঠিকঠাক করে রাখতে হবে, নয়ত কাল যাবেন কি করে?'

'যাব কি, এখনও খাওয়াই হয় নি।'

'সে কি?'

'আজ কি আমাকে দেখাব সময় আছে মিশ্রের?' অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতেই বললেন।

তরুণও হাসে। 'তা ঠিকই বলেছেন স্যার। রীণাকে কাছে পেলে উনি প্রায় পাগল হয়ে ওঠেন।'

একটা ছোট্ট চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন অ্যাম্বাসেডর। তারপর বললেন, 'রীণাকে নিয়ে ওর মাতামাতি দেখতে বেশ লাগে। জান তরুণ, নিজের স্ত্রীকে, নিজের সন্তানকে তো সবাই ভালবাসে। কিন্তু যখন আর পাঁচজনে ওদের ভালবাসে তখনই তো সত্যিকার সার্থকতা।'

তরুণ কোন জবাব দেয় না। অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর হৃদয়বত্তা মুগ্ধ করে ওকে।

'তাছাড়া আর একটা দিক আছে। যাঁরা অন্যের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, স্নেহ করে, তাঁদের মহত্বের কি তুলনা হয়?'

ডিসআর্মামেন্ট কন্ট্রোল কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য মিঃ ব্যানার্জী পরের দিন জেনেভা চলে গেলেন।

রীণার পনের দিনের ছুটি ফুরোতেও সময় লাগল না। মিশ্র আবার ফিরে পেলেন তাঁর পুরনো দিনের যন্ত্রণা আর মদের বোতল। তরুণ ফিরে পেল তার ছন্দহীন জীবন।

পনেরটা দিন তরুণ শুধু দেখেছে মিশ্রের পাগলামি, আত্মভোলা মানুষটির অন্ধ স্নেহ। মনে মনে ভক্তি করেছে, শ্রদ্ধা করেছে ঐ মাতালটিকে, যাঁকে একদল ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস বলে ডিবচ, স্কাউণ্ড্রেল এবং আরো কত কি!

টেলিভিশনের পর্দায় বেসবল খেলা নিয়ে অতগুলো লোকের হৈ-চৈ শুনতে বড় বেসুরো লাগল। সুইচটা অফ করে কোণার সিঙ্গল সোফাটায় চুপ করে বসে পড়ল তরুণ।

আকাশ-পাতাল চিন্তা এল মনে। আস্তে আস্তে চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেল। দুনিয়াটা ধোঁয়াটে, ঘোলাটে মনে হল। ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে হারিয়ে গেল ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র। আস্তে আস্তে মনের পর্দায় কতকগুলো আবছা মূর্তি এসে ভিড় করল। কখন যে ভিড় সরিয়ে ইন্দ্রাণীর মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তরুণ তা বুঝতে পারল না।

নিঃসঙ্গ তরুণ মাঝে মাঝেই এমনি দেখা পায় ইন্দ্রাণীর। মনে মনে কত কথা বলে, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝে ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে এমন চিৎকার করে যে পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস রজার্স না ছুটে এসে পারেন না।

'মিট্রা! ইউ অয়ার শাউটিং টু সামবডি?'

লজ্জিত তরুণ বলে, 'আই অ্যাম সরি মিসেস রজার্স।'

'সরি হবার কিছু নেই, তবে তুমি তো ভীষণ চুপচাপ থাকো। তাই হঠাৎ তোমার চেঁচামেচি শুনে।'

সেদিন বোধহয় রজার্স পরিবার কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন তাই মিসেস রজার্স ছুটে এলেন না। বাজারের আওয়াজ শুনে তরুণের চিৎকার থেমে গেল। তারপর দরজা খুলে যাঁকে দেখল, তিনি মিঃ মিশ্র।

'তুমি ইন্দ্রাণীকে এত ভালবাস?'

তরুণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মিঃ মিশ্রের প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে? চুপ করে রইল।

মিঃ মিশ্র তরুণের কাঁধে দুটি হাত রেখে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এত ভালবাসা তোমার মধ্যে চাপা আছে? আমি তো বোতল বোতল মদ খেয়েও ওই অমলার মুখখানা ভুলতে পারি না। তুমি তো আমার মত মাতাল নও কিন্তু কি করে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত এই জ্বালাকে চেপে রাখ তরুণ?'

তরুণ এবার মুখ তুলে জানতে চায়, 'আমি কি খুব বেশী চিৎকার করছিলাম?'

মিশ্রের মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'চল চল, ভিতরে গিয়ে বসা যাক।'

তরুণের পিছনে পিছনে প্যাসেজ দিয়ে ড্রইংরুমের দিকে এগুতে এগুতে মিশ্র বলেন, 'আমি মাঝে মাঝে একলা থাকলে চিৎকার করে অমলাকে কত কথা বলি।'

'তাই বুঝি?'

ড্রইংরুমে বসার পর মিশ্র বললেন, 'অমলা মারা গেলেও হারিয়ে যায় নি আমার জীবন থেকে, মন থেকে। কথা না বলে থাকবো কেমন করে বলো?'

হঠাৎ মিশ্র পাল্টে গেলেন। 'যাকগে, ঐ হতচ্ছাড়ী বোকা মেয়েটার কথা বলতে গেলেও আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বাদ দাও ওসব। গিভ মী এ গ্লাস অফ স্কচ।'

দু' গেলাস স্কচ নিয়ে এলো তরুণ।

মিশ্র স্কচের গেলাসটা তুলে ধরে বললেন, 'ফর অ্যান আর্লি অ্যাণ্ড হ্যাপি রি-ইউনিয়ন অফ টরুণ উইথ হিজ ইট্যারনল লাভার ইন্দ্রাণী!'

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেণ্টার টেবিলে গেলাসটা নামিয়ে রেখে তরুণ এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে ধরে বলল, 'মিট্রা হিয়ার।...কে? মালকানী? ইয়েস, খবর কি?'

মালকানীর কথা শুনে তরুণ বলল, 'এক্ষুনি মেসেজ এলো? হ্যাটস অল? থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই তরুণ মিশ্রকে জানাল, 'মালকানী জানাল এক্ষুনি মেসেজ এসেছে আমাকে বার্লিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

মিশ্রও গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন। 'তাহলে তুমি চললে।'

তরুণ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবছিল।

'এমার্সনের Conduct of Life পড়েছো তো নিশ্চয়ই। মনে পড়ে সেই লাইনটা?'

তরুণ জবাব দেয় না, চুপ করেই বসে রইল।

মিশ্রও উত্তরের অপেক্ষা না করে আপন মনে আবৃত্তি করল,

He who has a thousand friends

has not a friend to spare.

একটু চুপ করে স্কচের গেলাসে এক চুমুক দিল। 'আমারও হয়েছে তাই।'

এবার তরুণ একটু হেসে গেলাসটা তুলে নিল। এক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল। 'এমার্সন তো ওমরখৈয়ামকে বেস করেই ঐ কথা লিখেছেন। ওমরখৈয়ামের আরো কটা লাইন মনে পড়ছে—

মিশ্র কোন কথা না বলে আবার এক চুমুক খেয়ে চেয়ে রইল তরুণের দিকে।

তরুণ আবৃত্তি করল:

The Moving finger writes ; and having writ

Moves on : nor all our Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a line.

Nor, all our Tears wash out a Word of it.

'ঠিক বলেছ তরুণ, ডিপ্লোম্যাট হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে সব কিছুই যেন বিধির বিধান।'

। নয় ।

মেয়েদের বিয়ে ঠিক হবার পর আইবুড়ো ভাত খাওয়ান হয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে। ইংরেজীতে যাকে বলে ফেয়ারওয়েল ডিনার আর কি! ডিপ্লোম্যাটদের আগমন ও নির্গমন উপলক্ষে অনেকটা আইবুড়ো ভাত অর্থাৎ নেমন্তন্ন খাওয়াবার প্রথা আছে। সহকর্মী ছাড়াও অন্যান্য মিশনের বন্ধুদের বাড়ীতে খেতে হয় ও খাওয়াতে হয়। সমস্ত দেশের ফরেন সার্ভিসেই এই প্রথা। ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসও কোন ব্যতিক্রম নয়। সিনিয়র, জুনিয়র —কোন লেভেলেই নয়।

আমাদের দেশের আই-এ-এস বা আই-পি-এস অফিসারদের মধ্যে এসব সৌজন্যের বালাই নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টরা বদলি হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওঁদের সহকর্মীরা খুশি হন। সুতরাং ফেয়ারওয়েল ডিনারের প্রশ্ন নেই। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিতাড়িত বা পদত্যাগী মন্ত্রীকে বা কলকাতার বিদায়ী পুলিশ কমিশনারকে কেউ ভালবেসে ফেয়ারওয়েল ডিনার খাইয়েছেন বলে আজও শোনা যায় নি। আর যত ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাক, ফরেন সার্ভিসে এই সৌজন্যের দৈন্য নেই। অ্যাম্বাসেডরকে রি-কল বা তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও সৌজন্যমূলক ফেয়ার-ওয়েল ডিনারের ব্যবস্থা হয়।

শ'ছয়েক টাকায় যাঁরা ফরেন সার্ভিসে নতুন জীবন শুরু করেন, প্রথমে ফরেন পোস্টিং-এর সময় তো ফেয়ারওয়েল ডিনারের ঠেলায় তাঁদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। কৈ বাত নেই! তবুও নিদেন পক্ষে শতখানেক নেমন্তন্ন খেতে হয়, খাওয়াতে হয়, ছ'মাসের মাইনে অ্যাডভান্স নিয়েও তাল সামলান যায় না। হাই স্ট্যাণ্ডার্ড ও

এইসব সৌজন্য রক্ষা করতে অনেক তরুণ আই-এফ-এস'কেই দেনায় ডুবে থাকতে হয়। পরে অবশ্য ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ট্রানজিস্টার, টেপ-রেকর্ডার বিক্রী করে অবস্থা বেশ পাল্টে যায়।

নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে তরুণকেও ফেয়ারওয়েল ডিনার খেতে হলো, খাওয়াতে হলো। আসা-যাওয়ার নিত্য খেলাঘর হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের চাকরি। এখানে যেন কিছুই নিত্য নয়, সবই অনিত্য। তবুও মানুষ তো। তরুণের মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। একটু কষ্ট করেই মুখে হাসি ফুটিয়ে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে প্লেনে চড়ল।

প্লেনটা আকাশে উড়তেই তরুণের মন ভাসতে ভাসতে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল লণ্ডনে। মনে পড়ল বন্দনার কথা, বিকাশের কথা।

ইচ্ছা ছিল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দনার বিয়ে দেবে। হয় নি। ইউনাইটেড নেশনস-এ তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ছুটি নেওয়া অসম্ভব ছিল। তবুও তরুণের অমতে কিছুই হয় নি। বন্দনা চিঠি লিখেছিল, 'দাদা, খবরের কাগজ দেখেই বুঝতে পারছি কি নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যে তোমার দিন কাটছে। সারা রাত্রি কিভাবে তোমরা মিটিং কর, কনফারেন্স কর, আমি ভেবে পাই না। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তুমি ভুলতে পার না আমার কথা। তোমার চিঠিতে দু'-তিন রকমের বল-পেন ও কালি দেখেই বুঝি একসঙ্গে একটা চিঠি লেখারও সময় তোমার নেই।...তোমার কথামত এবার নিশ্চয়ই আমি বিয়ে করব। তবে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করার জন্য কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে কলকাতা যাওয়া কি সম্ভব? নাকি উচিত?'

পরের চিঠিতে বন্দনা লিখল, 'বিকাশকে তো তুমি ভালভাবেই চেন, জান। আমাদের হাইকমিশনেই তো কাজ করে। সুতরাং তোমাকে আর কি বলব! সারাদিন অফিস করে রিজেণ্ট স্ট্রীট পলিটেকনিকে অ্যাকাউণ্টেন্সি পড়ে বেশ ভালভাবে পাশ করেছে। মনে হয় এবার একটা ভাল চাকরি পাবে।'

বন্দনা জানত সব কথা খুলে না লিখলে দাদার অনুমতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই চিঠির শেষে লিখেছিল, 'ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি লুকিয়ে-চুরিয়ে ভালবাসার খেলা আমরা খেলিনি। যে অধিকার পাবার নয়, সে অধিকার ও চায় নি, আমিও নিইনি। তবে মনে হয় আমার মত দুঃখী মেয়েকে ও প্রাণ দিয়ে সুখী করতে চেষ্টা করবে।'

ওসব কথা ভাবতে ভাবতে আপন মনেই হেসে উঠল তরুণ। প্লেনের জানলা দিয়ে একবার নীচের দিকে তাকাল, দেখতে পেল না সীমাহারা আটলান্টিক। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেল বন্দনা আর বিকাশকে। রান্না-বান্না শেষ করে সাজা-গোজা হয়ে গেছে। সিঁথিতে, কপালে টকটকে লাল সিঁদুর পরাও হয়ে গেছে। বিকাশকে বকাবকি করছে, 'তোমার নড়তে-চড়তে বছর কাবার হবার উপক্রম। গিয়ে হয়তো দেখব দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে…।'

বিকাশ মজা করার জন্য বলছে, 'তোমার দাদা হলে কি হয়! আমার তো শালা। অত খাতির করার কি আছে?'

বন্দনা নিশ্চয়ই চুপ করে সহ্য করছে না।…'ভুলে যেও না দাদাব জন্যই আমাকে পেয়েছ। আর যত মাতব্বরী তো আমার সামনে। দাদাকে দেখলে তো ব্যস!'

মহাকাশেব কোলে ভাসতে ভাসতে কত কথাই মনে পড়ে।

নিউইয়র্ক থেকে বার্লিনে যাবার পথে সরকারীভাবে তিন দিন লণ্ডনে স্টপ-ওভার করা যাবে। শপিং-এর জন্য। বিচিত্র ভারত সরকারের নিয়মাবলী। ইংরেজ চলে গেছে। লাল কেল্লায় তেরঙ্গা উড়ছে, কিন্তু লণ্ডন আজও স্বর্গ! দিল্লী থেকে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, ঘানা যেতে হলেও ভায়া লণ্ডন! শপিং-এর জন্য লণ্ডনে স্টপ-ওভারের কথা ভাবলে অনেকেই হাসবেন। বণ্ড স্ট্রীট—অক্সফোর্ড স্ট্রীটে কিছু রেডিমেড জামা-কাপড় ছাড়া লণ্ডনে আর

কিছু কেনাব নেই। আই-সি-এসদের পলিটিক্যাল বাইবেলে বোধ করি লণ্ডন ছাড়া আর কোন জায়গার উল্লেখ নেই।

লণ্ডনে শপিং করাব মতলব নেই তরুণের। তিন দিন ছুটি নিয়ে লণ্ডনে ছ'দিন কাটাবে বলে ঠিক করেছে। বন্দনা-বিকাশদের সঙ্গে ক'দিন কাটাবার পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করবে। বন্ধু-বান্ধবদের জানিয়েছে, লণ্ডন হয়ে বার্লিন যাচ্ছে; জানায় নি কবে লণ্ডন পৌঁচচ্ছে। বন্দনাকেই শুধু একটা কেবল্ পাঠিয়েছে। 'রিচিং লণ্ডন, এ-আই ফ্লাইট, ফাইভ-জিরো-ওয়ান, ফ্রাইডে।'

এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে লণ্ডনেব দিকে! তবুও যেন তরুণেব আর ধৈর্য ধরে না। ধৈর্যেব সঙ্গে বোয়িং-এর প্রতিযোগিতা চলতে চলতেই হঠাৎ কানে এলো, 'মে আই হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন প্লীজ! উই উইল বী ল্যাণ্ডিং অ্যাট লণ্ডন হিথরো এয়ারপোর্ট ইন এ ফিউ মিনিটস ফ্রম নাউ। কাইণ্ডলি ফ্যাসেন ইওর সীট বেল্ট অ্যাণ্ড···!'

প্লেন থেকে বেরিয়ে টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ ঢুকতে গিয়েই উপরের দিকে ভিজিটার্স গ্যালারি না দেখে পারল না তরুণ। হ্যাঁ, ঠিক যা আশা করেছিল! বন্দনা আর বিকাশ আনন্দে উচ্ছ্বাসে হাত নাড়ছিল। পরম পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল ওদের দু'জনের সারা মুখে।

বেশ লাগল তরুণের। মনটা যেন মুহূর্তের জন্য উড়ে গেল। কাছের মানুষের ভালবাসা পাওয়া সম্ভব হলো না জীবনে। রিক্ত নিঃস্ব হয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিল। ইন্দ্রাণী-বিহীন জীবনে কোনদিন মুহূর্তের জন্য শান্তি পাবে, ভাবতে পারে নি। ইন্দ্রাণীর ব্যথা আজও আছে, একই রকম আছে। বুড়ীগঙ্গাব পাড়ে যাকে নিয়ে প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে জীবন-সূর্যের ইঙ্গিত দেখেছিল, আজও তাকে নিয়েই ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে। জীবনের এত বড় ট্র্যাজেডির

মধ্যেও তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে তরুণের জীবনে! আছে বন্দনা এবং আরো কত কে!

প্রথম দুটো দিন হোবর্নের ওদের ফ্ল্যাটের বাইরেই বেরুতে পারল না তরুণ। কতবার বলল, 'চলো বেড়িয়ে আসি। মার্বেল আর্চের পাশে বসে একটু গল্প-গুজব করে পিকাডিলিতে খাওয়া-দাওয়া করি।'

বন্দনা বলল, 'মার্বেল আর্চ আর বণ্ড ষ্ট্রীট দেখে কি হবে বল? তাছাড়া বাইরে যাবে কেন? আমার রান্না কি তোমার ভাল লাগছে না?'

এ-কথার কি জবাব দেবে তরুণ। কিছু বলে না। শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।

বিকাশ দু'দিন অফিসে যায় নি। অফিসে এখন ভীষণ কাজের চাপ। তাই আর ছুটি পায় নি। বন্দনা তো দশ দিনের ছুটি নিয়ে বসে আছে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চের পর তরুণ আর বন্দনা গল্প করছিল। আমেরিকার কথা, ইউনাইটেড নেশনস-এর কথা। কখনও আবার ব্যক্তিগত, পারিবারিক। সাধারণ, মামুলি কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ বন্দনা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আচ্ছা দাদা, তুমি মনসুর আলি বলে কাউকে চেন?'

তরুণ একটু চিন্তিত হয়ে জানতে চাইল, 'কোন্ মনসুর আলি?'

'উনি বললেন, তুমি নাকি ঢাকাতে ওদেরই বাড়ীর কাছে…।'

এবার তরুণ নিজেই চঞ্চল হয়ে উঠল। জানতে চাইল, 'চোখ দুটো কটা-কটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'খুব হাসাতে পারে?'

'ঠিক ধরেছ।'

আর শুয়ে থাকতে পারে না। এবার উঠে বসে। 'কোথায় দেখা হলো হতচ্ছাড়ার সঙ্গে?'

বন্দনা বড় খুশি হলো, একটু যেন আশার আলো দেখল। তরুণ কোনদিন তাকে ইন্দ্রাণীর কথা বলে নি। বলবার সম্পর্ক নয়। তাছাড়া তরুণ জানে নিজের মান, মর্যাদা, সম্ভ্রম রক্ষা করে অন্যের সঙ্গে মিশতে। প্রত্যক্ষভাবে কিছু না শুনলেও বন্দনা অনুমান করতে পেরেছিল। তাছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছিল তরুণ এই দুনিয়ায় ঐ একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনসুর আলির সঙ্গে আলাপ করার পর আরো অনেক কিছু জানতে পারল।

তরুণের কথায় বন্দনাও তাই একটু চঞ্চল না হয়ে পারে না। বলল, 'এবার আমাদের নববর্ষের ফাংশানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। কথায় কথায় তোমার কথা উঠল।'

'হতচ্ছাড়া হঠাৎ আমার কথা জিজ্ঞাসা করল ?

'আমাদের পাশেই মিঃ সরকার বলে ঢাকার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ আলি ওকে তোমার নাম করে বলছিলেন যে তোমরা নাকি একই পাড়ায় থাকতে।'

'হ্যা, হ্যাঁ। শুধু এক পাড়ায় নয়, একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়তাম।'

'তাই নাকি ?'

'তবে কি ? ওকে তো আমরা কোনদিন মনসুর আলি বলতাম না।'

'তবে ?'

'বলতাম মুসুর। ভারী মজার ছেলে। ওকে মুসুর বললেই ও বলতো, কি বলছ শ্বশুর ?'

হঠাৎ হাসিতে তরুণের সারা মুখটা ভরে উঠল। জানালা দিয়ে দৃষ্টিটা লণ্ডনের ঘোলাটে আকাশের কোলে নিয়ে গেল কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেল সেই ফেলে আসা অতীতের দিনগুলো।

পেটুক মনসুরকে নিয়ে কি মজাটাই না করত ওরা। তবে হ্যাঁ,

যে কাজ আর কোন ছেলেকে দিয়ে করানো সম্ভব হতো না, মনসুর হাসতে হাসতে সে কাজ করে দিতে পারত! তরুণের মা তাইতো মনসুরকে খুব ভালবাসতেন। রমনার বিলাস উকিলের মেয়ের বিয়ের সময় মনসুর না থাকলে কি কাণ্ডটাই হতো। শেষ রাত্তিরে লগ্ন! বিলাসবাবুর সঙ্গে কি তর্কাতর্কি হওয়ায় নাপিত চলে গেল। লগ্ন বয়ে যায় অথচ নাপিতের পাত্তা নেই। হঠাৎ মনসুর ঐ নাপিতেরই ষোল-সতের বছরের ছেলেকে হাজির করে মহা অপমানের হাত থেকে রক্ষা করল সবাইকে। সেই মনসুর লণ্ডনে এসেছিল?

'উনি তো এখন রেডিও পাকিস্তানে আছেন। বি-বি-সি'তে কি একটা ট্রেনিং নিতে এসেছিলেন।'

'ও জানল কেমন করে আমি লণ্ডনে ছিলাম?'

'তা তো জানি না। হয়ত কোন পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাটের কাছে তোমাব কথা শুনেছেন।'

কথাবার্তা চলতে থাকে। একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ বোধ করে বন্দনা। তবুও আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'আচ্ছা দাদা, তোমাদের ওখানে চিকাটোলা বলে কোন··?'

'চিকাটোলা নয়, টিকাটুলি।'

'মিঃ আলি ঐ টিকাটুলির এক রায়বাড়ীর কথাও বলছিলেন।'

টিকাটুলির রায়বাড়ী শুনতেই যেন তরুণের হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘাবড়ে গিয়ে সারা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুধু জানতে চাইল, রায়বাড়ীর কথা কি বলল!

'বিশেষ কিছু না। তবে খুব দুঃখ করলেন দাঙ্গায় ওদের সর্বনাশ হবার জন্য। আর বললেন, ও বাড়ীর মেয়ে ইন্দ্রাণী নাকি···!'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, গলার স্বরটা কেঁপে উঠল তরুণের। 'কি? কি হয়েছিল ইন্দ্রাণীর? মারা গিয়েছে তো?'

বন্দনা তরুণের হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'না না দাদা, উনি বেঁচে আছেন।'

'কি বললে বন্দনা ?'

'উনি মারা যান নি।'

তরুণ আপন মনে বার বার আবৃত্তি করল, 'ইন্দ্রাণী বেঁচে আছে—?'

মাথাটা নীচু করে কত কি ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন তলিয়ে গেল তরুণ। হয়ত মহা দুর্যোগের রাত্রে মহাসাগরের মাঝে দিগভ্রান্ত নাবিকের মত কোথায় যেন দূরে একটু আলোব ইঙ্গিত পেল।

কয়েকটা মিনিট কেউই কথা বলতে পারল না। শেষে বন্দনাই বলল, 'হ্যাঁ দাদা, উনি বেঁচে আছেন। তুমি একবার ঢাকায় বদলি হয়ে যাও না!'

মুখটা তুলে মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে তরুণ বলল, 'না না, বন্দনা, ঢাকায় আমি যাব না। ওখানে গিয়ে আমি টিঁকতে পারব না।'

'তুমি একটু চেষ্টা করলে ওকে খুঁজে বার করতে পারবে।'

তরুণ একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'ওর খোঁজ করা বড় কঠিন।'

'তুমি মনসুর আলি সাহেবকে একটা চিঠি দাও না।'

'না না, তা হয় না।'

'কেন হয় না ?'

'ফরেন সার্ভিসের লোক হয়ে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট অফিসারকে চিঠিপত্র দেওয়া ঠিক নয়।'

খবরটা এত অপ্রত্যাশিত যে স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা ছিল না তরুণের। বন্দনাই কি যেন ভেবে বলল, 'এক কাজ কর না দাদা। করাচিতে তোমাদের হাইকমিশনে কাউকে বলো না মনসুর আলি সাহেবের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে।'

বন্দনার প্রস্তাবে তরুণ যেন বাস্তব জ্ঞান ফিরে পায়। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। মনসুর কি করাচিতেই পোস্টেড ?'

'তাই তো বলেছিলেন।'

একটু চুপচাপ থাকে দু'জনে। বন্দনাই আবার বলে, 'আচ্ছা দাদা, তুমি একবার ঢাকায় তোমাদের ডেপুটি হাই-কমিশনের কাউকে বলো না ঐ টিকাটুলিতে খোঁজ-খবর নিতে! হয়ত কেউ না কেউ খবরটা জানতেও পারেন।'

চাপা গলায় তরুণ বলে, 'হ্যাঁ, তাও নিতে পারি।'

বন্দনার কিছু কেনাকাটার ছিল। তাই এবার উঠে পড়ল।

'কোথায় চললে ?'

'এই একটু দোকানে যাব।'

'কেন ?'

'আজ তিনদিন তো বাড়ীব বাইরে যাই নি। কিছু কেনাকাটা…।'

হাসি-খুশিভরা তরুণ বলল, 'আর দোকানে যেতে হবে না। বিকাশ এলে আমবা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ব, বাইরেই খাওয়া-দাওয়া করব!'

অনেকদিন পর হঠাৎ একটু আশার আলো দেখতে পাবার পর তরুণের মনটা খুশীতে ঝলমল করে উঠেছিল। বন্দনা তাই আর বাধা দিতে পারল না। 'ঠিক আছে। আজ খুব মজা করা যাবে। তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'কিছু আনতে হবে ?'

'হ্যাঁ দাদা, একটু কফি আনতে হবে।'

'না না, আর দোকানে যেতে হবে না। তার চাইতে আমি বিকাশকে ফোন করে দিচ্ছি যে আমরাই আসছি, ও যেন ওয়েট করে।'

'একটু কফি খেয়ে বেরুব না ?'

'কি দরকার? বেরিয়ে পড়ি। তারপর তিনজনে একসঙ্গে কোথাও কফি খেয়ে নেব।'

গুরুগম্ভীর ধীর-নম্র তরুণ হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেক দিনের জমাট বাঁধা বরফ যেন প্রভাতী সূর্যের রাঙা আলোয় একটু একটু করে নরম হ'তে শুরু করল।

রাত্রে শোবার পর বন্দনা বিকাশকে বলল, 'খবরটা শোনার পর থেকে দাদা কেমন পাল্টে গেছেন দেখেছ?'

'হ্যাঁ। ত্নুনিয়ায় তো আর কেউ নেই। সুতরাং খবরটা শোনার পর আনন্দ হওয়া তো স্বাভাবিক।'

'ওরা ত্নু'জনে যেদিন মিলতে পারবে, সেদিন কি হবে বলো তো?'

বিকাশ মজা করে বলে, 'আমরা যেদিন প্রথম মিলেছিলাম, সেদিনকার আনন্দের চাইতে বেশী কিছু হবে কি?'

বিকাশকে ছোট্ট একটা চড় মেরে বন্দনা বলল, 'তোমার মত অসভ্য ছাড়া একথা আর কে বলবে?'

আর মাত্র একটা দিন। তরুণ সারাদিন ঘোরাঘুরি করে পুরনো সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে এলো। টুক-টাক কিছু কাজকর্ম ছিল, তাও সেরে ফেললো।

রাত্রে বন্দনা নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াল। তারপর বেশ খানিকটা গল্প-গুজব করে সবাই শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই এয়ারপোর্ট রওনা দিল। যথারীতি বন্দনার চোখ ত্নুটো ছলছল করছিল। তরুণ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এবার আর ত্নুঃখ কি? বছরে একবার তোমরাও যেতে পারবে, আমিও আসতে পারব।'

বি-ই-এ'র প্লেনে তরুণ রওনা হলো বার্লিন।

কলকাতার বৌবাজার-বৈঠকখানার সঙ্গে রাসবিহারী-সাদার্ন অ্যাভিন্যুর আশ্চর্য পার্থক্য থাকলেও তুলনা হতে পারে, কিন্তু লণ্ডনের সঙ্গে বার্লিনের তুলনা? অসম্ভব, অবাস্তব, অকল্পনীয়। বরানগর-

কাশীপুরের পুরোনো জমিদার বাড়ীর গেটে সিমেণ্টের সিংহমূর্তি দেখে শিশুদের কৌতূহল জাগতে পারে, সহায়-সম্বলহীন অধস্তন কর্মচারীদের ভক্তি বা ভয় হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে আজ সেটা কৌতুকের উপকরণ মাত্র। ঐসব জমিদারবাড়ীর ঐতিহ্য থাকলেও ওদের দারিদ্র্য কারুর দৃষ্টি এড়াবে না। লণ্ডন যেন ঐ কাশীপুর-বরানগরের জমিদারবাড়ীগুলির বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র। তাই তো লণ্ডনের সঙ্গে বার্লিনের কোন তুলনাই হয় না।

শুধু লণ্ডন কেন, নিউইয়র্কের সঙ্গেও বার্লিনের কোন তুলনা হয় না। পৃথিবীর সব চাইতে ধনীর দেশ আমেরিকা। নিউইয়র্ক তার মাথার মণি—শো উইণ্ডো। তবুও সেখানকার ডাউন টাউনের মানুষের দারিদ্র্য, জৌলুসভরা টাইমস স্কোয়ারে ভিখারী দেখলে চমকে উঠতে হয়। কেন বেকারী ? আমেরিকার কত অজস্র নাগরিক আজও অন্ন-বস্ত্রের জন্য হাহাকার করছে !

তাইতো বার্লিনের সঙ্গে নিউইয়র্কেরও তুলনা হয় না, হতে পারে না ; বার্লিনে বেকার ? ভিখারী ? নিশ্চয়ই মানুষটা উন্মাদ। তা না হলে ওখানে কেউ বেকার থাকে না, ভিখারী হয় না।

এসব তরুণ আগেই জানত। পোস্টিং না হলেও আসা-যাওয়া করতে হয়েছে কয়েকবার। সেই বার্লিনে চলেছে তরুণ।

। দশ ।

বাংলা ও পাঞ্জাবের মত জার্মানীও দু' টুকরো হয়েছে কিন্তু কলকাতা বা লাহোরের মত বার্লিন আর সেই আগের মত নেই। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে টুকরো হয়েছে বার্লিন—ব্রিটিশ সেকটর, ফ্রেঞ্চ সেকটর, আমেরিকান সেকটর ও রাশিয়ান সেকটর। অ্যালায়েড ফোর্সে'স-এর তিনটি সেকটর নিয়েই আজকের পশ্চিম বার্লিন ও রাশিয়ান সেকটর হচ্ছে পূর্ব বার্লিন। পশ্চিম বার্লিন বাহ্যত ও কার্যতঃ মুক্ত হলেও আইনত আজও ইংরেজ-ফরাসী আমেরিকার অধীন। শহরটাকে চক্কর দিতে গিয়ে বার বার নজরে পড়বে, 'ইউ আর লিভিং ব্রিটিশ সেকটর, ইউ আর এণ্টারিং ফ্রেঞ্চ সেকটর' অথবা 'আমেরিকান সেকটর।'

বিরাট ও বিচিত্র শহর হচ্ছে বার্লিন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বার বার এর উল্লেখ। আয়তনে পূর্ব বার্লিনের চাইতে পশ্চিম বার্লিন কিছুটা বড়। দুটি বার্লিন একত্রে ওয়াশিংটনের সাড়ে তিনগুণ। আজকের পশ্চিম বার্লিনের শুধু আমেরিকান সেকটরই প্যারিসের চাইতে বড়।

দুটি জার্মানী, দুটি বার্লিন দিন-রাত্তিরের মত সত্য হলেও ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে শুধু পশ্চিম জার্মানীর। পশ্চিম বার্লিনে আছে কন্সাল জেনারেলের অফিস। সেই কন্সাল জেনারেল অফিসে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের প্রধান হতে চলেছে তরুণ।

সাধারণত কন্সাল জেনারেলের অফিসের দুটি কাজ। কনস্যুলার ও কমার্শিয়াল। অর্থাৎ পাশপোর্ট-ভিসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করা। কোন কোন ক্ষেত্রে এর সঙ্গে

থাকে প্রচার বিভাগ। বার্লিন যদি সানফ্রান্সিসকোর মত একটা বিরাট শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র হতো, তাহলে ঐ দুটি-তিনটিই কন্সাল-জেনারেল অফিসের কাজ হতো। কিন্তু বার্লিন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর দুটি বিবাদমান শক্তি এখানে মুখোমুখি। তাইতো শুধু পাশপোর্ট-ভিসা আর এক্স-পোর্ট-ইম্পোর্টের কাজই নয়, কন্সাল জেনারেলের অফিসে কূটনৈতিক বিভাগটি অন্যতম প্রধান অংশ। তরুণ সেই গুরুত্বপূর্ণ পলিটিক্যাল ডিভিশনের প্রধান হতে চলেছে।

পূর্ব জার্মানীতে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন নেই, পূর্ব বার্লিনে নেই আমাদের দূতাবাস বা কন্সাল-জেনারেল। বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ দেশ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক। তাই তো আছে ট্রেড মিশন।

দ্বিধাবিভক্ত বাংলার বাঙালীর কাছে দ্বিখণ্ডিত বার্লিনের কাহিনী হাসির খোরাক জোগাবে। পশ্চিম বার্লিন পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত নয়। তবে রাজধানী বনের চাইতে পশ্চিম জার্মানীর অনেক বেশী সরকারী কর্মচারী পশ্চিম বার্লিনে কাজ করেন। বার্লিন দু' টুকরো হলেও মিউনিসিপ্যালটির কাজকর্ম একইভাবে চলছিল। মাটির উপরের রেল 'ইউ-বান' চালাত পূর্ব জার্মানী, মাটির তলার রেল 'ইউ-বান' চালাত পশ্চিম জার্মানী। প্রায় পঞ্চাশ হাজার পূর্ব বার্লিনবাসী প্রতিদিন চাকরি করতে আসত পশ্চিমে, বেশ কয়েক হাজার পশ্চিমের বাসিন্দাও নিত্য যায় পূর্বে চাকরি করতে।

বার্লিনের মজার কাহিনী আরো আছে। পশ্চিম বার্লিন থেকে যে বাইশ জন ডেপুটি বনে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের একজন তো পূর্ব বার্লিনেই থাকতেন। ভাবতে পারেন খুলনা বা বরিশালে বাস করে, কলকাতা থেকে নির্বাচিত হয়ে দিল্লীর পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া? কলকাতার মত পূর্ব জার্মানীর থিয়েটারের মান বেশ উঁচু।

পশ্চিম বার্লিনের বনেদী ও ধনী বা থিয়েটার রসিকের দল তাই রোজ সন্ধ্যায় পূর্ব বার্লিনে গিয়ে থিয়েটার দেখেন। আবার আমেরিকান খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন পড়ার জন্য আমেরিকান প্রচার দপ্তরের পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরী—পশ্চিম বার্লিনের ইউ-এস-আই-এ-তে পূর্ব বার্লিনের হাজার হাজার কর্মী নিত্য আসেন।

এই বার্লিনে—পশ্চিম বার্লিনে এলো তরুণ। পশ্চিম বার্লিনের টেম্‌পেলহফ্‌ এয়ারপোর্ট টি একেবারে শহরের মধ্যে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মত না হলেও পার্ক সার্কাস আর কি! এয়াবপোর্টটিও বেশ অভিনব। মাঠের মধ্যে রানওয়ের ধারে বা টার্মিন্যাল বিল্ডিং থেকে মাইলখানেক দূরে প্লেনে ওঠা-নামা করতে হয় না। প্লেন একেবারে টার্মিন্যাল বিল্ডিং এর বিবাট হল ঘরের মধ্যে থামে। প্লেনে ওঠা-নামার সময় এয়ার হোস্টেসের কৃত্রিম হাসি দেখার আগে বা পবে রোদ-জল-ঝড় সহ্য করতে হয় না যাত্রীদের। *

কন্সাল জেনারেল একটু জরুরী কাজে আটকে থাকায় নিজে এয়ারপোর্ট যেতে পারেন নি তরুণকে অভ্যর্থনা জানাতে। সহকর্মী মিঃ ডাডলানি ও মিঃ দিবাকরকে পাঠিয়েছিলেন।

তরুণ বলল, 'আপনারা দু'জনে কেন কষ্ট করলেন? আই অ্যাম সরি, আমার জন্য আপনাদের, বশ কষ্ট হলো।'

মিঃ দিবাকর বললেন, 'কি যে বলেন স্যার! আপনাদের দেখা-শুনা করা ছাড়া আমাদের আর কি কাজ?'

মিঃ সুরী শুধু বললেন, 'দ্যাটস্‌ রাইট স্যার।'

হান্সা কোয়ার্টারে তরুণের ফ্ল্যাট ঠিক করা ছিল। দিবাকর আর সুবী ফ্ল্যাটের সব কিছু দেখিয়ে দেবার পর বললেন, 'স্যার,

আপনি একবার সি-জি'র (কন্সাল জেনারেল) ওয়াইফকে টেলিফোন করুন।'

'কেন? এনিথিং স্পেশ্যাল?'

'সি-জি বার বার করে বলেছেন।'

তরুণ হাসে। দিবাকর আর সুরী মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

তরুণ বলল, 'টেলিফোন করার দরকার নেই। আপনারা কাইণ্ডলি মিসেস ট্যাণ্ডনকে বলে যান আমি একটু পরেই আসছি।'

দিবাকর আর সুরী বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, 'একটু পরেই গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।

'খ্যাটস অল রাইট।'

ওঁরা বিদায় নেবার পর তরুণ একটু ঘুরে ফিরে ফ্ল্যাটটা দেখল। ছোট্ট ফ্ল্যাট। ছোট্ট ফ্ল্যাটই সে চেয়েছিল। একটা বড় লিভিং রুম, একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম, ছোট্ট একটা স্টাডি আর কিচেন, টয়লেট ইত্যাদি। এ ছাড়া তুটি বারান্দা—একটি ছোট, একটি বড়। বড়টি লিভিং রুমের সঙ্গে, ছোটটি বেড রুমের সঙ্গে। তুটি বারান্দাতেই অ্যালুমিনিয়াম ডেকচেয়ার রয়েছে। হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে ত্রুটি কিছু নেই। ফার্নিচার, বিছানাপত্তর, লাইট স্ট্যাণ্ড—সব কিছুই ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে।

পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সমন্বয় হয়েছে। মুষ্টিমেয় এই কটি দেশে সব কিছুতেই একটা শিল্পীসুলভ মনোবৃত্তি, রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে। রাইফেল সব দেশেই তৈরী হচ্ছে। আমেরিকা-রাশিয়া থেকে শুরু করে আমাদের ইছাপুর, কাশীপুরে পর্যন্ত। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াই একমাত্র দেশ যে দেশের রাইফেলেও চমৎকার শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যাবে। লোহার তৈরী পুল তো সব দেশেই আছে। কলকাতা-লণ্ডন-নিউইয়র্কে। কিন্তু প্যারিসের ঐ প্রাণহীন লোহার পুলগুলির মধ্যেও সমগ্র ফরাসী জাতির যে শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়,

তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। জাপান, জার্মানীও অনুরূপ। সব কিছুতেই প্রয়োজনের সঙ্গে রুচির সমন্বয়।

পৃথিবীর বহু শহরে-নগরে আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট দেখা যাবে, কিন্তু বার্লিনের হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেন্টে কি যেন একটু অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। এই অতিরিক্ত পাওয়াটুকুই এক একটা জাতির বৈশিষ্ট্য। রাশিয়া রকেটের সঙ্গে সঙ্গে বলশয় থিয়েটার আর ব্যালেরিনার জন্য বিখ্যাত। জাপান শুধু ইলেক্‌ট্রনিকসে নয়, চমৎকার পুতুল তৈরী করে পৃথিবীকে চমক দিয়েছে। সুইস মেশিনারী-ঘড়ির মত সুইস চকোলেটও সবার প্রিয়। বার্লিনেও বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বার্লিন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চার পাশ দেখতে বেশ লাগছিল তরুণের। দূরের রেডিও টাওয়ারের দিকে নজর পড়তেই মনে পড়ল ফিলহার-মনিক ও সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার কথা। নিউইয়র্কে গত বছরই শুনেছিল হাবার্ট ভন্ কারজনের পরিচালনায় বার্লিন ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা। মনে পড়ল আরো অনেক কথা—।

রমনার মজুমদার বাড়ীর বিনয়বাবু বি-এ ফেল করার পর বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন। অনেক খোঁজ-খবর করেও ফল হলো না। ফটো দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তবুও বিনয়বাবুর কোন সন্ধান দিতে পারে নি কেউ। পারবে কোথা থেকে। খবরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে উনি তখন আরব সাগরের মাঝ দরিয়ায় ভেসে চলেছেন।

দেখতে দেখতে বছরের পর বছর কেটে গেল। ঢাকার লোক প্রায় ভুলে গেল বিনয় মজুমদারের কথা। ওয়াড়ীর মাঠে, বুড়ীগঙ্গার পাড়ের জটলাতেও বিনয় মজুমদারকে নিয়ে আলাপ-আলোচনাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী ভুলতে পারল না তার বিনেকাকুকে। ভুলবে কেমন করে? ও যে বিনেকাকুর কোলে

চড়ে প্রায়ই বেড়াতে যেত, লজেন্স খেতো! বিনেকাকু যে ওর সব আব্দার হাসিমুখে বরদাস্ত করতেন। বড় হবার পরও বিনেকাকুর দেওয়া পুতুলগুলো বেশ যত্নে সাজিয়ে রেখেছিল ইন্দ্রাণী।

দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ বিনেকাকু ফিরে এলেন ঢাকা। রমনা, ওয়াড়ী, বুড়ীগঙ্গার পাড়ে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল। দীর্ঘদিন জার্মানীতে থেকে অদৃষ্ট পাল্টেছেন, অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন জীবনে। যুদ্ধ শুরু হবার পর প্রায় বাধ্য হয়ে সুইডেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর বিনয়বাবু এলেন না আর মাতৃভূমিকে দেখতে।

বিনেকাকুর কাছে যেতে ইন্দ্রাণীর দ্বিধা, সঙ্কোচ হচ্ছিল। তরুণ কিছু না বলে কলেজ যাবার পথে বিনেকাকুর ওখানে গিয়েছিল।

'কাকু, আমার নাম তরুণ। আপনি হয়ত ভুলে গেছেন।'

'তোমার বাবার নাম কি?'

'কানাই মিত্র।'

'ঐ উকিলবাড়ীর কানাইদার ছেলে তুমি?'

তরুণ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।'

বিনয়বাবু আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তরুণকে। অনেক কথাবার্তার পর তরুণ ইন্দ্রাণীর কথা বলেছিল।

'ঐ ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটা! যে আমাকে বিনেকাকু বলত?'

'হ্যাঁ।'

বিনয়বাবু একটু যেন উদাস হলেন। হারিয়ে যাওয়া অতীতের ভিড়ের মধ্যে মনটাকে নিয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'ও কি এখনও সেই রকম আদুরে আছে?'

তরুণ কি জবাব দেবে? চুপ করে থাকে। বিনয়বাবু আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'জান তরুণ, প্রথম প্রথম বিদেশে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের টফি খেতে দেখলেই মনে পড়ত ওর কথা। বড় ইচ্ছে হতো ওর একটা ছবি কাছে রাখি কিন্তু তা আর হয়নি।'

তারুণ জজ্ঞাসা করল, কেন কাকু ?'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'বাড়ি থেকে যে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ঢাকার কাউকেই চিঠি দিতে পারতাম না।'

ইন্দ্রাণীকে আসতে হয় নি, বিনয়বাবুই গিয়েছিলেন। পকেট ভর্তি টফি নিতে ভুলে যান নি।

বার্লিনের হান্সা কোয়াটারে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তরুণের সে সব কথা পরিষ্কার মনে পড়ল। আর মনে পড়ল বিনুকাকু শেষে বলেছিলেন 'ঢাকায় থেকে ইলিশ আর গঙ্গাজলি খেয়ে কিছু হবে না। একদিন টুপ করে পালিয়ে জার্মানী যাও, বার্লিনে এসো।'

ঢাকাব সেই বিনেকাকু জার্মান নাগরিক হয়েই বার্লিনে থাকেন বলেই তরুণ জানত। স্থির করল খুঁজে বেব করতেই হবে সেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষীকে।

বিনেকাকুর কথা মনে হতেই ইন্দ্রাণীর স্মৃতিটা একটু বেশী সচেতন হয়ে পড়ল মনের মধ্যে। এই ওপাশের ব্যালকনির ডেক চেয়ারে বসে যদি ইন্দ্রাণী গুণ গুণ করে গান—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'তরুণ স্পিকিং ?'

'হ্যাঁ। আমি তরুণ বলছি।···নমস্কার মিঃ ট্যাণ্ডন, হাউ আর ইউ ?'

'আই অ্যাম সরি, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না।'

'না না, তাতে কি হয়েছে···'

আর দেরী করতে পারল না।

ট্যাণ্ডন সাহেব সরকারী চাকুরি থেকে প্রায় বিদায় নিতে চলেছেন। বার্লিনেই তাঁর লাস্ট পোস্টিং। ফরেন সার্ভিসের অনেক অফিসারই ট্যাণ্ডন সাহেবের অধীনে কোন না কোন ডেস্কে কাজ করেছেন। তরুণও করেছে! মিসেস ট্যাণ্ডনকে ভাবীজী বললেও

ফরেন সার্ভিসের জুনিয়র অফিসাররা তাঁকে মাতৃতুল্য সম্মান দেন। কেউ একটু সম্মান দিলে, কেউ একটু মর্যাদা দিলে মিসেস ট্যাণ্ডন ক্ষমতার অতিরিক্ত না করে শান্তি পান না।

এর অবশ্য একটা কারণ আছে। ট্যাণ্ডন সাহেব কর্মজীবন শুরু করেন অধ্যাপনা করে। কনিষ্ঠদের আজও তাই ছাত্রজ্ঞান করেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর তরুণ বলল, 'জানেন ভাবীজি, ইউনাইটেড নেশনস্ ছাড়তে মনটা বড় খারাপ লাগছিল। কিন্তু যেই মনে পড়ল আপনার রান্নার কথা, তখন আর এক মুহূর্তও নিউইয়র্কে থাকতে মন চাইল না।'

ভাবীজি বললেন, 'এবার তো তোমাদের ট্যাণ্ডন সাহেব রিটায়ার করছেন। আর তো আমি তোমাদের রান্না করে দিতে পারব না। এবার বিয়ে কর, তাকে রান্না-বান্না শিখিয়ে দিয়ে আমিও রিটায়ার করি।'

'তাহলে আর এ জন্মে হলো না ভাবীজি।'

'ওসব বাজে কথা ছাড়। ফরেন সার্ভিসে থেকে আজও ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করতে পারলে না?'

ফরেন সার্ভিসের কথা বাইরে না ছড়ালেও গোপন থাকে না। ভাল, মন্দ, কোন খবরই না। সুধীর আগরওয়ালা দিল্লীতে থাকার সময় সবাইকে চমকে দিল। ড্রিংক তো দূরের কথা, পান-সিগারেটও খেত না। মঙ্গলবার শুধু উপবাসই করত না, আরউইন রোডের হনুমান মন্দিরে পূজো দিয়ে অফিসে এসে সবাইকে প্রসাদ দিত। সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে কোট-প্যান্ট ছেড়ে ধুতি-চাদর পরে পূজো করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

যাঁরা ফরেন অফিসে কাজ করেও ফরেন যেতেন না, বা যেতে পারতেন না, তাঁরা বাহবা দিতেন। কিন্তু যাঁরা বহু ঘাটে জল খেয়ে এসেছেন, তাঁরা মন্তব্য করতেন, প্রথম ওভারেই ক্লিন বোল্ড হয়ে

যাবে। আই-এফ-এস সুধীর আগরওয়ালাকে তাই ঠাট্টা করে অনেকেই বলত আই-জি-বি-এস—ইণ্ডিয়ান গুড বয় সার্ভিস।

আগরওয়ালার প্রথম ফরেন পোস্টিং হলো ম্যানিলায়। বিকৃত পশ্চিম, বিস্মৃত পূর্বের মিলনভূমি ফিলিপাইন। ট্রান্সফার অ্যাণ্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত জেনেই অনেকেই মুচকি হেসেছিলেন।

দু'চারজন অনভিজ্ঞ প্রবীণ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'ইফ ইউ পিপুল ডোণ্ট স্পয়েল হিম, আগরওয়াল ঠিক থাকবে।'

বিদেশ যাত্রার আগে সুধীর ছুটি নিয়ে বাবা-মা'কে দেখার জন্য শুধু কানপুরই গেল না, হরিদ্বার আর বেনারসও গেল। নিয়ে এলো নির্মাল্য, গঙ্গাজল আর অসখ্য দেবদেবীর ফটো। কনট প্লেসে শপিং করবার আগে চাঁদনী চক থেকে ডজন ডজন ভাল ধূপকাঠি কিনল। অন্যান্য সহকর্মীদের মত সেই সঙ্গে কিনল রেকর্ড। তবে বিলায়েৎ খাঁ-রবিশঙ্করের সেতার বা লতা মঙ্গেশকারের লাইট মডার্ন সংস্ নয়। কিনল যূথিকা রায়, শুভলক্ষ্মীর ভজন।

শুভদিনে শুভক্ষণে সুধীর আগরওয়াল রওনা হলো সিঙ্গাপুর এন রুট টু ম্যানিলা।

বিদায় জানাতে আরো অনেকের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান গুড বয় সার্ভিসে'র মহেশ মিশ্রও গিয়েছিল। মিশ্র বার বার করে আগরওয়ালকে বলেছিল, 'ডোণ্ট হেসিটেট, যা কিছু দরকার আমাকে লিখো। আমি পাঠিয়ে দেব।'

ম্যানিলায় পৌঁছেই আগরওয়াল বহু সহকর্মীকে চিঠি দিল। মিশ্রকে লিখল, 'তোমাদের সবাইকে ছেড়ে এসে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি। তবে আমার পরম সৌভাগ্য মিঃ ডুরাইস্বামীর ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছি। দু'একজন সহকর্মী আমাকে বেশ সাহায্য করছেন। তবে সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছি। সারা শহরটা যেন হঠাৎ উন্মত্ত

হয়ে ওঠে। তুমি তো জান আমার ওসব ভাল লাগে না। তাই শুধু পড়াশুনা করছি।'

আর কারুর কাছে না হোক, মিশ্রের কাছে প্রতি সপ্তাহে ম্যানিলা থেকে চিঠি আসত। কখনও লিখত, 'ভাই আরো দু'চারটে ভাল ভাল ভজন বা ক্লাসিক্যাল গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দাও।' আবার লিখত, 'বইপত্তর যা এনেছিলাম তা যে কতবার করে পড়লাম তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানে আমাব মনের মত বই পাওয়া অসম্ভব। তাই তুমি যদি একটু কষ্ট কবে ভারতীয় বিদ্যাভবনের কয়েকটা বই পাঠাও তবে বড় ভাল হয়।'

আরো কত কি লিখত আগরওয়াল। '—এদেব ন্যাশানাল মিউজিয়াম দেখলাম। সত্যি দেখবার মত অনেক কিছু আছে। কয়েক শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্রেব যে কালেকশন আছে, শুধু তাকে নিয়েই পৃথিবীব এদিককাব মানুষেব বিবর্তনেব ইতিহাস লেখা সম্ভব। আর আছে পোশাক-এব কালেকশন। এক কথায় অপূর্ব। মানব সভ্যতাব প্রগতির অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তার পোশাক। মানুষের সৃজনী শক্তি কি সুন্দবভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে, তার মধ্যে যে ছন্দ আছে, আনন্দ-আত্মতৃপ্তি আছে, তা এদের মধ্যে মিউজিয়ামের পোশাকের কালেকশন দেখলে বেশ অনুভব করা যায়। আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধরনেব পোশাক ব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব পোশাকের কোন সংগ্রহশালা নেই।'

নিঃসঙ্গ আগরওয়াল সন্ধ্যাবেলায় হয় পড়াশুনা করত, নয়ত চিঠিপত্র লিখত। লিখত সহকর্মীদের কথা, শহরের কথা।—দিনের বেলা সবই যেন ক্যাজুয়াল। কাজকর্ম, পোশাক-আসাক, সব কিছু। একটা সর্ট শ্লিভের সার্ট পরেও ফরেন মিনিস্টারের কাছে যাওয়া যাবে। কাজকর্ম সবাই করছে, তবে মনটা পড়ে থাকে সন্ধ্যার দিকে। রাত্রির নেশাতেই দিনের বেলা যা কিছু করা সম্ভব আর কি! শুধু

হোটেল, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাবে নয়, জনে জনের বাড়ীতেও রসের মজলিশ বসে। মানুষগুলো হঠাৎ চলে যায় যুগ যুগ পিছনে। আদিম মানুষের মত সে হিংস্র হয়ে ওঠে—নারী পরুষ সবাই।......
এই যে আমাদেরই সহকর্মী মিঃ চাড্ডা! কি ভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। রোজ সন্ধ্যায় কোথা থেকে যে একটা মেয়েকে শিকার করে নিজের ফ্ল্যাটে আনেন, ভাবলেও অবাক লাগে, ঘেন্না করে।

ফরেন সার্ভিসের সর্বত্র ছড়িয়েছিল আগরওয়ালের অভিজ্ঞতার কাহিনী। পরে যখন ওর চিঠিপত্র আসা কমতে থাকল, সে খবরও মুখে মুখে, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কৃপায় অথবা ডিপ্লোম্যাটেদের নিত্য আনাগোনার ফলে ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর প্রায় সব ইণ্ডিয়ান মিশনেই।

কয়েক মাসের মধ্যেই আরো অনেক কাহিনী ছড়িয়েছিল।

ম্যানিলা থেকে যাঁরা অন্যত্র বদলী হতেন, তাঁরা জানতেন আগরওয়ালের বিবর্তনের ইতিহাস। দেবদেবীর ভজন-পূজন শেষ হয়ে গেছে। মদ খেয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা ছুকরীদের নিয়ে বেলেল্লাপনা করবার সময় বহুদিন আগেই ভেঙে চুরমার করেছে। এখন আর আগরওয়াল 'জাঙ্গল বার' নাইট ক্লাবে বসে ধেনো মদের মত ফিলিপাইনের তালের রসে তৈরী 'তুবা' মদ খেতে খেতে গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে গল্প করে খুশি হয় না। শিকার জোগাড় করেই নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে আনে!

তরুণের কাহিনীও ছড়িয়েছিল ফরেন সার্ভিসের সর্বস্তরে। মিসেস ট্যাণ্ডনও জানতেন ইন্দ্রাণী-হারা তরুণের দীর্ঘনিঃশ্বাসের কথা। তাইতো ইন্দ্রাণীর বিষয়ে প্রশ্ন করতেই তরুণের নীরবতা দেখে ভাবীজি, বললেন, 'ঠিক হ্যায়। তোমাদের মত ইনকম্‌পিটেণ্ট ডিপ্লোম্যাটকে দিয়ে কিছু হবে না। এবার আমিই দেখি কি করতে পারি।'

তরুণ কিছু না বলে বিদায় নিল।

। এগারো ।

লণ্ডনের মত ভারতীয়দের ভিড় বা নিউইয়র্কের মত ভি-আই পি-র স্রোত নেই বার্লিনে। ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটদের কাছে এটা শুধু শান্তি নয়, স্বস্তিরও বটে। তবে বার্লিনে আছে ডেলিগেশনের অফুরন্ত ধারা। অতীত দিনের বাংলাদেশের মত বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে এখানে। পলিটিশিয়ানেব সংখ্যা সীমিত হলেও ডিগনিটারীব অভাব নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়াব, আর্কিটেক্‌ট থেকে শুরু করে ফিল্ম-স্টার, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পর্যন্ত।

ডেলিগেশন বে-সরকারী হলে ডিপ্লোম্যাটদেব দায় থাকে, দায়িত্ব থাকে না ; কর্তব্য থাকে না কিন্তু দুশ্চিন্তা আছে। কন্সাল জেনারেল মিঃ ট্যাণ্ডন নিছক ভদ্রলোক। রিটায়ার করার মুখোমুখি কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চান না। তাছাড়া ফরেন অফিসেব একজন প্রবীণ ডিপ্লোম্যাট বলে আলাপ আছে সারা দেশের সরকারী বে-সরকারী মানুষের সঙ্গে। সুতরাং ঝামেলার শেষ নেই।···

সেবার জেনেভায় ইণ্টারন্যাশনাল লেবাব কনফারেন্সে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের লীডার ছিলেন মাইশোরেব লেবার ও ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মিঃ ভীমাপ্পা। ভীমাপ্পাসাহেবের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। ভীমাপ্পা-জনক ছিলেন মাইশোর মহারাজাব ডেপুটি পলিটিক্যাল সেক্রেটাবী। শৈশব, কৈশোরে দশেরার শোভাযাত্রায় হাতি চড়ে ঘুবেছেন 'গার্ডেন সিটি' মাইশোরের রাজপথ। প্রথম যৌবনেব সোনালী দিনগুলিতে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘোরাঘুরি কবেছেন রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে।

ভীমাপ্পাসাহেবের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের এই শেষ নয়, শুরু। পড়াশুনা করেছেন বাঙ্গালোরের মিশনারী কলেজে, হৃদ্যতা হয়েছে

ডজন ডজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন চমরাজ সাগর-লেকের ধারে। ছুটির দিনে ছোট রেল চড়ে দল বেঁধে গিয়েছেন নন্দী পাহাড়ে। কখনও বা শিবাসমুদ্রমে গিয়ে কাবেরীর জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

আরো কত কি করেছেন এই ভীমাপ্পাসাহেব। দক্ষিণ ভারতীয়দের মত সুর করে ইংরেজি ইনি বলেন না। অক্সোনিয়ন ইংলিশ না বললেও বেশ ইংরেজি বলেন।

আরো পরের কথা। এম-এল-এ হবার পর চুড়িদার শেরওয়ানী পরে ঘোরাঘুরি শুরু করলেন দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে। গোটা দুয়েক ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্যাসেঞ্জার হবার পর একদিন শুভক্ষণে মন্ত্রী। লেবার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার। অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলে গেল।

একবার নয়, দু'বার নয়, সরকারী-বেসরকারী ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে বহুবার বহু কারণে গিয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশে। মিঃ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে সেই সূত্রেই আলাপ। একবার একটা গুড উইল ডেলিগেশনে ওরা দু'জনেই গিয়েছিলেন ইস্ট ইউরোপের কয়েকটি দেশে।

ভীমাপ্পা যে জেনেভায় ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের লীডার হয়ে গিয়েছেন, সে খবর পৌঁছেছিল বার্লিনে। কিছুদিন পরে ওঁর একটা চিঠিও এলো মিঃ ট্যাণ্ডনের কাছে।...'কি নিদারুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে, তা বোঝাতে পারব না। এত মতভেদ ও মতবিরোধ যে দেখা দেবে আমাদের ডেলিগেশনের মধ্যে, তা আগে ভাবতে পারিনি। যাই হোক কনফারেন্স শেষ হলে কয়েক সপ্তাহের জন্য একটু ঘুরেফিরে বেড়াব। বার্লিনে নিশ্চয়ই যাব। কয়েকটা দিন একটু আনন্দ করা যাবে।'

সেদিন কনসুলেটে যেতেই মিঃ ট্যাণ্ডন তলব করলেন তরুণকে।

বললেন, 'আই হোপ ইউ নো মিঃ ভীমাপ্পা ? ঐ যে মাইশোরের লেবার অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার।'

তরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও ভীমাপ্পাসাহেবের কথা সে শুনেছে। বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি ওঁর কথা। তাছাড়া উনি তো আই-এল-ও কনফারেন্সে আমাদের ডেলিগেশনের লীডার।'

মিঃ ট্যাণ্ডন খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাটস্ রাইট। তুমি দেখছি কারুর কথাই ভুলে যাও না।'

হাসতে হাসতে তরুণ বলে, 'ভারতবর্ষের এসব স্মরণীয় ব্যক্তিদের ভুললে কি আর চাকরি করতে পারি ?'

ট্যাণ্ডনও একটু না হেসে পারলেন না। 'তা তুমি ঠিকই বলেছ। স্মরণীয়ই বটে।'

একটু থেমে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি কিছু জান নাকি ওর সম্পর্কে ?'

'বিশেষ কিছু না, তবে শুনেছি জলি গুড ফেলো।'

'ঠিক শুনেছ। যাই হোক, উনি আসছেন কয়েকদিনের জন্য। যদিও প্রাইভেট ভিজিটে আসছেন, তবুও মিনিস্টাব তো, কিছু ব্যবস্থা কিছু দেখাশুনা করতেই হবে।'

পশ্চিমের অনেক দেশে ডিপ্লোম্যাটদের অনেক রকম টুকটাক সুবিধে দেওয়া হয়। ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কেনাকাটা করলে অনেক সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাটিক মিশন থেকে 'বুক' করলে বহু হোটেলেও চার্জ কম লাগে। ভীমাপ্পাসাহেবের মত যাঁরা ঘন ঘন বিদেশ যান ও ইণ্ডিয়ান মিশনের সঙ্গে খাতির আছে, তাঁদের হোটেলে বুকিং হয় ইণ্ডিয়ান মিশনের মারফৎ। সুতরাং মিঃ ভীমাপ্পার জন্য 'হোটেল আম জু'তেই অ্যাকোমডেশন বুক করা হলো। কনস্যুলেটের একটা গাড়ীও রাখা হলো মাঝে মাঝে ভীমাপ্পাসাহেবকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করার জন্য। সরকারীভাবে নয়, বেসরকারীভাবে। দিনকাল বদলে যাচ্ছে। কোথা থেকে

কিভাবে যে খবর বেরিয়ে যায় তার ঠিক নেই। এসব খবর অপোজিশন এম-পি-দের হাতে পড়লে রক্ষা নেই। সুতরাং আইন-কানুন বাঁচিয়েই গাড়ীর ব্যবস্থা করা হলো।

মিঃ ট্যাণ্ডন নিজেই এয়ারপোর্ট গেলেন ভীমাপ্পাসাহেবকে রিসিভ করতে। তবে এয়ারপোর্টে রিসিভ করার পর হোটেলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলেন কনস্যুলেটের একজন সাধারণ কর্মীকে।

এয়ার ফ্রান্সের প্লেন ঠিক সময়েই এলো। কথামত ভীমাপ্পা এলেন। পিছনে পিছনে এলেন মিঃ শর্মা। হাসিমুখে মিঃ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে করমর্দন করার পর ভীমাপ্পাসাহেব বললেন, 'মীট মাই ফ্রেণ্ড মিঃ শর্মা…'

স্বভাবসুলভ খুশী মনেই মিঃ ট্যাণ্ডন হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, 'গ্লাড টু মীট ইউ, মিঃ শর্মা।'

এর পর ভীমাপ্পাসাহেব শর্মাজীর পরিচয় দিলেন।…'জানেন মিঃ ট্যাণ্ডন, শর্মাজী একজন ফেমাস ট্রেড ইউনিয়ন লীডার। এবার আমাদের ডেলিগেশনের একজন মেম্বারও ছিলেন। র‍্যাদার হি ওয়াজ দি মোস্ট অ্যাকটিভ মেম্বার অফ অল অফ দেম।'

ভীমাপ্পা শর্মাজীর আরও অনেক গুণের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ বকবক করা ভালো দেখায় না বলে মিঃ ট্যাণ্ডন বললেন, 'কয়েক দিন থাকছেন তো? পরে ভালভাবে কথাবার্তা বলা যাবে।'

'মিঃ ভীমাপ্পার সঙ্গেই আবার চলে যাব।'

'আপনি কোথায় থাকছেন?'

ভীমাপ্পাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই থাকব।'

ট্যাণ্ডন সাহেব চিন্তিত না হয়ে পারলেন না। 'এক্সকিউজ মী মিঃ ভীমাপ্পা, আপনি কি ওর বিষয়ে কিছু জানিয়েছিলেন?'

'না, তবে যেভাবেই হোক ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।'

কথাটা শুনে মনে মনে ট্যাণ্ডনও বিরক্ত বোধ করলেন। হরিদ্বার-লছমনঝোলা বা কাশী-গয়ার ধর্মশালায় এক ঘরে পাঁচ-দশজনকে থাকতে দিতে পারে কিন্তু বার্লিনে যে তা সম্ভব নয়, ভীমাপ্পা ভালভাবেই জানেন। একটু খবর দিলেই সবকিছু ব্যবস্থা ঠিক থাকত। কিন্তু অধিকাংশই ভীমাপ্পার দলে। কেউ সোমবার বলে মঙ্গলবার, সকাল বলে বিকেলে আসেন; আবার কখনও তিনজন বলে একজন অথবা একজন বলে তিনজন।

এইতো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশন নিয়ে কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। দুটি ফিচার ফিল্ম, একটি ডকুমেন্টারী ইণ্ডিয়ার অফিসিয়াল এনট্রি ছিল। এইসব ফিল্মের প্রডিউসার, ডিরেক্টার, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দলে এগারোজন থাকার কথা। এ ছাড়া ফেস্টিভ্যাল কমিটি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতীয় ফিল্ম দুনিয়ার চারজনকে। এরা সবাই আসবেন বলে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বে থেকে চিঠি এলো। চিঠি পাবার পর হোটেল বুক করা হলো।

আবার চিঠি এলো, টেলিগ্রাম এলো। কেউ জানালেন সোমবার আসছেন, কেউ জানালেন মঙ্গলবার আসছেন, কেউ সকালে, কেউ বিকালে।

চিঠি আসা বন্ধ হলো, শুরু হলো টেলিগ্রাম আসা। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ নট ইয়েট স্যাংশানড্। ডিপারচার ডিলেড'—বলে জানালেন কলকাতা থেকে মিঃ গুপ্ত। ফেস্টিভ্যাল কমিটির আমন্ত্রণে যে চারজনেব আসার কথা তাঁদের দু'জন বোধহয় ধার-দেনা করেও প্লেন ভাড়া জোগাড় করতে পারেন নি, তাই শেষ মুহূর্তে দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 'সরি, কাণ্ট অ্যাটেণ্ড, সিরিয়াসলি ইল' বলে জানালেন কলকাতার এক বিখ্যাত ফিল্ম জার্নালিস্ট। বোম্বের ভদ্রলোক হিন্দী ফিল্মের মত টেলিগ্রাম করে জানালেন, এয়ারপোর্টে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সুতরাং 'সরি, ভেরী সরি। সামনের বছর নিশ্চয়ই আসব।'

আরো কত টেলিগ্রাম এলো। বোম্বের প্রডিউসার ভোঁসলে জানালেন, নায়িকা কুমারী সুন্দরীকে নিয়ে বুধবার আসছি। নায়ক দুর্লভকুমার রিচিং থার্সডে। কিন্তু কখন? বার্লিনে কি একটাই ফ্লাইট? এক দিনে তিনটি টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে। কোনটাতেই স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই।

কি বিভ্রাটেই না কনস্যুলেটকে পড়তে হয়েছিল। ফেস্টিভ্যাল কমিটি থেকে বার বার করে ফোন আসে কন্সাল জেনারেলের কাছে। অথচ তিনি কিছুই বলতে পারেন না। বলবেন কী? নিজেদের সরকারের অকর্মন্যতার কথা বাইরে বলা যায়, বলা যায় না, বিশ্বের সব চাইতে অস্পষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষগুলিই করেন একস্‌চেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেন।

শেষ পর্যন্ত তিনদিন ধরে চারটে আলাদা আলাদা ফ্লাইটে এলেন সাতজন। হোটেলে পৌঁছে প্রডিউসার ভোঁসলে অবাক হলেন সিঙ্গল রুম অ্যাকোমোডেশন দেখে। প্রথমে অনুরোধ, পরে দাবি জানালেন ডবল রুমের জন্য। ইউরোপের নানাদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন বার্লিন ফেস্টিভ্যাল দেখতে। তিল ধারণের জয়েগা নেই কোন হোটেলে। হোটেল কর্তৃপক্ষ অক্ষমতা জানালেন। ভোঁসলে সাহেব ক্ষেপে লাল!

মুখে বললেন না, তবে বেশ স্পষ্টভাবেই কন্সাল জেনারেলকে ঝুঝিয়ে দিলেন, 'আপনাদের মত সত্যমেব জয়তের তিলক পরে আমাকে গোলামী করতে হয় না। হাজার হাজার টাকা খরচা করে হিরোইনকে নিয়ে এসেছি শুধু ফিল্ম জার্নালে দু' চারটে ছবি ছাপাবার জন্য নয়, নিজের প্রয়োজনে।'

মিঃ টাণ্ডনের মত লোকও আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, 'মিঃ ভোঁসলে, আপনাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। নিছক ভদ্রতা, সৌজন্যের খাতিরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। দ্যাটস অল রাইট।'

দেশের সুনাম বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তো নয়, নিছক রক্ত-মাংসের দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যেই কোনো কোনো অনারেবল ডেলিগেটের আগমন হয়। কিন্তু তাহলে কি হয়! ইণ্ডিয়ান মিশনের জ্বালাতনের শেষ নেই।

ভীমাপ্পাসাহেব একজন মন্ত্রী ও ইণ্ডিয়ার ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করেছেন! দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে তাঁকে অপবাদ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও তিনি শর্মাজীকে আনার আগে একটা খবর দেওয়া কর্তব্য মনে করেন নি।

মিঃ ট্যাণ্ডন মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, চলে যান হোটেলে। আই হোপ দে উইল ম্যানেজ সামহাউ।'

পরের দু'দিন ভীমাপ্পা ও শর্মাজীর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। তিন দিনের দিন দুপুরের দিকে কনস্যুলেটে হাজির হয়ে ট্যাণ্ডনকে অনুরোধ করলেন, 'আমি আর শর্মাজী কিছু কেনাকাটা করব। মিঃ মিত্র যদি একটু কাইণ্ডলি হেল্প করেন···?'

লণ্ডনে গিয়ে ভিড়ে ভর্তি 'পাবে' গিয়ে এক জাগ বিয়ার না খেলে বিলাত যাওয়া বৃথা। প্যারিসে গিয়ে নাইট ক্লাবে যেতে হয় আর পারফিউম কিনতে হয়। রোমে গিয়ে ক্যাসিনো। তেমনি বার্লিনে গিয়ে নাইট ক্লাবে রাত কাটাতে হয়, সস্তায় ক্যামেরা কিনতে হয়। এসব নিয়ম পালন না করলে ইণ্ডিয়ান ভি-আই-পি-দের ধর্মরক্ষা হয় না।

ভীমাপ্পা নিজেই বললেন, 'ইউ সী মিঃ ট্যাণ্ডন, লাস্ট দুটো নাইট রেসীতে বেশ কেটেছে।'

'রেসী?'

'হ্যাঁ, বলহাউস রেসী। বার্লিনের পৃথিবীখ্যাত নাইট ক্লাব। ডান্সিং ফ্লোরের চারপাশে ছোট ছোট কেবিন। প্রত্যেক টেবিলে আছে টেলিফোন ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে চিঠি আদান-প্রদানের অপূর্ব ব্যবস্থা। খোলামেলা কেবিনে বসে দেখে নিন কে কোথায়

বসেছে। টেবিলের উপর রাখা ম্যাপ দেখে জেনে নিন অঙ্গের টেবিল নম্বর। তারপর চিঠি লিখুন, দূর থেকে আপনাকে বেশ লাগছে। যদি আপত্তি না করেন তাহলে এই ভারতীয় আপনার সঙ্গে একটু নাচতে চান।

ইলেকট্রনিক্সের কৃপায় মুহূর্তের মধ্যে সে চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক অভীষ্ট স্থানে। উত্তর আসবে, 'এই শ্যাম্পেনটুকু শেষ করার ধৈর্য ধরতে পারলে বার্লিনে ভ্রমণরতা ও হ্যামবুর্গবাসিনী কৃতার্থ হবে।'

'জার্মান মেয়েদের সম্পর্কে আমার অত্যন্ত উঁচু ধারণা ছিল, কিন্তু সামান্য এক গেলাস শ্যাম্পেনের প্রতি আপনার দুর্বলতা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারছি না।'

'মাই ডিয়ার জেন্টলম্যান, কি করব বলুন? শুধু নাচতেই নেমন্তন্ন করলেন। শ্যাম্পেনের অফার তো পেলাম না।'

ভীমাপ্পাসাহেব নিশ্চয়ই ভাবলেন, বিদেশ বিভুঁইতে তোমার মত ডাগর-ডোগর জার্মান বান্ধবী পেলে এক গেলাস কেন, বোতল বোতল শ্যাম্পেন দিতে পারি।

যাই হোক উত্তর গেল, 'ইউ আর ওয়েলকাম টু ডান্স অ্যাণ্ড ড্রিঙ্ক।'

এমনি করে খেলা চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শ্যাম্পেন খেয়ে নাচতে নাচতে মন্দির হয়ে অনেকে দেখতে বসেন রেসী ওয়াটার শো। সে আর এক অপূর্ব দৃশ্য। প্রতি মিনিটে ন'হাজার জেট আট হাজার লিটার জল ছড়াচ্ছে এক লক্ষ আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে।

রেসীর গল্প করতে করতে আনন্দে, খুশীতে ভীমাপ্পাসাহেবের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'জানেন মিঃ টাণ্ডন, রেসীতে গেলে ভুলে যেতে হয় এই মাটির পৃথিবীর কথা।'

ভীমাপ্পাসাহেব এত আগ্রহ করে সব বলছিলেন যে মিঃ ট্যাণ্ডন

তাঁকে একেবারে দমিয়ে দিতে পারলেন না।—'এরা আনন্দ করতে জানে।'

এবার ভীমাপ্পাসাহেব লাডারের মত কথা বলতে শুরু করলেন, 'যে জাত আনন্দ করতে জানে না, সে পরিশ্রম করতেও জানে না। কাজ করতে হলে আনন্দ করার, স্ফূর্তি করার স্কোপ চাই। কিন্তু ইণ্ডিয়াতে কোথায় সেই আনন্দ করার স্কোপ?'

'ছাটস রাইট মিঃ ভীমাপ্পা।'

মিঃ ট্যাণ্ডন প্রবীণ হলেও ফরেন সার্ভিসের লোক। খুব বেশী না বুঝলেও এটুকু বুঝলেন, রেসীতে নাচতে নাচতে মিঃ ভীমাপ্পা কোন শিকার ধরেছিলেন নিশ্চয়ই।

শর্মাজী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। রেসীর স্মৃতি মনের মধ্যে টগবগ করে ফুটছিল। আর সামলাতে পারলেন না, 'ডু ইউ নো মিঃ ট্যাণ্ডন, ঐ যে মেয়েটি—মিস রিটারের সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে কিছু কিছু জার্মান কথাও শিখেছি।'

মিঃ ট্যাণ্ডন ইংরেজিতে ধন্যবাদ না জানিয়ে বললেন, 'ডাংকেসন।'

শর্মাজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বিটুসেন।'

ভীমাপ্পা আবার কেনাকাটার কথা শুরু করলেন, 'টুমরো উই আর ফ্রি। তারপর কিছু ইণ্ডাস্ট্রি দেখব। দু' একটা পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা আছে। ওরা হয়ত কোলাবরেশন করে মাইশোরে কিছু স্টার্ট করতে পারে।'

'অর্থাৎ আগামী কালই শপিং করতে চান?' ট্যাণ্ডন জানতে চাইলেন।

'ছাট উড বি ফাইন।'

ট্যাণ্ডন সাহেব তরুণ মিত্রকে ভালভাবেই জানেন। এক বোতল বিয়ার বা একটা ডিনারের লোভে সে ইণ্ডিয়ান ভি-আই-পি-দের ল্যাংবোট করে ঘুরতে আদৌ পছন্দ করে না। তাছাড়া নিজের নামে কিনে ভীমাপ্পাকে দিতে তার আপত্তি থাকবেই। অথচ—।

অথচ আবার কি ? ফরেন সার্ভিসে এসব হজম করতেই হয়। কতজনের মেয়ের বিয়ের সময় হাজার হাজার টাকার মালপত্র কিনে ডিপ্লোম্যাট বা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ মারফত পাঠাতে হয়।

'কি কি কিনতে চান তার একটা লিস্ট আর সেগুলোর দাম রেখে যান। আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ।' ট্যাণ্ডন সাহেব আর কি বলবেন!

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে পকেট থেকে ক্যাটলগ, প্রাইস লিস্ট বের করলেন। দু'জনে মিলে কত আলোচনা-সমালোচনার পর একটা লম্বা লিস্ট তৈরী করলেন।

'আই অ্যাম আফ্রেড, এতগুলো কেনা সম্ভব হবে না।'

শর্মাজী বললেন, 'আমরা তো রোজ আসব না। আর তাছাড়া ভীমাপ্পার ডিপ্লোম্যাটিক পাশপোর্ট আছে। বোম্বে বা দিল্লীতে কাস্টমসের ঝামেলা থাকবে না। তাই ...।'

'কিন্তু আপনার মত অনেকেই তো আসছেন।'

ভীমাপ্পা অত্যন্ত বিবেচকের মত বললেন, 'ঠিক আছে। লিস্ট রেখে গেলাম, যা পারেন তাই কিনবেন।'

ভি-আই-পি-দ্বয় বিদায় নিলেন। ট্যাণ্ডন সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন তরুণকে।

তরুণ ঘরে ঢুকতেই ঐ লিস্ট আর এক বাণ্ডিল দুবেস্তা মার্ক এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার পুরস্কার দেখেছ ?'

তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'উনি যে ইণ্ডাস্ট্রি মিনিস্টার! তাই তো দেশের কিছুই ওঁর পছন্দ হবে না। ইমপোর্টেড জিনিসে ঘর ভর্তি না থাকলে কি ওঁদের প্রেস্টিজ থাকে ?'

একটু থেমে তরুণ আবার বলে, 'মাঝে মাঝে মনে হয় ট্রান্সজিস্টার টেরিলিন ক্যামেরা হুইস্কীর জন্য ইংরেজ যদি কিছু ব্যয় করত, তবে বোধহয় ওরা আবার ভারতবর্ষে রাজত্ব করতে পারত।'

ট্যাণ্ডন সাহেব বললেন, 'বোধহয় তোমার কথাই সত্যি।'

। বারো ।

এর পর ভীমাপ্পাসাহেব যেদিন কনস্থলেটে এলেন, সেদিন আর শর্মাজীকে দেখা গেল না। ট্যাণ্ডন সাহেব একটু বিস্মিত হলেন। দীর্ঘদিন ফরেন সার্ভিসে কাজ করে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একটু চালু মন্ত্রীরা ঠিক একলা একলা দেশভ্রমণ পছন্দ করেন না।

কারণ?

কারণ একটা নয়, একাধিক। তবে শুধু উমেদারি, তাঁবেদারি বা খিদমতগারির জন্য নয়, নিজেদের রসনা আর বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য।

নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পক্ষে বেহিসেবী হওয়া যায় না। মোটা খদ্দরের তলায় মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে বাধ্য হয়ে চাপা রাখতে হয়। এত পরিচিত সমাজে খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করা অসম্ভব। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিধানসভা-লোকসভায় 'মে আই নো স্যার' বলে না জানি কে প্রশ্ন করবেন। এর পর লোক্যাল কাগজের রিপোর্টারগুলো তো আছেই।

বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী দিবেন্দুবিকাশ চৌধুরী মিঃ ট্যাণ্ডনকে একবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা বলুন তো মিঃ ট্যাণ্ডন, মন্ত্রী হয়েছি বলে কি আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ নই?'

সহানুভূতি জানিয়ে মিঃ ট্যাণ্ডন বলেছিলেন, 'তা তো বটেই।'

'কলেজের ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে ঘুরতে পারে, অধ্যাপকরা ছাত্রীদের আদর করতে পারেন, চাকুরিয়া সহকর্মী মেয়েদের নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার বা পুরী যেতে পারেন, মার্কেণ্টাইল ফার্মের অফিসার ইয়ং মেয়ে স্টেনোদের নিয়ে মুসৌরী-নৈনীতালে কনফারেন্স বা সেমিনারে যেতে পারেন…।'

ঝড়ের বেগে দিব্যেন্দুবিকাশের দুঃখের ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

বেইরুটের ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর চান্সেরী বিল্ডিং-এর তিনতলায় ঐ কোণার ঘরে বসেই মিঃ ট্যাণ্ডন ভূমধ্যসাগরের মাতাল হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করেন। জানলা দিয়ে একবার বাইরের আকাশটা দেখেন। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে মাঝপথে মন্তব্য করলেন, 'আমি আপনার কথা কোয়াইট রিয়ালাইজ করি।'

একটু আস্তে হলেও উত্তেজনায় টেবিল না চাপড়ে পারলেন না দিব্যেন্দুবিকাশ। 'রিয়ালাইজ কেন, অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমার কথা—কারণ দেয়ার ইজ লজিক ইন মাই আর্গুমেন্ট।'

'দ্যাটস রাইট।'

ছোটখাট মন্ত্রীরা ছোটখাট শিকার ধরেন। কেউ শপিং করে দেয়, কেউ ট্যাকসির বিল মেটায় আর কেউ বা বেইরুটের পৃথিবী খ্যাত নাইট ক্লাব 'কিট-ক্যাটে' নিয়ে যায়।

বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা চুনোপুটি শিকার করেন না।...

একজন অতি সাধারণ বিদেশযাত্রীর মত অশোক আগরওয়ালা নামে এক ভদ্রলোক দমদম থেকে কোয়ান্টাস ফ্লাইটে ইউরোপ গেলেন। বাইরের দুনিয়ার কেউ জানল না, খেয়াল করল না। পরিচিতরা জানাল, দুর্গাপুরের এক কারখানার কোলাবরেশনের জন্য অশোকবাবু 'বিলাইত' গেলেন।

কোলাবরেশনের মকরধ্বজ খেয়ে ভারতবাসীরা স্বর্গে যাবে বলে সেসব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের ধারণা, তাঁরা অশোকবাবুর পকেট ভর্তি করে ফরেন এক্সচেঞ্জ দিয়েছেন। এছাড়া—

এছাড়া অবার কি?

এছাড়া এ-বি-সি অ্যাণ্ড এক্স-ওয়াই-জেড ইন্টারন্যাশনাল কনসট্রাকশন কোম্পানির ওভারসীজ ম্যানেজারের অ্যাকাউণ্টে তো মাসে মাসে পাঁচশ' ডলার জমছে।

তার মানে?

অশোক আগরওয়ালা আর তাঁর বন্ধুরা হয়ত ভাবেন কেউ কিছু বোঝে না। ট্যাগুন সাহেব মনে মনে হাসতেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বলা হলো, ওভারসীজ ম্যানেজারকে মাইনে দশ হাজার টাকা প্লাস কার অ্যালাউন্স প্লাস অফিস অ্যালাউন্স প্লাস এণ্টারটেনমেণ্ট অ্যালাউন্স প্লাস...। ওভারসীজ ম্যানেজারকে বলা আছে, শ্রীমানজী! মাসে মাসে পাঁচশ' ডলার ব্যাঙ্কে জমা রাখবে। কর্তাব্যক্তিরা বা তাঁদের বন্ধু-বান্ধব-হিতাকাঙ্ক্ষীরা এলেই ঐ ডলার খরচ হবে।

সুতরাং পকেট ভর্তি ফরেন এক্সচেঞ্জ ছাড়াও অশোকবাবুর আরো কিছু সম্ভব ছিল। একমাস ধরে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে 'বন্ধুদের' সেবার জন্য ফুলপ্রুপ ব্যবস্থা করলেন অশোকবাবু।

এক মাস পরে 'বন্ধুবর' যেদিন ভারতের কোনো এয়ারপোর্ট থেকে বি-ও-এ-সি প্লেনে চাপলেন, সেদিন লোকে-লোকারণ্য। যেদিন ফিরে এলেন সেদিনও শত-সহস্র মানুষের ভিড়। কেউ জানল না কার নিস্বার্থ সেবায় তাঁর যাত্রা সফল হলো।

ট্যাগুন সাহেব এসব জানেন, বোঝেন। ছোটখাট সেবা-যত্ন পাবার লোভেই যে ভীমাপ্পাসাহেব শর্মাজীকে সঙ্গে রেখেছিলেন, তাও তিনি জানেন। আর জানেন যে, শর্মাজীও লীডার। কাঁচা লোক নন। একেবারে ফিনিশড প্রডাক্ট। সুতরাং তিনিও তাঁর ঐ টিটাগড়ের কারখানার ইংরেজ জেনারেল ম্যানেজার মারফত বিধি-ব্যবস্থা করেছেন ইউরোপ দর্শনের সুব্যবস্থার জন্যে। শ্রমিক-কল্যাণের জন্য বিদেশী মিল-মালিকের দল যে ইউরোপ ভ্রমণকারী কোনো কোনো লীডারের সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করেন, তা শুধু মিঃ ট্যাগুন নয়, সব ডিপ্লোম্যাটরাই জানেন।

তবুও মিঃ ট্যাগুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট হ্যাপেণ্ড টু মিস্টার শর্মা? ওকে আজ দেখছি না যে?'

'আর বলবেন না! আমাদের কোনো কোনো লীডার এমন

করাপটেড আর হোপলেস যে কি বলব ? ওঁর গার্ডেনর্‌চ ওয়ার্কশপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ব্রাউন অ্যাকসিডেন্টালি বার্লিনে এসেছিলেন। মার্টিনী খেতে খেতে একটু নিভৃতে দু'-একটা ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েক দিন···।'

মিঃ ট্যাণ্ডন বাধা দিয়ে বললেন, 'না-না, আমি অত কিছু জানতে চাইনি। লেট হিম মাইণ্ড হিজ ওন বিজনেস!'

'ইন এনি কেস', ভীমাপ্পাসাহেব এবার কাজের কথায় আসেন, 'ঐ ক্যামেরা আর বাইনোকুলারটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে দিল্লী পাঠাতে হবে।'

শর্মাজী অসৎ, কিন্তু ভীমাপ্পা সৎ। সৎ হয়েও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে মাল পাচার করার অনুরোধ করতে দ্বিধা হয় না।

কূটনৈতিক জগতের এক আশ্চর্য আবিষ্কার হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। কূটনৈতিক মিশনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি হচ্ছে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। ওয়াশিংটনের সি-আই-এ দপ্তর থেকে মস্কোর আমেরিকান এম্বাসী মারফত এজেণ্টদের কাছে যে গোপন সংকেত ও নির্দেশ যায়, তা থাকে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। আমেরিকান এম্বাসী থেকে যে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ওয়াশিংটনে যায়, তাতে থাকে রাশিয়ার অনেক গুপ্ত খবর। সারা দুনিয়া থেকে ক্রেমলিনে যেসব ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ আসে, তাতেও ভর্তি থাকে অনেক রহস্য।

এই লেনদেনের কাহিনী সবাই জানে, সবাই বোঝে। তবে কেউ বাধা দেয় না। শান্তির সময় ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের যাতায়াতে বাধা দেবার নিয়ম নেই, প্রথা নেই।

সাধারণত নিজের নিজের দেশের এয়ার লাইন্স এই ব্যাগ আনা-নেওয়া করে। ব্রিটিশ ফরেন অফিস বা ব্রিটিশ এম্বাসী প্যান অ্যামেরিকান বা এয়ার ফ্রান্সেও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ পাঠাবে না। এয়ার ক্র্যাফটের কম্যাণ্ডারের ব্যক্তিগত হেপাজতে এই ব্যাগ

থাকে। কোন দেশের গোয়েন্দা, পুলিশ বা কাস্টমস-এর স্পর্শ করার অধিকার নেই।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যে শুধু গোপন তথ্য যায় তা নয়। মিশনের নিত্য-নৈমিত্তিক চিঠিপত্র ও টুকিটাকি অনেক কিছু যায়। জরুরী প্রয়োজনে ডিপ্লোম্যাটদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও পাঠান হয়।

সে যাই হোক, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের রাজনৈতিক মূল্যের তুলনা নেই। প্রয়োজনের শেষ নেই। তাই তো বহু দেশ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে দু'-একজন ডিপ্লোম্যাটকেও পাঠায়।

ভারতবর্ষের অত ফালতু পয়সা নেই। তাছাড়া দুনিয়ার গোপন খবর লুঠপাট করে নেবার প্রয়োজনও তার নেই। তবুও তো ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ। ফরেন মিনিস্ট্রির অনেক গোপান খবর ও চিঠিপত্র তাতে থাকে।

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ এম্বাসী থেকেই যাতায়াত করে, কনস্যুলেট থেকে নয়। এই ব্যাগে কিছু পাঠাতে হলে কনস্যুলেট থেকে এম্বাসীতে পাঠাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে তার স্থান হবে।

বার্লিন থেকে কোন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ সোজা দিল্লী যায় না। প্রথমে সব কিছুই বন-এ ইণ্ডিয়ান এম্বাসীতে যাবে। তারপর সেখান থেকে নির্দিষ্ট দিনে ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার দিল্লীগামী প্লেনের কম্যাণ্ডারের হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই অমূল্য ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ।

আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে শুধু যে জরুরী নথিপত্র যায়, তা নয়। প্যারিস-ডিপ্লোম্যাটদের জন্য ধনে-জিরে-শুকনো লঙ্কাও ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যেতে পারে। আবার দিল্লীগামী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে জয়েণ্ট সেক্রেটারীর মেয়ের বিয়ের জন্য সুইস ঘড়ি বা

জামাতা বাবাজীর স্কটিশ টুইডের স্যুট যায় কিনা বলা শক্ত। আরো অনেক কিছু যেতে পারে।

তবুও অপরের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য নিজে সেই কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

'একসকিউজ মী, মিঃ ভীমাপ্পা, আমাদের এখান থেকে তো কোন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ দিল্লী যায় না।'

'ঠিক আছে, বন-এ এম্বাসীতে পাঠিয়ে দিন। ওরা ওখান থেকে আপনাদের হয়েই সেক্রেটারী মিঃ নানজাপ্পার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাহলেই—।'

'বাট স্যার, আমরা তো কোনো ব্যাগ বন-এ পাঠাই না। আপনি বরং ফেরার পথে বন-এ এম্বাসীতে দিয়ে দেবেন।'

এর আগে কোনো কনস্যুলেটে তরুণের পোস্টিং হয় নি। দিল্লীর ফরেন মিনিস্ট্রি ছাড়া বিভিন্ন এম্বাসীতে কাজ করেছে। বার্লিন আসার আগে ইউনাইটেড নেশনশ-এ ছিল। তাইতো ভেবেছিল কনস্যুলেটে এসে ঝামেলা অনেক কমবে, কিন্তু ভীমাপ্পার মত নিত্য নতুন ভূতের উপদ্রবে যে জীবন অতীষ্ঠ হবে ভাবতে পারে নি।

ভীমাপ্পাকে কোনমতে বিদায় করার পর মিঃ ট্যাণ্ডনও বললেন, 'জানো তরুণ, ভেবেছিলাম রিটায়ার করার আগে একটু শান্তিতে দিন কাটাব, কিন্তু এদের উপদ্রবে তাও হলো না।'

একটু থেমে ট্যাণ্ডন সাহেব আবার বললেন, 'সারা জীবন কোনো না কোনো অফিসার বা অ্যাম্বাসেডরের আণ্ডারে কাজ করেছি। তাঁদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাইতো বার্লিনে ইণ্ডিপেনডেণ্ট চার্জ নিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আগেই ভাল ছিলাম।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বার্লিনের ইণ্ডিয়ান কন্সাল জেনারেল মিঃ ট্যাণ্ডন।

এবার তরুণ বলে, 'আপনি তো সামনের সপ্তাহে কনসালটেশনের জন্য বন যাচ্ছেন, তখন আমার কি দুর্গতি হবে বলুন তো?'

মিঃ ট্যাণ্ডন হাসতে হাসতে বললেন, 'নার্ভাস হবার তো কিছু নেই! নেক্সট উইকে তো ডান্সার প্রীতিকুমারী ছাড়া কোন পলিটিশিয়ান আসছেন বলে শুনিনি। সো ইউ উইল হ্যাভ এ প্লেজাণ্ট টাইম, আই হোপ।'

'হোপ' তো অনেকেই অনেক কিছু করেন কিন্তু বাস্তব যে সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদের 'পিসফুল কো-একজিসটেন্স অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডলি কো-অপারেশন' বিদেশে যত বেশী অচল হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ডান্স আর বাজনা তত বেশী পপুলার হচ্ছে বলে শোনা যায়। ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজগুলো পড়লে মনে হয় আমাদের বাজনা আর ডান্সের ঠেলায় হলিউডে ফিল্ম তৈরী বন্ধ হয়েছে, প্যারিসের নাইট ক্লাবে খদ্দের হচ্ছে না।

ওস্তাদ সাহেবের দল সাকসেসফুল করেন টুরের পর খুশিতে ডগমগ হয়ে বেনারসী পান-জর্দা চিবুতে চিবুতে প্রেস কনফারেন্সে বলেন, 'বাজনা? আহাহা, ওরা কি ভালই বাসে! হল্ প্যাকড! অটোগ্রাফ দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়।'

কোন সাংবাদিক অবশ্য প্রশ্ন করেন না, কত ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে বাড়ী ফিরলেন? তাহলেই ঝোলা থেকে বেড়াল ছানা বেরিয়ে পড়ত!

এই প্রেস কনফারেন্সের পর কলকাতার মিউজিক কনফারেন্স-গুলোতে ওস্তাদ সাহেবের রেট শেয়ার বাজারের ফাটকাকে হার মানিয়ে চড় চড় করে বাড়ে।

সুন্দরী যুবতী ডান্সারদের পয়সা খরচা করে প্রেস কনফারেন্স করতে হয় না। রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানরাই সুন্দরীদের দোর-গোড়ায় ভিড় করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্না দেবার পর মুহূর্তের

জন্য সেই অমৃতলোকবাসিনী সুন্দরী দর্শনে তাঁরা ধন্য হন। আর কাগজে ছাপা মিস পদ্মাবতীর নাচ দেখার জন্য প্যারিসে ট্রাফিক জ্যাম হয়, রাশিয়ায় বলশয় থিয়েটারের টিকিট বিক্রী হয় নি।

আর রোমে ?

পাগল ইতালীয়নরা এয়ারপোর্টে এমন ভীড় করেছিল যে চারটে ইণ্টার-ন্যাশনাল ফ্লাইট ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিলেড হয়ে যায়।

'ভাল কথা। অনেক দেশের ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেকটারা আমাকে তাঁদের ফিল্মে নাচতে ইনভাইট করেছেন।'

ব্যস! রেসের মাঠে ট্রিপল টোট! চার লাখ কালো, এক লাখ শাদা দিয়েও প্রডিউসার পদ্মাবতীর কনট্রাকট পান না।

লেক মার্কেটের পটলদা বা দর্জিপাড়ার বিধুবাবু এসব কাহিনী বিশ্বাস করলেও তরুণের মত ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা শুনলে হাসি চাপতে পারে না। নেক্সট উইকে প্রীতিকুমারীর আগমনবার্তা শুনে তাই তো তরুণ খুব বেশী সুখী হতে পারল না।

তাছাড়া তরুণ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট আছেন যাঁরা প্রীতিকুমারীর মত ডান্সারদের সেবা করে ধন্যবোধ করেন। প্রোগ্রামের শেষে হোটেলের নিভৃত কক্ষে দু'-চার রাউণ্ড ড্রিংক করার পর এদের ভাগ্যে কখনও কখনও উপরি পাওনাও জুটে যায়। তরুণদের সহকর্মী সাবারওয়াল এমনি এক নৃত্য-পটিয়সীর সেবা করে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী করে তাড়াহুড়ো করে অফিস যাবার সময় লেডিস জুতো পরে এম্বাসী গিয়েছিলেন, সে কথা ফরেন সার্ভিসের কে না জানে ?

তরুণ এসব উপরি পাওনার স্বপ্ন কোনদিন দেখে নি জীবনে। শুধু একজনেরই স্বপ্ন দেখেছে সে সারাজীবন ধরে। মনের সমস্ত সত্তা দিয়ে, মাধুরী দিয়ে যাকে সে ভালবেসেছে, সেই ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কোন নারীর স্থান নেই তরুণের জীবনে।

জীবনের ধূসর মরু-প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে বন্দনার কাছে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত পেয়েছিল তরুণ। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল বার্লিনে। মনসুর আলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য করাচিতে সেকেণ্ড সেক্রেটারী বড়ুয়াকে চিঠি দিয়েছিল। বড়ুয়া ছুটিতে থাকায় উত্তর এসেছে মাত্র কদিন আগে। পাকিস্তান সরকারের কোন অফিসারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে বড়ুয়া জানিয়েছে। বড়ুয়া লিখেছে, আমার ক্ষতির চাইতে মিঃ আলির ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনাটাই বেশী। কারণ পাকিস্তান সরকার ভাবতে পারে ওর সঙ্গে আমাদের কোন গোপন সম্পর্ক আছে। করাচির আবহাওয়া বড়ই খারাপ। সেজন্য মিনিস্ট্রির লেভেলেই যোগাযোগ হওয়া ভাল।

বড়ুয়া চিঠির শেষে লিখেছে, আমাদের মিনিস্ট্রি থেকে পাকিস্তান ফরেন মিনিস্ট্রিতে চিঠি এলে কাজের অনেক সুবিধে হবে। প্রথম কথা হাই-কমিশনও সরকারীভাবে তদ্বির করতে পারবে। তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা, এখন এখানে যিনি ইণ্ডিয়া ডেস্কের এসব দেখাশুনা করেন, তিনি পূর্ব বাংলারই একজন মুসলমান। খুব সম্ভব ঢাকারই লোক। প্রায়ই ঢাকা যান। আমার স্থির বিশ্বাস উনি নিশ্চয়ই খুব সাহায্য করবেন।

কটা দিন এমন বিশ্রী ঝামেলার মধ্যে কাটছে যে তরুণ মিনিস্ট্রিতে একটা ফর্ম্যাল কম্যুনিকেশন পাঠাতে পারল না। ট্যাণ্ডন সাহেবের অবর্তমানে নিশ্চয়ই সময় পাবে না।

তরুণ বলল, 'ওসব ডান্সারের চিন্তা পরে করা যাবে। আপনি কনসালটেশনের জন্য বন-এ যাবার আগ আমার ঐ চিঠির ড্রাফটটা দেখে ফাইনাল করে দেবেন, অ্যাণ্ড ইউ শুড সী দ্যাট ইট ইজ ইমিডিয়েটলি ডেসপ্যাচড টু ফরেন অফিস।'

মিঃ ট্যাণ্ডন অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, 'সার্টেনলি।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'বেটার ডু ওয়ান থিং। তুমি আজ

রাত্রে আমার ওখানে চলে এসো। ডিনারের পর দু'জনে বসে ফাইনাল করে ফেলব।'

তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি জানেন না আমি আজ রাত্তিরে আসছি?'

'তার মানে?'

'তার মানে আজ ভাবীজি আমার জন্য কিছু স্পেশ্যাল ডিস...।'

মিঃ ট্যাণ্ডন হাসতে হাসতে বলেন, 'ডিপ্লোম্যাট হয়ে রিটায়ার করার সময়ও ডিপ্লোম্যাসীতে তোমাদের কাছে হেরে যাচ্ছি!'

। তেরো ।

শুক্রবার অফিসে গিয়েই তরুণ খবর পেল, ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বার করবার জন্য ফরেন মিনিস্ট্রি যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

খবর পাঠিয়েছেন 'বন' এম্বাসী থেকে ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ কাপুর।

মেসেজটা পেয়ে খুশীতে ভরে গেল সারা মন। বার বার পড়ল কেবল্‌গ্রামটা। 'ফরেন অ্যাসিওরড এভরি পসিবল্ অ্যাকশান, ট্রেস ইন্দ্রাণী।'

বুঝতে অসুবিধা হলো না, মিঃ ট্যাণ্ডনের জন্যই এত চটপট বন থেকে আর্জেন্ট মেসেজ গেছে দিল্লীতে। অ্যাম্বাসেডরও নিশ্চয়ই বেশ ভাল করে লিখেছিলেন। তা নয়ত এত চটপট উত্তর?

ফরেন মিনিস্ট্রির অনেক অসুবিধে। সারা দুনিয়ায় 'পঞ্চশীল' প্রচার করতে অনেকের দ্বিধা থাকলেও সহকর্মীদের এসব সাহায্য সহযোগিতা করতে কারুর দ্বিধা নেই। বরং আগ্রহই বেশী।

পাকিস্তান এক বিচিত্র দেশ। রাজনৈতিক ব্যাপারে পাকিস্তানের মতিগতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু অরাজনৈতিক

ব্যাপারে সাধারণত সাহায্য করার চেষ্টা করে। তার অবশ্য কারণ আছে। যে কোন পাকিস্তানীর বিপদ-আপদে ভারত সরকার সাহায্য করতে শুধু আগ্রহী নয়, উন্মুখ। দিল্লীর পাকিস্তান হাই-কমিশন থেকে হরদম এই ধরনের অনুরোধ আসছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে ভারত সরকার সে সব অনুরোধের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করে।

দেশটা দু' টুকরো হলেও আত্মীয়-স্বজন ছড়িয়ে রয়েছে দু' দেশেই। বিয়ে-সাদীতে যাতায়াত করতেই হয় ওদের। লক্ষ্ণৌতে শ্বশুরের মৃত্যু হলে লাহোর থেকে ছুটে আসতে হয় মেয়ে-জামাইকে।

আরো কত কি হয়। এইত সেবার পাকিস্তান হাই-কমিশনের এক থার্ড সেক্রেটারীর স্ত্রী সন্তান প্রসবের পরই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলা তাঁর মাকে কাছে পাবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ভারত সরকারের সাহায্যে একদিনের মধ্যে তাঁকে আনা হয় পেশোয়ার থেকে দিল্লী। ভারত সরকারের ঔদার্যে ও তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে কয়েকদিন পর পাকিস্তানের ফরেন সেক্রেটারী নিজে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের বহু বড় বড় অফিসারের অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে আছেন। ভারত সরকারের ঔদার্যে ও সহযোগিতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাকিস্তানীরাই বেশী উপকৃত হন। সেজন্য ভারত সরকার থেকে সাধারণ কোন অনুরোধ গেলে এঁরাও যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেন।

তরুণ এসব জানে। দিল্লীতে থাকতে ওর কাছেই কত অনুরোধ এসেছে। তাইতো বন থেকে মেসেজটা পেয়ে মনে হলো, বোধহয় অন্ধকার রাত্রির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, নতুন দিনের আলো আত্মপ্রকাশ করার সময় সমাগত।

মিঃ দিবাকর কতকগুলো ফাইল নিয়ে এলেন কিন্তু তরুণের ইচ্ছা করল না ওগুলোয় হাত দিতে।

'এক্সকিউজ মী মিঃ দিবাকর, আজ এগুলো রেখে দিন।

সোমবার দেখব। আজ আমি উইকলি রিপোর্টটা রেডি করে দিচ্ছি। আপনি ওটা আজই পাঠিয়ে দিন।'

সব দেশের সব ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে উইকলি পলিটিক্যাল ডেসপ্যাচ পাঠানো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, ডিপ্লোম্যাট মরুক বাঁচুক, উইকলি রিপোর্ট ঠিক সময়ে যাবেই। তাছাড়া বার্লিনের গুরুত্বই আলাদা। বন-এ এম্বাসী এই রিপোর্টের ভিত্তিতে দিল্লীতে রিপোর্ট পাঠাবে এবং তার ভিত্তিতেই দিল্লী তার নীতি ও কার্যধারা ঠিক করবে। সুতরাং ইন্দ্রাণীর স্বপ্নে মশগুল হয়েও তরুণ পলিটিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে দেরি করল না।

রিপোর্টটা ফাইনাল চেক আপ করে নিজে হাতে শীল করে তরুণ তুলে দিল মিঃ দিবাকরের হাতে। হাসতে হাসতে বলল, 'এই নিন। আই হোপ আই উইল নট সী ইউ বিফোর মনডে!'

দিবাকর বিদায় নেবার পর তরুণ আবার কেবলগ্রামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কি মনে হলো। চিঠি লিখতে বসল চন্দনাকে।

'...প্রায় তিন সপ্তাহ আগে তোমার চিঠি পেয়েও জবাব দিতে পারিনি। প্রিয়জনের চিঠির উত্তর আমি চটপট দিই না, তা তুমি জান। যাদের ভালবাসি অথচ কাছে পাই না, তাদের চিঠি পেলে বড় ভাল লাগে। বার বার পড়ি সে সব চিঠি। একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন ধরে পড়ি। তোমার চিঠিটাও পড়েছি বেশ কয়েকদিন ধরে। উত্তর দিলেই তো সব শেষ! যতক্ষণ উত্তর না দিই ততক্ষণ মনে হয় চিঠির মধ্য দিয়ে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, কথা শুনতে পাচ্ছি। আমি উত্তর দিলেই তো তোমাদের আর দেখতে পাব না, কথা শুনতে পাব না! তাই, সেই ভয়ে উত্তর দিতে দেরি করি।'

'তবুও এত দেরি হওয়া উচিত হয় নি। কিন্তু এমন কতকগুলো

আজে-বাজে লোকের উৎপাতে বিব্রত ছিলাম যে অফিসের কাজ-কর্মও ঠিক করতে পারিনি। তবে আজ আর চিঠি না লিখে পারলাম না। আজই এম্বাসী থেকে খবর পেলাম ফরেন মিনিস্ট্রি ইন্দ্রাণীর খোঁজ নেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজী হয়েছে। খবরটা পেলে তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হবে, খুশী হবে, তাই আর দেরি করলাম না।

চিঠির শেষে তরুণ একথাও লিখল, 'জানি না ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যাবে কিনা; জানি না তাকে আর কোনদিন দেখতে পাব কিনা তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু মনে হয় তার সঠিক খবর হয়ত এবার পাওয়া যাবে।...'

এই পৃথিবীটা মহাশূন্যের মাঝে থেকেও ঠিক নিয়মমাফিক নিত্য চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরপাক খাচ্ছে। নিয়ম মত চন্দ্র-সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে। গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা খেলছে, অমবস্যা-পূর্ণিমা হচ্ছে। দুনিয়াটা এমনি করেই চলছে। এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত মানুষ ও প্রকৃতিরও একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। পাহাড়ের কোলে জন্ম নেয় যে নদী, সে ছুটে যায় সমুদ্রের কোলে। মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই তার সাধনা, তার ধর্ম। সমুদ্রের আকর্ষণেই নদী ছুটে আসে, ছেড়ে আসে তার শ্বেতশুভ্র পবিত্র হিমালয়-শৃঙ্গের আসন। যে হিমালয় সবাইকে হাতছানি দেয়, সেই পর্বতরাজকে ত্যাগ করতে নদীর দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই। বরং আনন্দ আছ, আছে পরিতৃপ্তি। তাইতো সে ক্ষীণধারা নাচতে নাচতে নেমে আসে, হাসতে হাসতে সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। সে ক্ষীণধারা হিমালয়তুঙ্গে বা তরাই-এর জঙ্গলে প্রায় পরিচয়হীন থাকে, সমতলভূমিতে অসংখ্য মানুষের স্পর্শে সে অনন্য হয়, সে বিরাট বিশাল হয়। সমুদ্রের মুখোমুখি সে দিগন্তবিস্তৃত হয়।

তরুণও ছুটে চলেছে সেই অনন্তবিস্তৃত অজ্ঞাত ভবিষ্যতের

দিকে। ইন্দ্রাণীর আকর্ষণে। হয়ত বা মিথ্যা প্রত্যাশা, মরীচিকা। জানে না। অন্ধকার ভবিষ্যৎ তা'র জানা নেই। তবুও এই একটু ক্ষীণ আলোয় সে যেন বিভোর হয়ে গেছে। তাই তো বন্দনাকে চিঠি লিখতে বসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

'...বন্দনা, তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। তার চাইতেও বড় কথা তুমি আমাকে ভালবাস, আমার মঙ্গল কামনা কর, আমাকে দাদা বলে প্রণাম কর। তোমাকে না বলার কিছু নেই। আর পাঁচজন মেয়ের মত ইন্দ্রাণী ঠিক সাধারণ মেয়ে ছিল না। সে বড় বেশী স্বপ্ন দেখত। বড় বেশী প্রত্যাশা করত আমার কাছ থেকে। বুড়িগঙ্গার পাড়ে বাস করে আমি ঠিক অত স্বপ্ন দেখতে পারতাম না, সাহস করতাম না, বাবা কোর্টে গেলে, মা বুড়ো শিববাড়িতে পূজো দিতে গেলে ও আসত আমার কাছে। বার বার করে বলত, বিনে কাকার মত তুমি চমকে দিতে পার না সবাইকে?'

সেদিন কল্পনা করতে পারিনি ঢাকা বা কলকাতার বাইরে পা দেব, ভাবতে পারিনি কর্মজীবনের তাগিদে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ি দেব বার বার। ভাবতে পারিনি আরো অনেক কিছু। তাইতো আমি বলতাম, 'ভবিষ্যৎ কি আমার হাতে ইন্দ্রাণী?'

ও প্রতিবাদ করত, 'পুরুষমানুষ হয়ে এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?'

ঐ কটা কথা বলতেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ত। এলো করে বাঁধা খোঁপাটা আরো ঢিলে হয়ে যেত।

খোঁপার কাঁটাগুলি ঠিক করতে করতে বলত, 'তুমি এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে, আমিও কলেজে ভর্তি হলাম। এখনও কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু সচেতন হবার সময় আসেনি?'

'কত কথা আর লিখব? আমাকে নিয়ে যার বুকভরা আশা ছিল সে যদি বেঁচে থাকে তবে কিভাবে যে দিন কাটাচ্ছে, তা চিন্তা করতেও কষ্ট লাগে।'

বন্দনাকে আর কিছু লিখল না। লিখতে পারল না। লেখা সম্ভবও নয়। সব মেয়েই স্বপ্ন দেখে। কেউ বেশী, কেউ কম। কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন অসম্ভবকে প্রত্যাশা করত।

ঢাকা থেকে অনেক দূরে বার্লিনের ইণ্ডিয়ান কনস্যুলেটে বসেও তরুণের মন উড়ে যায় সেই সোনালী দিনগুলিতে।···

বেশ বেলা হয়েছিল। তরুণ তবুও শুয়েছিল। টেস্ট পরীক্ষা যখন শেষ হয়েছে, তখন একটু বেলা করে উঠলেই বা কি? ওপাশের বড় জানালা দিয়ে রোদ্দুর আসছিল বলে পাশ ফিরে শুয়ে আর একবার চাদর মুড়ি দিল। তাছাড়া বাবা যখন ঢাকায় নেই, তখন চিন্তার কি?

কে যেন দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল? এক গোছা কাঁচের চুড়ির আওয়াজ হলো না? শুয়ে শুয়েই মুচকি হাসে তরুণ। এসেছে তাহলে ডাকাত মেয়েটা!—

মুহূর্তের মধ্যেই কানে ভেসে এলো, 'মাসিমা।'

কোণার ঘর থেকে তরুণের মা জবাব দিলেন, 'আমি এই কোণার ঘরে।'

পরের কয়েক মিনিট আব কিছু শোনা গেল না ওদের কথাবার্তা। একবার পাশ ফিরে বারান্দার দিকে তাকাল। নাঃ, এখনও এদিকে আসার সময় হয় নি।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। তবুও ইন্দ্রাণীর কথা শুনতে পায় না। তবে কি চলে গেল? না, তা কেমন করে হয়! একবার দেখা না করে কি যেতে পারে?

এতক্ষণ পর তরুণের হুশ হলো, বেশ রোদ্দুর উঠেছে। চাদর মুড়ি দিযে শুয়ে থাকতে বিশ্রী লাগল।

দু'চার মিনিট আরো কেটে গেল। না, আর দেরি করে না। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে একবার এপাশ-ওপাশ দেখল। পটলের মাকে না দেখে বুঝল

সে রান্নাঘরে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কোণার ঘরের দোর-গোড়ায়। তরুণ বেশ বুঝল, হঠাৎ দু'জনের কথাবার্তা থেমে গেল।

'কি ব্যাপার? সকালবেলাতেই তোমরা ফিস-ফিস করছ?' চোখ রগড়াতে রগড়াতে তরুণ জানতে চায়।

মাথাটা দুলিয়ে বিনুনীটা ঘুরিয়ে ইন্দ্রাণী ঘাড় বেঁকিয়ে তরুণকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'একি মাসিমা খোকনদা এখন উঠল?'

ইন্দ্রাণীর কথা শেষ হতে না হতেই তরুণ ভিতরে ঢুকে চেয়ারটা টেনে নেয়। 'ভাগ্যবান মাত্রেই বেলা করে ওঠে; তাতে এত অবাক হবার কি আছে?' নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তরুণ।

হাজার হোক একমাত্র সন্তান। শাসন করার ভাষাটাও যেন স্বতন্ত্র। 'ওর কথা আর বলিস না মা!'

একটা যেন চোরা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তরুণের অজ্ঞাতে। ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমার মত একটা মেয়ে পেতাম! তবে ও জব্দ হতো।'

মুহূর্তের জন্য দু'জনে দু'জনকে দেখে। দু'জনের চোখগুলো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ইন্দ্রাণী যেন একটু লজ্জাবোধ করে।

তরুণ একটু মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে। 'যদি পেতাম আবার কি? তোমার পাশেই তো বসে আছে।'

একটু থেমে আবার বলে, 'আচ্ছা মা, তুমি কি মনে কর বল তো? এই রকম একটা মেয়ে আমাকে জব্দ করবে?'

হঠাৎ পটলের মা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল। তরুণের মা ছেলের কথার জবাব না দিয়ে হাতের সেলাই নামিয়ে রেখে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তরুণও উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রাণীকে বলল, 'দেখো তো, এক কাপ চা খাওনাতে পার কিনা!'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ইন্দ্রাণী বলল, 'মুখ ধুয়েছ?'

'তোমার হাতের চা খেলেই মুখ ধোওয়া হয়ে যাবে।'

'এ আর মাসিমা পাওনি যে একমাত্র ছেলের সব আব্দার সহ্য করবেন।'

তরুণ একটু মজা করার জন্য বলে, 'মাসিমার একমাত্র ছেলের মত আমিও তো তোমার একমাত্র ধ্যান-ধারণা!'

ঠোঁট উল্টে একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণী বলে, 'তা তো বটেই। যে ছেলে মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করার স্বপ্ন দেখে, সে ছেলে আমার ধ্যান-ধারণা!'

ডান হাতে বুড়ো আঙুলটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে তরুণ উত্তর দেয়, 'মুনসেফ কোর্টে প্রাকটিশ করবো আমি?'

'তোমার দ্বারা তার বেশী কি হবে!'

হাজার হোক বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনদিনই বিশেষ চিন্তার গরজ ছিল না। ম্যাট্রিকের পর আই-এ; আই-এ'র পর বি-এ, বি-এ'র পর এম-এ।

তারপর?

তারপর দেখা যাবে। মা আছেন, বাবা আছেন। তারপর ইন্দ্রাণী আছে। অত শত চিন্তার কি আছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তরুণের ঔদাসীন্যই ইন্দ্রণীর অসহ্য। কল্পনাতীত। ছোটবেলায় যার সঙ্গে খেলা করেছে, যৌবনে যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শিখেছে সে তো শুধু ওয়াড়ির মাঠে ফুটবল খেলবে না, সে তো শুধু বুড়িগঙ্গার পাড়ে আড্ডা দেবে না, চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করবে না।

তবে?

তবে আবার কি? সে বড় হবে। অনেক বড় হবে। দশজনের মধ্যে একজন হবে। সে বিনেকাকা হবে। দেশ-বিদেশে পাড়ি দেবে, ঢাকার মানুষকে চমকে দেবে।

সেই ছোট্টবেলায় টফি-চকোলেট খাওয়াতে খাওয়াতে বিনেকাকা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। শিশু ইন্দ্রাণী বিস্মিত না হয়ে

পারে নি। যত বড় হয়েছে, তত বেশী মনে পড়েছে ঐ বিনেকাকাকে। ঢাকার আর সবাই তো ঠিক একই রকম আছে! গঙ্গাজলি আর ইলিশ মাছ খেয়েই ওরা খুশী, সুখী। মনের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করত! কারও কাছে প্রকাশ করত না। তরুণের কাছেও না। বড় হবার পর সেই শূন্যতা পূর্ণ করতে চেয়েছে কাছের মানুষকে দিয়ে।

তাইতো কথায় কথায় খোঁচা দিয়েছে তরুণকে।

ইন্দ্রাণী চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

তরুণ হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢোকার পরই চা নিয়ে ইন্দ্রাণী এলো। চায়ের কাপটা ওর হাতে তুলে দিতে দিতে ইন্দ্রাণী বেশ একটা মিষ্টি হাসি কিছুটা চেপে রেখে বলল, 'জানো, এই সাতসকালে মাসিমা কেন ডেকেছিলেন?'

চেয়ারের উপর পা দুটো তুলে বসতে বসতে তরুণ বলল, 'কেন?'

'মা বুঝি মাসিমাকে বলেছেন যে, ময়মনসিংহের কোন এক ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে...!'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে তরুণ বলে, 'কই, সে কথা তো আমাকে বলো নি।'

'আমিও ঠিক জানতাম না। মাসিমার কাছেই শুনলাম।'

'মা কি বললেন?'

'জানো, আমার বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে মাসিমার ভীষণ রাগ।'

'কেন?'

'তা জানি না। তবে বেশ বুঝলাম যে আমি অন্য কোথাও চলে যাই, তা উনি চান না।'

এবার পরম পরিতৃপ্তিতে চায়ের কাপে চুমুক দেয় তরুণ, 'আঃ! ফার্স্ট ক্লাশ!'

প্রায় মুখোমুখি টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী জানতে চায়, 'কি ফার্স্ট ক্লাশ ?'

মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'তুমি, মা, চা—সবাই ফার্স্ট ক্লাশ !'

বন্দনাকে চিঠি লেখার পর আপন মনে বসে থাকতে থাকতে এসব মনে পড়ছিল তরুণের। মনে পড়ছিল মা'র কথা। বড় ভালবাসতেন ইন্দ্রাণীকে। নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন। বড় ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে কাছে রাখার।

দু' চারটে আজেবাজে বিয়ের সম্বন্ধ আসার পর আর থাকতে না পেরে শেষে ইন্দ্রাণীর বাবাকেই বলেছিলেন, 'দেখুন ঠাকুরপো আমাকে না জানিয়ে মেয়েটাকে যেখানে সেখানে পার করবেন না !'

'আপনাকে না জানিয়ে কোথায় মেয়ের বিয়ে দেব ?'

'তা জানি না। তবে ঐসব আজেবাজে ছেলের খবর পেয়েই আপনারা যা মাতামাতি করছেন !'

'তা আপনার ছেলের মত ছেলে পাব কোথায় ?'

'সে পরে দেখা যাবে। মোট কথা আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ কোথাও—!'

সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেল। শাঁখা-সিঁদুর, মুখের হাসি, চোখের স্বপ্ন—সব কিছু একসঙ্গে হারিয়ে গেল।

তারপর কত কি হলো! ভেড়ার পালের মত সর্বহারাদের সঙ্গে এলেন এপারে।

রাণাঘাট, শেয়ালদা, পটলডাঙা। পিসতুতো ননদের বাড়ি, মামাতো দেওরের বাড়ি। আরো কত কি !

সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি! নবীন কুণ্ডু লেনের ঐ অন্ধকার ঘর একদিন হঠাৎ সূর্যের আলোয় ভরে গেল! তরুণ আই-এফ-এস হলো।

যে সূর্য প্রায় দুপুরবেলাতেই অস্ত গিয়েছিল, সেই তার জন্য মা

খুব খানিকটা কেঁদেছিলেন সেদিন। খোকার এই কৃতিত্বে সবচাইতে উনিই তো খুশী হতেন।

তরুণ কোন সান্ত্বনা জানাতে পারে নি। এত বড় কৃতিত্বের পরও কেমন যেন পরাজিত মনে হচ্ছিল নিজেকে। চৌকির উপর মাথা নীচু করে বসে চুপচাপ ভাবছিল।

হঠাৎ একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন তরুনের মা। আপন মনেই যেন বললেন, 'হতচ্ছাড়ি মেয়েটাও যদি কাছে থাকত।'

এসব কথা, স্মৃতি, ভাবতে ভাবতে তরুণের চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল সেদিন। ভুলে গিয়েছিল সে বার্লিনে বসে আছে, ভুলে গিয়েছিল অফিসের কথা।

মিঃ দিবাকর হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, 'স্যার! প্রায় ছ'টা বাজে। আমরা কি যাব?'

তরুণ লজ্জিত বোধ করে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সার্টেনলি যাবেন। চলুন, চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

। চোদ্দ ।

উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু খাওয়াই মৌমাছির কাজ। মৌমাছির ধর্ম। শীত, বসন্ত, শরৎ, হেমন্তে কত বিচিত্র ফুলের মেলায় মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যার মধু নেই, যার মধুর ভাণ্ডার শূন্য হয়েছে, সেখানে মৌমাছি নেই।

অনেক মানুষও উড়ে উড়ে মধু খায়। শীতের মরসুমী ফুলের মেলায় বসেও এদের নজর থাকে বসন্তের প্রতি। স্মৃতির ভাণ্ডারে এদের জমা হয় না কিছু। এদের হৃৎপিণ্ড আছে কিন্তু হৃদয় নেই, মন আছে কিন্তু অন্তর নেই।

ভালবাসাই তো জীবনের ধর্ম। যৌবনে তার প্রথম পূর্ণ

অনুভূতি। জীবন সন্ধিক্ষণের সেই অপূর্ব মুহূর্তে মানুষ ভাল-বাসবেই। তাইতো যৌবনে কতজনই প্রেমে পড়ে, কিন্তু ভালবাসা? সবাই কি ভালবাসতে পারে? দেহ-মনের প্রতিটি গ্রন্থিতে কি সবাই অনুভব করে অব্যক্ত বেদনা?

না। তাইতো প্রেমে পড়লেই ভালবাসা হয় না। প্রেম একটা রোগ। আসল না হলেও জল বসন্তে সবাই একবার ভুগবেই। সারা অঙ্গে কিছু ক্ষত রেখে যায়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব নেই। একদিন মুছে যায় সে ক্ষতের চিহ্ন। আর ভালবাসা? সে হচ্ছে অন্তরেব ধর্ম, মনের বিশ্বাস। সে স্থায়ী, চিরস্থায়ী, চিরন্তন। সে অনন্ত।

তুনিয়ার মানুষ বার্লিনে এসে ভুলে যায় তার সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা। গোল্ডেন সিটি বার, এল প্যানোরমা বা বলহাউস রেসীতে ক্ষণস্থায়ী বসন্তে অনেকে আরো অনেক কিছু ভুলে যায়। হান্সা কোয়ার্টারে থেকেও ভোলা যায় অনেক কিছু। কিন্তু তরুণ ভুলতে পারে না ইন্দ্রাণীর কথা।

অফিস থেকে ফিরে লিভিং রুমে চুপচাপ বসে বসে পরপর কতকগুলো সিগারেট খেতে খেতে তরুণ কি যেন ভাবছিল। বিভোর হয়ে ভাবছিল। অন্যদিন গাড়ি থেকে নেমেই প্রতিবেশী ডাঃ রিটারের ছোট ছেলেটিকে খোঁজে। তরুণকে দেখলে ছোট্ট রিটারও টলতে টলতে এগিয়ে আসে একটা মিল্ক চকোলেটের লোভে। প্রতিদিনের মত সেদিনও পকেটে চকোলেট ছিল কিন্তু গাড়ি থেকে অন্যমনস্কভাবে সোজা চলে এসেছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। অন্য-দিনের মত সোজা প্যান্ট্রিতে গিয়ে চা তৈরী করতেও যায় নি। যাবে কেন? রোজ রোজ কি ভাল লাগে? শুধু নিজের জন্য এত ঝামেলা পোহাতে কার ইচ্ছে করে?

বিভোর হয়ে তাইতো ভাবছিল, যখন সবাই ছিল, সব কিছু ছিল, তখন সে কাছে ছিল। সুখে-দুঃখে অহরহ পাশে এসে

দাঁড়িয়েছে। সেবার ঠিক পূজার আগে আগে যখন তরুণের মার ডবল নিউমোনিয়া হলো তখন তরুণের বাবা গিয়েছিলেন কলকাতা। তরুণের সে কি ভয়। হাজার হোক একমাত্র ছেলে। সংসারের ঝুট-ঝামেলা বলতে যা বোঝায়, তা কোনদিনই সহ্য করতে হয় নি। তাইতো বাবার অনুপস্থিতিতে মার অসুখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। এপাড়া ওপাড়া থেকে অনেকেই এসেছিলেন। চিকিৎসা বা সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হয় নি ওদের সাহায্য সহযোগিতায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাঃ ঘোষালও বলেছিলেন, ভয় নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন।

মার অসুখের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তরুণকে খুব বেশী ঝামেলা পোহাতে হচ্ছিল না। মুহুরী মদনবাবুই ডাক্তারের কাছে দৌড়া-দৌড়ি করেছিলেন। ঔষধ-পত্র দেবার জন্য ও-বাড়ির জ্যেঠিমা সারাদিনই থাকতেন এ-বাড়িতে। এছাড়াও ঘোষালবাড়ির পিসিমা কতবার যে আসা-যাওয়া করতেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ইন্দ্রাণী তো ছিলই। মাসীমার বিছানার একপাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত সারাদিন। সন্ধ্যার পর সংসারের কাজ-কর্ম সেরে ইন্দ্রাণীর মা আসতেন। রাত্রি ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ ইন্দ্রাণীর বাবাও আসতেন। তিনজনে মিলে ফিরে যেতেন সাড়ে দশটা-এগারটার পরে।

তবু তরুণ ভয় পেয়েছিল। বাবাকে টেলিগ্রাম করেছিল, 'কাজ হলেই তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।'

বাবার লাইব্রেরি ঘরে টেবিলের উপর মাথা রেখে তরুণ আকাশ-পাতাল ভাবছিল। হঠাৎ কে যেন এসে আস্তে মাথায় হাত দিল। অন্য সময় হলে চমকে উঠত, কিন্তু মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত ছিল। একটুও নড়া-চড়া করল না। তবে বড় ভাল লাগল। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করল আরেকজনের সমবেদনা। অনুভব করল ভালবাসার নির্ভরযোগ্য স্পর্শ।

'কি এত ভাবছ ?' মৃদু গলায় ইন্দ্রাণী জানতে চাইল।

তরুণ কিছু উত্তর দিল না। আগের মতই টেবিলের উপর মাথা রেখে ভাবছিল কত কি ?

'বল না কি এত ভাবছ ?'

'না, তেমন কিছু না।' এবার তরুণ ছোট্ট উত্তর দেয়।

'তবে এমন করে একলা একলা বসে আছ কেন ?'

'এমনি—'

'আমাকেও সত্যি কথা বলবে না ?'

তরুণ টেবিলের উপর থেকে মুখ তুলে একবার ইন্দ্রাণীকে দেখে। মুখে একটু হাসির রেখা ফোটাবার চেষ্টা করে বলে, 'এমনি চুপচাপ বসেছিলাম।'

এবার ইন্দ্রাণীও হাসে। 'তুমি কি মনে কর আজও তোমাকে আমি বুঝতে পারলাম না ?'

কথায় কথায় কত কথা হয়।

'আচ্ছা, আমার যদি ভীষণ অসুখ করে ?' ইন্দ্রাণী মজা করেই প্রশ্ন করে।

'ভাল ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হবে।'

'কিন্তু তুমি কি কিছু করবে ? নাকি এমনি করে বসে বসে ভাববে ?'

কয়েকদিনের মধ্যেই মা ভাল হলেন। বাবাও কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। মাঝখান থেকে তরুণের একটা নতুন উপলব্ধি হলো।

সেটা হলো ইন্দ্রাণীর ভালবাসা। দুঃখের দিনে, বিষাদের দিনে একটা নিশ্চিত নির্ভয় আশ্রয়ের স্থির ইঙ্গিত।

অনেক দিন বাদে তরুণের মনে পড়েছিল সেদিনের স্মৃতি। ঘরবাড়ি থেকে অনেক দূরে মার মৃত্যু হলে তরুণ ইন্দ্রাণীর অনুপস্থিতি নিদারুণভাবে অনুভব করেছিল। বহুদিন পরে সেদিন হাল্সা

কোয়ার্টারে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে একলা বসে থাকতে থাকতে ইন্দ্রাণীর অভাব নতুন করে বড় বেশী মনে পড়ল।

ডিপ্লোম্যাটের নিজের জীবনের কথা ভাবার অবকাশ বড কম। ডিপ্লোম্যাট অনেক কিছু পায়, পায় না শুধু নিজের কাছে নিজেকে পাবার সুযোগ। ক'নও কখনও প্রকাশ্যে, নিভৃ:তে, তাকে নিরন্তর রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। দিনে অফিস, রাতে পার্টি। সেখানেও ছুটি নেই। মদ খেতে হয় গেলাস গেলাস। কখনও নিজের ইচ্ছায়, কখনও অন্যের আগ্রহে। তবুও মাতাল হতে পারে না ওরা। ভুলতে পারে না নিজের দেশের স্বার্থ।

তাইতো মুহূর্তের জন্যও মুক্তি নেই। কিন্তু যদি কদাচিৎ কখনও কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পায় ডিপ্লোম্যাট, তখন তার বড় বেশী মনে পড়ে নিজের কথা। অধুনা বিশ্ব রাজনীতিব. প্রতিটি পাতায় বার্লিনের উল্লেখ হলেও লণ্ডন-নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন-মস্কোর মত কূটনৈতিক চাঞ্চল্য নেই এখানে। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসে অবশ্য, তবে সে মাঝে মাঝেই। তাইতো বার্লিনে এসে তরুণ একটু বেশী যেন নিজেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের বেদনা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার এমন 'কোরাস' শোনার অবকাশ যেন এই প্রথ! এল তার জীবনে।

ঘরের চাবপাশে দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিতেই রাইটিং ডেস্কের পাশে মিঃ মিশ্রের একটা ছবি নজ‹ে পড়ল। তরুণ বড় ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এই মাতাল লোকটিকে। দেশে দেশে কত মানুষ দেখেছে তরুণ, কিন্তু গ্লানিহীন, কালিমামুক্ত এমন স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর কারুর দেখে নি। ঐ একই ডেস্কের আরেক পাশে ছিল ইন্দ্রাণীর একটি ছবি। ছবি দুটো অমন ক‹রে পাশ পাশি রাখার একটা কাহিনী ছিল।

ইউনাইটেড নেশনস-এ থাকার সময় তরুণের ফ্ল্যাটে এসে মিশ্র

যেদিন প্রথম ইন্দ্রাণীর ফটোটা দেখলেন, সেদিন উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইজ দিস দি ইনোসেন্ট গার্ল ইউ লাভ ?'

'ও যে ইনোসেন্ট তা আপনি জানলেন কি করে ?'

মিশ্র সাহেবের কথা বলার ঢং-ই ছিল আলাদা।......'লুক হিয়ার ইডিয়ট ইয়ংম্যান ! চোখ দুটো ভাল করে দেখ !'

একটু হাসতে হাসতেই তরুণ এক ঝলক দেখে নেয় ইন্দ্রাণীর চোখ দুটো।...'কিন্তু কই, ইনোসেন্স তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবে কোথা থেকে ? মনটা বোধহয় পুরোপুরি বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

তরুণ আরো কি যেন বলতে গিয়েছিল কিন্তু পারে নি। মিশ্র চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আর বাজে বকালে পুরো এক বোতল স্কচ খাওয়ালেও আমাকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না !'

দু' এক রাউণ্ড ড্রিংক আর কিছু গল্প-গুজবের পর মিঃ মিশ্র বলেছিলেন, 'দেখ তরুণ, আই অ্যাম এ ফাদার, বাট আই হ্যাভ মাদার্স মাইণ্ড। মাদার্স ফিলিংস !'

ঢক করে প্রায় আধ গেলাস হুইস্কীটা গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া ঐ হতচ্ছাড়ি মেয়েটা লুকিয়ে পড়বার পর আমি যেন ওদের মত মেয়েদের সব কিছু জানতে পারি, অনুভব করতে পারি। ঐ হোপলেস মেয়েটা আমাকে ঠকালেও আর কোন মেয়ে তা পারবে না।'

তরুণ গেলাসটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

অনেক দিন পর আজ হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেণ্ট নিঃসঙ্গ তরুণের বড় বেশী মনে পড়ছে সে রাত্রির কথা।

'...চোখ দুটো দেখেই আমি বুঝতে পারছি এ মেয়ে কাউকে ফাঁকি দেবে না, দিতে পারে না। সী মাস্ট বী ওয়েটিং ফর ইউ।'

নিজের একমাত্র মেয়েকে হারাবার স্মৃতিতে, ব্যথায়-বেদনায় সে

রাত্রে বিভোর হয়েছিলেন মিঃ মিশ্র।...'আমার ঐ হোপলেস মেয়েটার মত এই দুনিয়ায় কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা শুধু দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। তোমার এই ইন্দ্রাণী, আমার এই ইন্দ্রাণী মা সে জাতের নয়। ও বহুদিন ধরে বহু অন্ধকার মনে আলো ছড়াবে।'

রাইটিং ডেস্কের দু'পাশে ঐ দুটো ছবি দেখে তরুণের মনে ছোট ছোট টুকরো টুকরো স্বপ্নের মেঘ জমতে আরম্ভ করে। মেঘে মেঘে মেঘালয়ের প্রাসাদ গড়ে ওঠে মনের মধ্যে। একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ে। তরুণ যেন হঠাৎ ইন্দ্রাণীকে দেখতে পায়। ক'টি মুহূর্তের জন্য অসহ্য নিঃসঙ্গতার যবনিকাপাত হয়।...

'...কি এত ভাবছ ?'

চমকে উঠে তরুণ। 'কে ? ইন্দ্রাণী !'

ইন্দ্রাণী মুখে কিছু বলে না। কোন কালেই তো ও বেশী কথা বলে না। কৃষ্ণচূড়ার মত মাথা উঁচু করে নিজের প্রচার সে চায় না, সূর্যমুখীর মত ঔদ্ধত্যও নেই তার। রজনীগন্ধার বিনম্র মাধুর্য দিয়েই তো সে তরুণকে মুগ্ধ করেছে। আজও সে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আলতো করে তরুণের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। মুখে কোন জবাব দিল না, তবে যে চোখ দুটো হাস্য কোয়ার্টার ছাড়িয়ে, রেডিও টাওয়ার পেরিয়ে ঐ দূরের সীমাহীন আকাশের কোলে ঘোরাঘুরি করছিল, তাতে মিষ্টি তৃপ্তির ইঙ্গিত।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তরুণ কোন কথা বলতে পারে না। কৃষ্ণপক্ষের দীর্ঘ অমাবস্যার পর এক টুকরো চাঁদের আলোয় ঝলসে ওঠে মনপ্রাণ।

আবার একটা দমকা হাওয়া কোথা থেকে উড়ে আসে। ইন্দ্রাণী লুকিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিয়ে খেলা করার সুযোগও শেষ হয় ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের।

কতক্ষণ ধরে টেলিফোনটা বাজছিল তা সে জানে না! খেয়াল হতেই উঠে গেল।...'ইয়েস মিত্রা স্পীকিং।'

অ্যাম্বাসেডর! বন থেকে? তবে কি ইন্দ্রাণীর কোন হদিশ পাওয়া গেল? না। মাস তিনেকের জন্য বন-এ থাকতে হবে জার্মান ইলেকশন আসছে বলে। চ্যান্সেলার কোনার্ড আডেনুরের জয়লাভ হবে কি? নাকি···। ইলেকশন সম্পর্কে স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হবে দিল্লীতে!

না বলবার কোন অবকাশ নেই। অ্যাম্বাসেডর নিজে টেলিফোন করেছেন। সি-জি'ও তো রাজী। সুতরাং শুধু জানতে চাইল, 'হোয়েন সুড আই রিপোর্ট স্যার?'

'কাম বাই নেক্সট উইক-এণ্ড।'

ধন্যবাদ জানিয়ে তরুণ টেলিফোন নামিয়ে রাখল। কৌচে না বসে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে করতে ভাবল, ইন্দ্রাণীকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। চিন্তায় ভাবনায় ভাবতে হবে ঐ বৃদ্ধ আডেনুরের কথা। বাহাত্তর বছর বয়সে যাঁর জীবন-সূর্য পৃথিবীর মহাকাশে উঁকি দিয়েছে, যিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে ঠাণ্ডা জলে পা দুটো ডুবিয়ে রেখে মাথায় তাজা রক্ত পাঠান আর ক্যাবিনেট মিটিং-এ সভাপতিত্ব করার সময় ঘন-ঘন চকোলেট খান, দিবারাত্রি ভাবতে হবে তাঁর কথা!

অতি দুঃখের মধ্যেও তরুণের হাসি পায় আডেনুরের কথা ভেবে। ঘুরতে হবে ঐ বিচিত্র বৃদ্ধের সভায় সভায়, যিনি তাঁর রোয়েনডুর্ফের বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে ক্লান্ত হলে এক বোতল রাইন ওয়াইন খেয়ে নিজেকে তাজা করে নেন!

। পনের।

মাইনে ও পদমর্যাদা দিয়ে গুরুত্ব বিচার করা যায় কল-কারখানায়, সওদাগরী অফিসে ও সাধারণ সরকারী দপ্তরে। হয়ত আরো কিছু কিছু জায়গায়। সর্বত্র নিশ্চয়ই নয়। বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ ও কূটনৈতিক দুনিয়ায় তো নয়ই। একবার পরীক্ষায় পাশ করে দু'-চারটে প্রমোশন পেয়ে কিছুটা উপরে উঠলেই এই দুটি দপ্তরে গুরুত্ব বাড়ে না। পুলিশের এস-পি বা ডি-এস-পি'র চাইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইনস্‌পেক্টর ও ইনস্‌পেক্টরদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বেশী। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনগুলিতেও ঠিক এমনি হয়।

বিগ পাওয়ারদের কথাই আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যাম্বাসেডরের চাইতে প্রায় অজ্ঞাত এক থার্ড সেক্রেটারীর গুরুত্ব অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে এই থার্ড সেক্রেটারীর গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই অ্যাম্বাসেডরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ভারতবর্ষ বিগ পাওয়ার হয় নি বলেই হয়ত এখনও কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে অ্যাম্বাসেডরের দস্তখত প্রয়োজন হয়। তবে ভারতীয় মিশনগুলিতেও শুধু মাইনে ও পদমর্যাদা দিয়েই ডিপ্লোম্যাটদের গুরুত্ব বিচার করতে গেলে অন্যায় ও ভুল হবে।

বন-এ ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর পলিটিক্যাল কাউন্সিলার হয়েও রাজনৈতিক ব্যাপারে মিঃ আহুজার বিশেষ কোন গুরুত্ব বা প্রাধান্য নেই। যখন প্রায় রাতারাতি ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের জন্ম হয়, তখন মিঃ আহুজা ডি-এ-ভি কলেজের দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনার কাজে হঠাৎ ইতি দিয়ে ডিপ্লোম্যাট্‌ হন! প্লুটো, সক্রেটিস বা ভগবান বুদ্ধের সংস্পর্শ ত্যাগ করেও আহুজা সাহেবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি।

বরং বছর বছর মাইনে বেড়েছে ও কয়েক বছর পর নিয়মিত প্রমোশনও পেয়েছেন। তবুও ওঁর পর ঠিক নির্ভয় করা যায় না এবং ক্ষেত্র-বিশেষে নির্ভর করাও হয় না।

প্রত্যেক শুক্রবার আহুজা সাহেব তাঁর পলিটিক্যাল রিপোর্ট অ্যাম্বাসেডরকে দেন এবং অ্যাম্বাসেডর একটু চোখ বুলিয়েই তা বন্দী করে রাখেন নিজের ড্রয়ারে। সেকেণ্ড সেক্রেটারীর রিপোর্টটাই কেটেকুটে পাঠিয়ে দেন দিল্লী।

এবার পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশী। উনপঞ্চাশ থেকে প্রতি নির্বাচনে যা হয়েছে এবার ঠিক তা হবে কিনা কেউ জানে না! অনেকের মনেই অনেক রকম সন্দেহ। বার্লিন নিয়ে দুটি সুপার-পাওয়ারের ঠাণ্ডা লড়াই নেহাৎ হঠাৎই জমে উঠেছে বলে এই নির্বাচন আরো বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাইতো অ্যাম্বাসেডর তলব করেছেন তরুণকে।

তরুণকে টেলিফোন করার পরদিন সকালের কনফারেন্সে অ্যাম্বাসেডর নিজেই বললেন, 'আওয়ার ওয়েস্ট ইউরোপীয়ান ডেস্ক ওয়াণ্ট ডিফারেণ্ট স্টাডিজ অ্যাবাউট ইলেকশন এবং সেইজন্যই আমি বার্লিন থেকে তরুণকেও আসতে বলেছি।'

এই নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু কোনার্ড আডেনুর। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের কাছে আডেনুর অপরিচিত নাম নয়। বরং সে জানে রসিক কূটনীতিবিদরা আদর করে এঁর নাম রেখেছেন জন ফস্টার আডেনুর!

অরণ্যেও দিন-রাত্রি হয় কিন্তু আডেনুরের কাছে নয়। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবার পরও এই মহাপুরুষ রাশিয়াকেও ঠিক স্বীকৃতি দিতে রাজী নন! ইন্দ্রাণীর সব স্মৃতি, সব কথা দূরে সরিয়ে রেখে তরুণ আডেনুরের চিন্তায় ডুবে গেল।

উনিশ শ' চোদ্দয় যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আডেনুরের বয়স একত্রিশ। কোলোনের লর্ড মেয়র হন আরো

দশ বছর পর। নাজাদের সময় এঁকে বনবাসে যেতে হয়। যুদ্ধের পর আমেরিকানরা আবার একে মেয়র করলেও ইংরেজ সেনাবাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান, 'অকর্মন্যতার' জন্য এঁকে পদচ্যুত করেন। চাকা ঘুরে গেল। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেন পশ্চিম জার্মানীর সর্বেসর্বা—চ্যান্সেলার! তারপর এক যুগ ধরে চলেছে দাদুর রাজত্ব। একচ্ছত্র আধিপত্য! এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে?

তরুণ জানে দাদুকে এককালে সবাই ভয়-ভক্তি করলেও আজ নিন্দায় মুখর বহুজনে। প্রকাশ্যে, মুক্তকণ্ঠে!

নির্বাচনের উত্তেজনায় কটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে কেটে গেল, তরুণ টের পেল না। পনের দিনে দশটি প্রদেশে ঘুরে ঘুরে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে! বড় বেশী ক্লান্ত বোধ করছিল। অ্যাম্বাসেডের বড় খুশী হয়েছিলেন তরুণের রিপোর্টে। তাইতো সবকিছু মিটে যাবার পর অ্যাম্বাসেডর তরুণকে বললেন, 'বড্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে। টেক সাম রেস্ট রিটার্নিং টু বার্লিন!'

তরুণ ধন্যবাদ জানাল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ স্যার!'

প্রথম দু'-তিন-দিন তো কোলোনেই কেটে গেল। দিনে মিউজিয়ামে ও রাতে নাইট ক্লাব রোমান্টিকাতে। রোজ রোজ যেতে ভাল না লাগলেও চ্যাটার্জীর পাল্লায় পড়ে যেতেই হতো, আর ঐ দোতালার কোণার টেবিলে বসে ·াইন ওয়াইন খেতে খেতে শুনতে হতো ওর ইন্দোনেশিয়ার কাহিনী।

তরুণের এসব কোনকালেই ভাল লাগে না। বিশেষ করে যারা নিজের অধঃপতনের কাহিনী বলতে গর্ব অনুভব করে, তাদের তরুণ মনে মনে দারুণ ঘৃণা করে। তবুও চ্যাটার্জীকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। হাজার হোক এককালের সহকর্মী ও সমসাময়িক। দিল্লীতে রোজ একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছে, সন্ধ্যায় কনট প্লেস ঘুরেছে, সাপ্রু হাউসে ওড়িসী নাচ দেখেছে। আরো কত কি করেছে।

চ্যাটার্জীর প্রথম ফরেন পোস্টিং হলো ইন্দোনেশিয়া। নিষ্ঠাবান, আদর্শবান, ধর্মভীরু সন্তোষ চ্যাটার্জী অত্যন্ত খুশী হয়েছিল এই ভেবে যে ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে গিয়েও অতীত দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শ অনুভব করবে প্রতি পদক্ষেপে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় সওদাগরের দল হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি এনেছিলেন এই দেশে, তার চিহ্ন আজও সযত্নে সসম্মানে দেখতে পাওয়া যাবে। কীর্তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড আর বাণ্ডিল বাণ্ডিল ধূপকাঠি নিয়ে যে সন্তোষ চ্যাটার্জী একদিন ভোরবেলায় বোম্বে থেকে পি-অ্যাণ্ড-ও কোম্পানীর জাহাজে চড়ে ইন্দোনেশিয়া রওনা হয়েছিল, সে সন্তোষ আর ফিরে আসে নি। হোটেল ইন্দোনেশিয়ার জাভা রুমে আর কেবাজোরান মডেল টাউনের ঐ ছোট্ট কটেজের বেডরুমে অসংখ্য ক্ষণিক বান্ধবীদের উষ্ণ সান্নিধ্যে সে চ্যাটার্জীর মৃত্যু হয়েছে।

রাইন নদীর শোভা না দেখে রোমান্টিকাতে বসে বসে সেই সর্বনাশা নোংরা কাহিনী শুনতে শুনতে বিরক্তবোধ করে তরুণ। হাতে দিন তিনেক মাত্র সময় ছিল, কিন্তু তবুও সেকেণ্ড সেক্রেটারী হাবিবকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্ল্যাক ফরেস্টের দিকে।

নির্বাচনের পরিশ্রম আর চ্যাটার্জীর সান্নিধ্যে বড্ড ক্লান্তবোধ করছিল তরুণ। ব্ল্যাক ফরেস্টের নির্জন কটেজে বেশ লাগল দুটি দিন। তাছাড়া অনেক দিন পর হাবিবের গান শুনতে আরো ভালো লাগল। নিজে গান শেখে নি, তবে বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। হাজার হোক রামপুরের খানাদানী বংশের ছেলে তো। হাবিবের দরবারী কানাড়া শুনতে রাত জাগতে হতো না। সন্ধ্যার পর সাপার শেষ করে কটেজের বারান্দায় বসেই শোনা যেত। ঘড়ির কাঁটায় মাত্র আটটা বাজলেও মধ্যরাত্রির গাম্ভীর্যভরা ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যে তরুণ যেন ফেলে আসা বাংলাদেশের স্মৃতি খুঁজে পেতো।

সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভয়ানক ভাবে হাহাকার করে উঠত। দরবারী কানাড়ার মিষ্টি সুর কানে ভেসে এলেও বুকটা বড় বেশী জ্বালা করত।

হাবিবের গান থামত কিন্তু তরুণ যেন তখনও বিভোর হয়ে থাকত। আত্মমগ্ন থাকত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হাবিব একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করত, 'কিয়া দাদা, কোন কষ্ট হচ্ছে ?'

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়েই আসত। মুখে বলত, 'না না, কষ্ট হবে কেন ?'

ব্ল্যাক ফরেস্টের নির্জনতা আবার দু'জনকে ঘিরে ধরে। বেশ কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলে না।

হাবিব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দেয়, 'দাদা, হ্যাভ এ সিগারেট।'

'সিগারেট ?'

নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্ন করে। মাথাটা হেঁট করে একবার নিজেকেই নিজে দেখে নেয়। আবার একটা চোরা দীর্ঘনিশ্বাস! 'হাবিব! বেটার গিভ মী সাম ড্রিংকস্!'

তরুণ মিত্র ড্রিংকস্ চাইছে ? হাবিব স্তম্ভিত হয়ে যায়। পার্টিতে, রিসেপশনে বা ককটেলে দু'-এক পেগ খেলেও ড্রিংকের প্রতি কোন আগ্রহ বা দুর্বলতা নেই ওর। একথা ফরেন সার্ভিসের সবাই জানেন। হাবিবও জানে।

'ইউ ওয়াণ্ট ড্রিংক ?'

'কেন, ফুরিয়ে গেছে নাকি ?'

'না না, ফুরোবে কেন, বাট……।'

'তবে আবার দ্বিধা করছ কেন ?'

হাবিব একটু হাসতে হাসতেই বলে, 'আপনাকে তো কোনদিন ড্রিংক চাইতে দেখিনি, তাই……।'

ওই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই তরুণ একবার হাসে। 'আগে কোনদিন যা করিনি, ভবিষ্যতে কি তা করা যায় না?'

ইন্দ্রাণী সম্পর্কে অ্যাম্বাসেডর যে মেসেজটা দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন তা হাবিবের হাত দিয়েই গিয়েছিল। তাছাড়া কন্সাল জেনারেল বন-এ এলেও সব শুনেছিল। তাইতো অযথা তর্ক করতে চায় না সে।

ঘর থেকে ওয়াইনের বোতলটা এনে দুটো গেলাসে ঢালে।

'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

আবার কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকার পর তরুণ জানতে চায়, 'আচ্ছা হাবিব, তোমার বাড়িতে সবাই আছেন তাই না।'

'হ্যাঁ, বাবা-মা ভাই-বোন······!'

'তুমি বিয়ে করবে না?'

'হ্যাঁ, করাচি যাবার আগেই বিয়ে করে যাব।' অনায়াসে জবাব দেয় হাবিব।

পাকিস্তানের নাম শুনেই তরুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'তুমি করাচি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ দাদা।'

'কবে?'

'এইত তিন সপ্তাহের মধ্যেই আই উইল সেল্ ফর বম্বে। তারপর সিকস্ উইকস্ দেশে থেকেই করাচি যাব।'

ওয়াইন গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েও নামিয়ে রাখল তরুণ। স্বগতোক্তির মত চাপা গলায় বলল, 'তুমি করাচি যাচ্ছ?'

হাবিবও গেলাসটা নামিয়ে রাখে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দেয়। দু'-এক মিনিট চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, 'দাদা, করাচিমে কোই কাম হ্যায়?'

এবার একটু জোর করেই হাসে তরুণ, 'কাম ? একটু জরুরী কাজ আছে ভাই।'

'টেল মী হোয়াট আই উইল হ্যাভ টু ডু।' মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করে বলে, 'যদি আমার দ্বারা না হয় তাহলে আই উইল আস্ক মাই আংকেল টু হেল্‌প মী।'

'হু ইজ ইওর আংকেল ?'

'উনি পাকিস্তান ফরেন মিনিস্ট্রির অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারী।'

উল্লসিত হয় তরুণ, 'রিয়েলি ?'

আর থাকতে পারে না তরুণ। হাবিবের হাত দুটো চেপে ধরে বলে 'ইউ মাস্ট হেল্‌প মী, হাবিব।'

'নো কোশ্চেন অফ হেল্‌প দাদা, আপনার কাজ করা আমার কর্তব্য।'

ঐ রাত্রে দূর থেকে ব্ল্যাক ফরেস্টে সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত পেলো ভগ্নমনা তরুণ মিত্র।

জলপ্রপাতের জলধারা যেমন দুরন্ত বেগে গড়িয়ে পড়ে, তরুণও প্রায় সেই রকম এক নিশ্বাসে সব কথা বলে ফেললে হাবিবকে।

'অত করে বলার কিছু নেই। কিছু কিছু আমিও জানি, বিকজ আই সেণ্ট দ্য অ্যাম্বাসেডর্স মেসেজ টু ফরেন অফিস।'

এই পৃথিবীতে মানুষের কত কি সহ্য করতে হয়। জরা, দারিদ্র্য, ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রিয়হীন নিঃসঙ্গ মানুষের মত অসহায় আর কেউ নয়। কাজের মধ্যে যখন ডুবে থাকে, যখন বৃদ্ধ আডেনুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যালান্সশীট মেলাতে হয়, তখন বেশ কেটে যায়। কিন্তু যখন কাজের চাপ নেই, যখন ব্ল্যাক ফরেস্টের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে নিজেকে বড় বেশী অনুভব করা যায়, যখন নিজের হৃৎপিণ্ডের মৃদু স্পন্দনও দৃষ্টি এড়ায় না, তখন হাবিবের মত কনিষ্ঠ সহকর্মীর কাছেও আত্মসমর্পণ করতে লজ্জা করে না।

হাবিবের দুটো হাত চেপে ধরে তরুণ বলে, 'ইউ মাস্ট ডু স্যমথিং হাবিব। আমি বড্ড লোন্‌লি।'

বন-এ ফিরেই অ্যাম্বাসেডরের কাছে আর একটা সুখবর পাওয়া গেল।

'দেয়ার ইজ এ গুড পিস্‌ অফ নিউজ ফর ইউ।'

তরুণ মুখে কিছু বলে না, শুধু অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে অ্যাম্বাসেডরের দিকে।

'পাকিস্তান ফরেন অফিস হ্যাজ ইনফর্মড আওয়ার ফরেন অফিস যে, রায়ট ভিক্‌টিমসদের সমস্ত নাম চেক আপ করেও ইন্দ্রাণীর নাম পাওয়া যায় নি।'

'রিয়েলি স্যার ?' তরুণের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অ্যাম্বাসেডর ডান হাত দিয়ে তরুণের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'তুমি ফাইল দেখতে চাও ?'

অ্যাম্বাসেডর মনে আঘাত পেলেন নাকি ? 'না না, স্যার। ফাইল দেখে কি করব ? আপনার মুখের কথাই আমার যথেষ্ট।'

অ্যাম্বাসেডর আরো বললেন, 'তবে পাকিস্তান ফরেন অফিস জানিয়েছে, ইট উইল টেক টাইম টু ট্রেস আউট ইন্দ্রাণী।'

টাইম ? তা তো লাগবেই। পুলিশের ফাইল ঘেঁটে বর্ডার চেকপোস্টগুলোর রেকর্ড দেখতে হবে, ইন্দ্রাণী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে চলে গেছে কিনা। বর্ডার চেকপোস্টের রেকর্ড হদিশ না পেলে আবার নতুন করে খোঁজ করতে হবে। সময় তো লাগবেই।

'...তাছাড়া হাবিব ইজ গোয়িং টু করাচি অ্যাণ্ড হিজ আংকেল ইজ দ্য রাইট পার্সন টু হেল্‌প আস।'

'হ্যাঁ স্যার, তাইতো শুনলাম।'

'সুতরাং তোমার আর চিন্তা কি ? বাই দ্য টাইম ইউ লিভ বার্লিন, ইন্দ্রাণী উইল রিজয়েন ইউ।'

তরুণ মনে মনে বলে, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক স্যার।

দুঃখে নয়, আক্ষেপে নয়, গোপন খবর সংগ্রহের জন্যও নয়, নিছক আনন্দে, খুশীতে সে রাত্রে হাবিবের সঙ্গে বোতল বোতল রাইন ওয়াইন ড্রিংক করল তরুণ।

। ষোল ।

অ্যাম্বাসেডরের টেলিফোন পেয়ে কাউকে খবর না দিয়েই বার্লিন ত্যাগ করেছিল তরুণ। বন-এ থাকবার সময়ও অবসর পায় নি কাউকে চিঠিপত্র দেবার। বন্দনাকেও নয়। ফিরে এসে দেখল অনেক চিঠিপত্র এসেছে। একটা খামে পাকিস্তানী স্ট্যাম্প দেখে চমকে উঠল। ঢাকা থেকে মণিলাল দেশাই ?

সবার আগে ঐ চিঠিটাই খুলল। চিঠিটি দীর্ঘ নয়। চটপট পড়ে ফেলল। তারপর আবার পড়ল।···পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট বেশ সিরিয়াসলি কেসটা টেক-আপ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। শুনছি পার্টিশানের সময় যেসব সরকারী কর্মচারী ঢাকায় ছিলেন তাদের কাছে একটা সার্কুলার পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর খবর জানবার চেষ্টা করা হবে। মাইনরিটি কমিশন এইভাবে বহু লোকের খবর জেনেছেন এবং মনে হয় এক্ষেত্রেও কিছু খবর পাওয়া যাবে। তবে এসব ব্যাপারে সময় লাগবেই।

দেশাই যে ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনে আছে, একথা তরুণ জানত না। মণিলাল গুজরাটী হলেও জন্মেছে কলকাতায়, ভবানীপুরে। লেখাপড়াও শিখেছে কলকাতায়। মণিলালের বাবা সৌরাষ্ট্রে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে যৌবনে চলে আসেন কলকাতা। নগণ্য পুঁজি, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা শুরু

করেন। কিন্তু পরিশ্রম ও সততার জন্য কয়েক বছরেই নিজের অদৃষ্ট ঘুরিয়ে ফেলেন।

মণিলালের বাবা ছেলেকে ব্যবসায় ঢুকতে দেন নি। 'তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হও? আমার মত দোকানদারী করো না।'

মণিলাল ব্যর্থ করে নি তাঁর বাবার আশা। কলকাতার রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রামে অবাঙালীদের প্রতি বাঙালীদের বিতৃষ্ণার প্রকাশ দেখেছে বহুদিন কিন্তু বিরক্ত বোধ করে নি। সে তো বোম্বে, আমেদাবাদ, সুরাট বা বরোদার গুজরাটী নয়। সুরাটের আত্মীয়-বন্ধুরা তো ওদের বাঙালী বলে। মণিলাল তার জন্য গর্ব অনুভব করে। দেশে গেলে ওদের সঙ্গে তর্ক করে, ঝগড়া করে বাঙালীর হয়ে।

মণিলালের সঙ্গে তরুণ বছর খানেক মাত্র কাজ করেছিল দিল্লীতে। তারপর আর দেখা হয় নি কোনদিন। সেই মণিলাল দেশাই চিঠি লিখেছে!

মুগ্ধ বিস্মিত তরুণ রাইটিং ডেস্কের ওপর রাখা ইন্দ্রাণীর ফটোটা একবার দেখে নেয়। তারপর আপন মনে প্রশ্ন করে, এত লোকের প্রচেষ্টাও কি তুমি ব্যর্থ করে দেবে?

দেশাই-এর চিঠিটায় আরেকবার চোখ বুলিয়ে উঠে যায় রাইটিং ডেস্কের কাছে। হাতে তুলে নেয় ইন্দ্রাণীর ফটোটা।

'......অনেক দিন পর আমাকে দেখলে? তাই না?'

নিজের প্রশ্নের কৈফিয়ত নিজেই দেয়, 'কি করব বল? তুমি তো জান ডিপ্লোম্যাটের জীবন!'

একটু থামে। একটু হাসে। 'আমার মত ঘরকুনো কুঁড়ে ছেলে কি এমনি এমনি বেরুতে চায়? একলা একলা থাকতে কি ভাল লাগে? এই এত বড় অ্যাপার্টমেণ্টে একলা একলা থাকতে বুকটা বড় জ্বালা করে, বড় বেশী করে তোমাকে মনে পড়ে...'

চোখের দৃষ্টিটা যেন একটু ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি

ফটোটা নামিয়ে রেখে ফিরে আসে কৌচে। চিঠিপত্রের বাণ্ডিল হাতে তুলে নেয়।

বন্দনা ছুটো ছিঠি লিখেছে ?…'কি আশ্চর্য লোক বলো তো তুমি! কদিন তোমার খবর পাই না। ছুটো-তিনটে চিঠি লিখেও কোন জবাব পেলাম না। তোমার জন্যে যে আমার কত ভাবনা-চিন্তা হয়, তা হয়ত বিশ্বাস কর না বা জান না। জানলে কখনও তুমি আমাকে এমন কষ্ট দিতে না।…'

এতক্ষণ পর্যন্ত তবু সহ্য করেছিল তরুণ কিন্তু তারপর কি লিখেছে ?

'…আমি না হয় মা'র পেটের বোন নই, কিন্তু তাই বলে আমাকে এমন ছুঃখ দেবে কেন ? আমার ভালবাসাব এমন অমর্যাদা করবে কেন ?…'

পাগলী মেয়েটা দ্বিতীয় চিঠিটায় শুধু ছুটো লাইন লিখেছে, 'দয়া করে শুধু জানাও তুমি সুস্থ আছ, ভাল আছ। সম্ভব হলে বার্লিন গিয়ে তোমার খোঁজ করে আসতাম। কিন্তু তুমি জান, সে সামর্থ্য আমার নেই।'

বড় অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বন-এ যাবার পর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটেছে, ঘুরতে হয়েছে কয়েক হাজার মাইল। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লিখতে হয়েছে লম্বা লম্বা রিপোর্ট। কিন্তু তবুও বন্দনাকে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল। বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

আরো একটা অন্যায় হয়ে গেছে। বন্দনা সামান্য চাকরি করে। তাছাড়া প্রতি মাসেই দেশে বেশ কিছু পাঠাতে হয়। বিকাশেরও একই অবস্থা। সুতরাং কদিনের জন্য বার্লিন বেড়াতে আসা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তরুণেরই উচিত ছিল একবার ওদের নিয়ে আসা। ওরা ছাড়া তরুণের আর কে আছে ?

বেশ ক্লান্তবোধ করছিল। কোনমতে জামা কাপড় চেঞ্জ করে

কয়েকটা স্যাণ্টউইচ আর এক কাপ কফি খেয়ে নিল। তারপর একটা দীর্ঘ চিঠি লিখল বন্দনাকে।

শেষে লিখল, 'কিছুদিনের জন্য তোমরা দু'জনে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে। বিকাশকে বোলো ডেপুটি হাই কমিশনারকে আমার কথা বলতে। তাহলে ওর ছুটির কোন অসুবিধা হবে না। আর তোমার ছুটি নেবার তো কোন ঝামেলাই নেই! অ্যাপ্লিকেশন লেখ না বলেই তো ছুটি পাও না। প্যান অ্যামেরিকান অফিসে খোঁজ করে তোমাদের 'ওপন' টিকিট দুটো নিয়ে নিও।'

চিঠি শেষ করার আগে আরো দুটো লাইন জুড়ে দিল, 'যদি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করতে না পার তবে এ চিঠির জবাব দিও না। আর আমাকে দাদা বলেও কোনদিন ডাকবে না।'

পরের দিন সকালে অফিসে গিয়েই প্যান অ্যামেরিকান অফিসে ওদের দু'জনের ভাড়া পাঠিয়ে দিল।

চিঠির জবাব এলো না। চারদিন পর এলো টেলিগ্রাম, 'রিচিং ফ্রাইডে প্যান অ্যাম ফ্লাইট ফাইভ-সেভেন-সিক্স—বন্দনা-বিকাশ।'

তরুণ জানত এমনি একটা কিছু হবে। বন্দনা যতই রাগ করুক ওর চিঠি পাবার পর আর রাগ করে থাকতে সাহস করবে না। কেবল্‌টা পাবার পর তরুণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কেবল্‌টা হাতে নিয়ে চলে গেল কন্সাল জেনারেল ট্যাণ্ডনের ঘরে। কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'হ্যাভ আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট বন্দনা?'

ট্যাণ্ডন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'কতবার বলেছ তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে?'

'বন্দনা আর বিকাশ আমার এখানে আসছে।'

'হোয়াট ইজ হোয়াই ইউ লুক লাইক এ ম্যাড চ্যাপ।'

তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে।

'ওরা কবে আসছে?'

'এই শুক্রবার।'

'তাহলে তো সময় নেই। বাড়ি ঘরদোর তো একটু ঠিকঠাক করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিছু তো করতেই হবে।'

'তাহলে তুমি বরং বাড়ি যাও। আমি অফিসে আছি।'

'না না, তা কি হয়?' কৃতজ্ঞ তরুণ বলে।

'আই সে গো হোম! এর পর তর্ক করলে বকুনি খাবে।'

আর একটি কথাও না বলে তরুণ চলে এলো নিজের ঘরে। টুকটাক কাগজপত্র সামলে নিয়ে অফিস থেকে বিদায় নিল।

অ্যাপার্টমেণ্টে একবার ঘরদোর ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে ভাবছিল ওদের জন্যে স্পেশ্যাল কি করা যায়। আর এক চক্কর ঘুরতে গিয়ে রাইটিং ডেস্কের উপর রাখা ইন্দ্রাণীর ফটোটা বড় বেশী চোখে লাগল। আলতো করে ফটোটা তুলে নিল নিজের হাতে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'শুনছ, বন্দনারা আসছে। তুমি আসবে না?'

মনে হল ইন্দ্রাণী জবাব দিল, 'আসব বৈকি। তোমাকে ছেড়ে আর কতকাল থাকব বল।...'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী কোথায় লুকিয়ে পড়ল। ফটোটা নামিয়ে রেখে তরুণ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, 'টরুণ হিয়ার...কি ভাবীজি? কি ব্যাপার?'

হঠাৎ এমন সময় মিসেস ট্যাণ্ডনের টেলিফোন।

'বন্দনা আসছে?'

'এর মধ্যে সে খবর আপনার কাছে পৌঁছে গেছে?'

'উনি এক্ষুনি অফিস থেকে টেলিফোন করে জানালেন।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'শুক্রবার মানে পরশু আসছে?'

'হ্যাঁ ভাবীজি।'

এবার ভূমিকা ত্যাগ করে কাজের কথায় এলেন ভাবীজি, 'তোমার অ্যাপার্টমেণ্ট ছোট হলেও ওদের তো আমার কাছে থাকতে দেবে না। তা যাই হোক সারা দিন তো তোমরা ঘোরাঘুরি করবেই এবং রোজ সন্ধ্যার পর ঠিক হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢুকবে···।'

'না না, ভাবীজি, বন্দনা আবার ওসব পছন্দ করে না।'

'তা না করুক। মোট কথা রোজ সন্ধ্যার পর তোমরা তিনজনে আমার এখানে আসবে। গল্পগুজব—খাওয়া-দাওয়া করে ফিরে যাবে, বুঝলে?'

বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তরুণ বলল, 'রোজ কি সম্ভব হবে?'

'তবে কি একদিন ডিনার খাইয়ে ভদ্রতা করতে বলছ?'

আর কি বলবে তরুণ? 'আচ্ছা ভাবীজি, আপনার সঙ্গে তর্ক করার সাহস তো আমার হবে না।'

বিকেল বেলার দিকে মিঃ দিবাকর এলেন।

'কি ব্যাপার? কোন জরুরী খবর আছে নাকি?' তরুণ জানতে চায়!

'সি-জি পাঠিয়ে দিলেন। আপনার বোন-ভগ্নীপতি আসছেন, তাই যদি কোন দরকার থাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'সি-জি জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনার কি ড্রাইভার লাগবে? যদি লাগে তাহলে···'

'না না, আমি তো নিজেই ড্রাইভ করি। ড্রাইভার লাগবে কেন?'

বন্দনারা আসছে শুনে মিঃ ও মিসেস ট্যাণ্ডন অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আপনজন বলতে তরুণের কেউ নেই। মা-বাবা ভাই-বোন কেউ না। যারা সহজ পথে প্রথম প্রেম ভুলতে পারে তরুণ তাদের মধ্যেও পড়ল না? জীবনে আর কোন মেয়েকে সে

আপন ভাবতে পারল না। বন্দনারা এলে অন্তত কদিনের জন্য ওর নিঃসঙ্গতা ঘুচবে ভেবেই মিঃ ও মিসেস ট্যাণ্ডন অত্যন্ত খুশি।'

দুটো দিন কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তা টের পেল না তরুণ। শুক্রবার সকালে অফিস করে লাঞ্চ টাইমেই বেরিয়ে পড়ল। আনন্দে উত্তেজনায় লাঞ্চই খেল না। প্লেন ল্যাণ্ড করবে সওয়া তিনটেয়। প্লেনেই বন্দনাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে যাবে। তবুও তরুণ ভাবল, ওরা এলেই খাব।

প্লেন ল্যাণ্ড করার বেশ খানিকটা আগে পৌঁছে গেল এয়ার-পোর্টে। দেখেশুনে বেশ একটা ভাল জায়গায় গাড়িটা পার্ক করল, যাতে বেরুতে না দেরি হয়। একটি মুহূর্তও যেন অপব্যয় না হয়।

এয়ারপোর্টে লাউঞ্জে পয়চারি করতে করতে আর একবার মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নিল ওরা এলে কি করবে। ইতিমধ্যে কখন যে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে প্যান আমেরিকান প্লেন এসে গেছে, সে হুঁশ নেই। অতগুলো সাহেবসুবোর ভিড়ের মধ্যে টিপ করে বন্দনা প্রমাণ করতেই হুঁশ ফিরে এল তরুণের।

বন্দনার হাত দুটো ধরে তুলে নিতে নিতে বলল, 'আরে থাক থাক, এখানে নয়।'

কে কার বাধা মানে? কথা শেষ করতে না করতেই বিকাশও একটা প্রমাণ করল।

মালপত্র নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে বেরুতে তরুণ বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন কষ্ট হয় নি তো?'

বন্দনা বলল, 'ওর আবার কি কষ্ট হবে? বিনা পয়সায় বার্লিন ঘুরিয়ে দিচ্ছি, তাতে আবার কষ্ট কিসের?'

'আঃ বন্দনা! কি যা তা···'

এত সহজে কি বিকাশ হার মানে? 'তোমার টি বোর্ডের পয়সায় বার্লিন দেখছি?'

তরুণ থামিয়ে দেয়, 'বাড়িতে গিয়ে সারারাত ঝগড়া করা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি চলো তো।'

অ্যাপার্টমেণ্টে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। সামনে লিভিং রুমে মালপত্র নামিয়ে রেখেই তরুণ বলল, 'নাও নাও, চটপট হাত-মুখ ধুয়ে নাও ; ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।'

বিকাশ অবাক হয়ে বলল, 'সেকি দাদা, আমরা তো আজ ছু'বার লাঞ্চ খেয়েছি।'

কন্টিনেণ্টাল ফ্লাইট যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, ভূরিভোজনের ব্যবস্থা থাকেই—একথা তরুণ জানে। তবুও ওদের নিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবার লোভে বেশ কিছু ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই বন্দনা বলল, 'তুমি কি বলো তো দাদা! সারাদিন না খেয়ে বসে আছ?'

'আঃ! কি বকবক করছ। হাতমুখ ধুয়ে নাও, সবাই মিলে একটু কিছু মুখে দেওয়া যাক।'

বন্দনা আর তর্ক করে না। 'কোথায় কি আছে, একটু দেখিয়ে দাও তো দাদা।' বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটু তাড়াতাড়ি নাও। দেখছ না, দাদা না খেয়ে আছেন।'

সংসারধর্ম বুঝে নিতে মেয়েদের সময় লাগে না, বন্দনারও লাগল না। লিভিং রুমে কৌচে বসে সেণ্টার টেবিল টেনে নিয়ে মহানন্দে খাওয়া-দাওয়া মিটল। বন্দনাকে পেয়ে তরুণ হঠাৎ মহা কুঁড়ে হয়ে গেল, হাত ধুতেও উঠে গেল না।

'বন্দনা, একটু হাত ধোবার জল...।'

এমন সুরে কথাটা বলল যে বন্দনার বড় মায়া লাগল। 'তোমাকে কে উঠতে বলেছে?'

ঐ কৌচে বসেই শুরু হলো আড্ডা।

'সব চাইতে আগে বল, তোমাদের ছুটি কদিন?'

তরুণের এই প্রশ্ন শুনেই বন্দনা আর বিকাশ একবার দৃষ্টি-

বিনিময় করল। ওরা ভেবেছিল, এয়ারপোর্টেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। লণ্ডন থেকে রওনা হবার আগেই তাই শলা-পরামর্শ করে উত্তরদাতাও উত্তর ঠিক করে রেখেছিল।

বিকাশ চিবুতে চিবুতে বলল, 'নেকসট উইক থেকে আমাদের অডিট!'

চিমটি কেটে তরুণ জানতে চাইল, 'তিন চারদিন আছো তো?'

'না-না, দাদা, তিন-চারদিনের জন্য কি এত খরচা করে এতদূর আসে?'

বন্দনা চুপটি করে বসে মিট মিট করে হাসছিল। এবার তরুণ ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্দনা, তোমার অডিট কি এই উইকেই শুরু হচ্ছে?'

'আচ্ছা দাদা, অমন করে কথা বলছ কেন? আমি কি বলেছি—'

আর এগুতে হলো না।—'তোমার হয়ে আমিই না হয় বলে দিলাম।'

হাসি-খুশিতে ডগমগ হয়ে বন্দনা বলল, 'ও চলে যাবে যাক। আমি অত সহজে যাচ্ছি না।'

ফরেন সার্ভিসের কর্মচারীরা ফরেন সেক্রেটারীর চাইতে অডিট পার্টির নিম্নতম কর্মচারীকে যে বেশী ভয় করে, তা তরুণ জানে। তাছাড়া বিকাশের সেকশনের উপরেই যে অডিট করাবার ভার, সে খবরও তরুণ রাখে। 'তাহলে ছুটি পেলে কেমন করে?'

'ডেপুটি হাই-কমিশনারকে আপনার কথা বলাতেই এক উইকের ছুটি পেয়েছি। আদারওয়াইজ...!'

তরুণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। কি করা যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা বলল, 'আমি কিন্তু দাদা, মাসখানেক থাকব।'

'বিকাশের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

একি একটা প্রশ্ন? অত্যন্ত সহজ হয়ে বন্দনা উত্তর দেয়, 'কেন? দিনে ইণ্ডিয়া হাউসের বিখ্যাত ক্যান্টিন, আর রাত্রে স্বহস্তে সাত্ত্বিক আহার, অথবা ইতালীয়ান কাফে?'

'এতদিন ঐ হোটেল-রেস্তোরাঁয় খেয়ে কাটাবে ?'

বিকাশ বলে, 'না না, তাতে কি হয়েছে ?'

মফঃস্বলের ফৌজদারী কোর্টের উকিলের মত বন্দনার কাছে অফুরন্ত আর্গুমেন্টের রসদ। 'এতকাল কিভাবে কাটিয়েছে ?'

তরুণ একটু শাসন করে, 'আঃ! বন্দনা! বিয়ের পর যেন একটু মুখরা হয়েছ!'

ছুটি-ছাটা নিয়ে বেশ তর্কটা জমে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই ছেদ পড়ল।

'ছাখ তো বন্দনা, কে ?' হয়ত ভাবিজী।'

'কে ভাবীজি ?'

'আমার কন্সাল জেনারেলের স্ত্রী।'

ঠিক যা সন্দেহ করেছিল, তাই। সবাই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে রওনা দিল মিঃ ট্যাণ্ডনের বাড়ীর দিকে।

। সতের।

এককথায় যাকে বলে ভুরিভোজ তাই হলো। সবাই দল বেধে ড্রইংরুমে এলেন পোস্ট-ডিনার আড্ডার জন্য।

'আচ্ছা ভাবীজি, আমার জন্য তো এমন ভুরিভোজের আয়োজন কোনদিন হয় নি।'

ভাবীজি তরুণের কথার জবাব না দিয়ে বন্দনাকে বললেন, 'দেখেছ তোমার দাদার কি হীন মনোবৃত্তি? কোথায় বোন-ভগ্নি-পতিকে খাইয়েছি বলে খুশি হবে, তার বদলে কিনা হিংসা করছে!'

বন্দনা হাসে, বিকাশ হাসে, মিঃ ট্যাণ্ডনও হাসেন। কেউ কোন কথা বলেন না।

মিসেস ট্যাণ্ডন আবার শুরু করলেন, বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের

ইজ্জতই আলাদা। বিয়ের পর তুমিও এমনি ইজ্জত, আদর-অ্যাপয়ন পাবে।

বন্দনা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। শুধু একবার চুরি করে বিকাশের দিকে তাকাল একটু হাসল।

'বিয়ে না করলে ভাল-মন্দ খেতেও পাব না?' অবাক হয়ে তরুণ প্রশ্ন করে।

ভাবীজির স্পষ্ট জবাব, 'না।'

'সুড আই ম্যারী টু-মরো?'

এবার ভাবীজি হঠাৎ সীরিয়াস হলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আই উইশ ইউ কুড, তরুণ!'

ভাবীজির ভাবান্তর, ঐ ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাই পাল্টে গেল। অটামের বার্লিনের আকাশ হঠাৎ মেঘে ছেয়ে গেল।

'জানো বন্দনা, আমার আর ভাল লাগে না। সত্যি ভাল লাগে না। নিজের ছেলে-মেয়ে আত্মীয়স্বজন কতদূরে পড়ে রয়েছে। এদের নিয়েই তো আমার সংসার।'

মিঃ ট্যাণ্ডন, তরুণ, বিকাশ চুপটি করে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। বন্দনা বলল, 'তা তো বটেই।'

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস। 'আর এদেরই মুখে যদি হাসি না দেখি, তাহলে কেমন লাগে বলো তো?'

আর এগুতে পারলেন না ভাবীজি। গলার স্বর আটকে এল। ঠিক তাকিয়ে না দেখলেও সবাই বুঝল, মিসেস ট্যাণ্ডনের চোখের কোণায় জল এসে গেছে।

সিচুয়েশনটা সেভ করার চেষ্টা করলেন স্বয়ং ট্যাণ্ডন। 'আঃ, এখন আর দুঃখ করছ কেন? ইন্দ্রাণী উইল বী উইথ আস ভেরী সুন।'

মিসেস ট্যাণ্ডন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। 'বাজে বকো না তো! ভেরী সুন ভেরী সুন করতে করতে তো তুমি রিটায়ার করতে চলেছ!'

প্রথম দিনের পরিচয়, ব্যবহারেই ভাবীজিকে দেখে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় বন্দনা, বিকাশ। দাদাকে ওঁরা এত ভালবাসেন ?

হ্যাঁ।

ফেয়ারলি প্লেসে বা রাইটার্স বিল্ডিং-এ সারা জীবন কাটাতে হয় অনেককেই। পাশাপাশি বসে সারাজীবন কাজ করতে করতে তিক্ততা আসে বৈকি! কিন্তু যাদের জীবনে সে স্থায়িত্ব কোনদিনই আসবে না, আসতে পারে না, তাদের সবার মন ঠিক বিষাক্ত হতে পারে না। হবার অবকাশ নেই। বিষ একটু এগুতে না এগুতেই ট্রান্সফার! কানাড়া থেকে আলজিরিয়া, লণ্ডন থেকে কলম্বো, পিকিং থেকে প্যারিস। আট-দশ-বারো বছর পর যখন আবার দেখা হয়, তখন সে বিষের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতীত দিনের এই তিক্ততা যদি কেউ মনে করে রাখত তবে কি ওবেরয় আজো ফরেন-সার্ভিসে থাকতে পারত ?

রাত্রে ফিরে এসে এইসব গল্পই হচ্ছিল তিনজনে মিলে। বড় কৌচটায় দাদার পাশে বসে ওবেরয়ের কথা শুনছিল বন্দনা। বিকাশ সামনের কৌচে বসেছিল।

ওবেরয় তখন আফ্রিকার সীমান্ত রাজ্য মরোক্কোতে পোস্টেড। চুয়াল্লিশ বছর ফরাসী শাসনে থাকার পর মরোক্কো স্বাধীন হয়েছে। সারা দেশের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারাহয়ে উঠল। মারাক্কেশ স্কোয়ারে সারা দিনরাত্রি হৈ-হুল্লোড় চলত। ওবেরয় ঘুরে ঘুরে সেসব দেখত।

রাবাতে ইণ্ডিয়ান মিশন খোলা হলেও ফুল টাইম অ্যাম্বাসেডর তখনো আসেন নি। ওবেরয় ও আর দু'তিনজন মিলেই সব কাজ করত। ভারত মরোক্কো থেকে কিছু ফসফেট কিনলেও আর বিশেষ কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেন ছিল না দু'দেশের মধ্যে। কমার্শিয়াল কাউন্সিলারের পদও মঞ্জুর করা হয় নি। ওবেরয়কেই এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের টুকটাক খোঁজখবর ঘুরে ফিরে যোগাড় করতে হতো। ঘুরত ক্যাসাব্লাঙ্কা, মারাক্কেশ, ফেজ, তাঞ্জিয়ার।

তরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ঐ ঘোরাঘুরিই হলো ওর কাল।'

বড় বড় হোটেলে যাতায়াত শুরু হলো ঘন ঘন। 'গ্রানাদা'য় 'হোটেল টুর হাসানে', ক খনও 'কন্‌সুলাত'এ। শুরু হলো নাচ-গান খানা-পিনা।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তরুণ বলল, 'মরোক্কার নাইট ক্লাবগুলো সস্তা হয়ে আরো সর্বনাশ হলো।'

বিকাশ ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে, 'সস্তা মানে ?'

জবাব দেয় বন্দনা, 'কেন, তুমি যাবে নাকি ?'

তরুণ শাসন করে, 'আঃ বন্দনা!' তারপর আবার বলে, 'রিয়োল দে আর ভেরা চাপ্‌। দু'ডলার দিলেই বড় বড় নাইট ক্লাবে যাওয়া যায়।'

...দু'বছর পরে সেই ওবেরয় যখন বেইরুটে ট্রান্সফার হলো, তখন সর্বনাশের পথে নামতে আর দেরি হল না। মেডিটারিয়ানের মাতাল হাওয়া ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করে ওর নাম দিল, ইভস্‌ অ্যাম্বাসেডর।

লেবাননের রাজনৈতিক গুরুত্বের চাইতে ওখানকার নাইট ক্লাবের প্রাধান্য বেশী। কিন্তু তবুও বেইরুটে আমাদের একটা বিরাট চান্সেরী আছে। ফরেন সার্ভিসের ক্লাশ ওয়ান অ্যাম্বাসেডর পাঠান হয় এই মধ্য-প্রাচ্যের প্যারিসে! ডজন ডজন ডিপ্লোম্যাট আর শতাধিক কর্মচারী আছেন এই চান্সেরীতে। এছাড়া পূর্ব-পশ্চিম যাতায়াতের পথে বেইরুটে রাত কাটান না, এমন ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট নেইই।

এদের সবাইকে ঠকিয়েছে ওবেরয়। কাউকে দশ-বিশ পাউণ্ড কাউকে আবার সত্তর-আশী-একশ' পাউণ্ড!

কয়েক বছর পরের কথা। ওবেরয় তখন জেনেভায়। বোম্বে থেকে খবর এলো মা'র ক্যান্সার। অতীত দিনের পাপের

প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্ধেক মাইনেটাও পেত না বেচারী। কারুর কাছে হাত পাতারও সাহস ছিল না। প্রয়োজন ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বোম্বে যাবার কথা ভাবতে পারল না।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তরুণ বলল, 'উই হ্যাড লিটল ডিপ্লোম্যাসী উইথ আওয়ার ডিপ্লোম্যাট কলিগ। ওবেরয় কিছু টের পেল না, কিন্তু খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।'

বন্দনার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'আচ্ছা!'

খবরটা শুধু ছড়িয়েই পড়ল না টপ সিক্রেট কনসালটেশন হলো ইউরোপের পাঁচ-সাতটা ইণ্ডিয়ান মিশনের পনের-বিশ জন ডিপ্লোম্যাটের মধ্যে। ঠিক হলো ওবেরয়কে না পাঠিয়ে ওর মাকে জেনেভায় আনান হোক চিকিৎসার জন্য। ডিসিসনের সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকশান! এয়ার ইণ্ডিয়ার লণ্ডন অফিসে পনের-বিশটা চেক পৌঁছে গেল। দিল্লী থেকে বোম্বেতে খবর পৌঁছে গেল ওবেরয়ের একমাত্র বোন ও ভগ্নিপতির কাছে, 'কনটাক্ট এয়ার ইণ্ডিয়া ইমিডিয়েটলি ফর ইওর মাদার্স জার্নি টু জেনেভা ফর ইমিডিয়েট ট্রিটমেণ্ট!'

তরুণ সে সব কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলল। 'ওবেরয় এয়ার ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে মার আসার খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিল।'

বিকাশ জানতে চাইল, 'ভদ্রমহিলা সেরে গেলেন কি?'

'না!'

অতীত দিনের তিক্ততার কথা ফরেন সার্ভিসের কেউ মনে রাখেন না। রাখতে পারেন না। ওটা ওঁদের ধর্ম নয়, কর্ম নয়। অতীত দিনের কথা মনে রাখলে কি ডিপ্লোম্যাসী করা যায়? অসম্ভব।

ওবেরয়কে যারা এমন করে ভালবাসতে পারেন, তাঁরা তরুণের জন্য ভাববেন না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণ বলে, 'এদের মত কিছু মানুষ

না থাকলে হয়ত আমি পাগল হয়ে যেতাম। এই পৃথিবীতে একলা থাকার মত অভিশাপ আর নেই।'

ঘরের পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেল। বিকাশ একবার বন্দনার দিকে তাকাল, বন্দনা বিকাশকে দেখে নিল।

'তুমি একলা কোথায়? আমরা কি তোমার কেউ নই দাদা?' বন্দনা যেন একটু আহত মন নিয়ে কথাটা বলল।

ডান হাত দিয়ে বন্দনার মাথাটা টেনে কাঁধের উপর রেখে আদর করতে করতে তরুণ বলল, 'আমি কি তাই বলেছি? তোমাদের চাইতে আপন আমার আর কে আছে?'

বিকাশ তরুণকে ভয় না করলেও বেশ সমীহ করে চলে। আজ যেন একটু সাহস পেল। 'ওকে এত বেশী আদর করবেন না দাদা।'

বন্দনা মাথাটা তুলে ভ্রূ কুঁচকে বিকাশের দিকে তাকাল।

তরুণ জানতে চাইল, 'কেন?'

একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বিকাশ জবাব দেয়, 'আপনি ওকে ভালবাসেন বলে ওর বড় বেশী অহংকার আর আমাকে ভীষণ কথা শোনায়।'

'সে কি বন্দনা? আমার জন্য ওকে কথা শোনাও?'

'না দাদা, ও সব মিথ্যে কথা বলেছে।'

'ইভন্ ইফ দে আর মিথ্যে, আই ডোণ্ট লাইক টু হিয়ার সাচ্ সিরিয়াস অ্যাণ্ড ডামেজিং অ্যালিগেশনস্।'

স্বামীকে আর বেশী অপদস্থ করতে চায় না বন্দনা। 'দাদা, কফি খাবে?'

কফি খেতে ভীষণ ভালবাসে তরুণ। ওর বহুকালের স্বপ্ন ডিনারের পর এক কাপ ঘন ব্ল্যাক কফি নিয়ে গল্প করবে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, বন্দনা-বিকাশের সঙ্গে।

'কফি? হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া!'

বন্দনা বিকাশকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে?'

হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বিকাশ বলল, 'না না, একটা বেজে গেছে, আমি আর খাব না।'

তরুণ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'সত্যিই তো অনেক রাত হয়ে গেছে। থাক থাক বন্দনা, আর কফি করতে হবে না। তোমরা বরং শুতে যাও।'

বন্দনা বলে, 'আমি এখন শুচ্ছি না।'

'যাও বিকাশ তুমি শুয়ে পড়।'

বিকাশ একটু আপত্তি করছিল, কিন্তু বন্দনার কথায় আর দেরি করল না। 'বিয়ের পর এই তো প্রথম ভাইয়ের কাছে এলাম। তুমি যাও তো, আমাদের একটু প্রাইভেট কথাবার্তা বলতে দাও।'

তরুণ আবার শাসন করে, 'আঃ বন্দনা!'

বন্দনা প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে-ঠুলেই বিকাশকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিল।

দু'কাপ ব্ল্যাক কফি শেষ হবার পরও কত কথা হলো দু' ভাইবোনের।

'আচ্ছা দাদা, তুমি রেগুলার চিঠিপত্র দাও না কেন বল তো?'

'চিঠিপত্র লিখতে ভাল লাগে না। তাছাড়া চিঠিপত্র লিখে কি মন ভরে?' তরুণ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমাদের কাছে পেতেই ভাল লাগে।'

ডান হাতের উপর মুখটা রেখে বন্দনা মুগ্ধ হয়ে দাদার কথা শোনে।

'আচ্ছা বন্দনা, আমি যদি লণ্ডনে ট্রান্সফার হই, তাহলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে—তাই না?'

লণ্ডন যাবার কথা শুনেই বন্দনা চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'তুমি লণ্ডনে আসছ?'

'না। তবে গেলে মজা হতো।'

'এসো না দাদা। আমরা একটা বড় ফ্ল্যাট নেব।'

ঘড়ি দেখে তরুণ চমকে উঠল, 'মাই গড! সওয়া তিনটে বাজে।'

'তাই নাকি?' বন্দনার কাছে যেন তেমন রাত হয় নি।'

'যাও, যাও, শীগগির শুতে যাও।'

বন্দনা তরুণের বিছানার বেডকভার তুলে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ঠিক করে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল।

ছোট্ট নাইট ল্যাম্পটা জ্বেলে বিকাশের স্যুটটা ঠিক করে ওয়ার্ডরবে তুলে রাখল। নিজে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাইটি পরে সুইচ অফ করে লেপের তলায় ঢুকে পড়ল।

একটু এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে শুতে গিয়েই বিকাশ জেগে গেল।

'তুমি ঘুমোও নি?' বন্দনা জানতে চাইল।

ঘুমোব না কেন? তুমিই তো ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।'

'উঃ কি মিথ্যে কথা তুমি বলতে পার।'

'মিথ্যে কথা? তুমি রোজ আমার ঘুম ভাঙাও না?'

'কখ্‌খনো না। তুমিই জেগে জেগে গুণ্ডামী করো।'

'ভণ্ডামী নয়, বলো কর্তব্য। মাই সেকরেড্ ডিউটি টু মাই বিলাভেড্ অ্যাণ্ড একসাইটিং ওয়াইফ!'

অন্ধকারের মধ্যেও যেন দু'জনে দু'জনকে দেখতে পেল, দেখতে পেল হাসি হাসি মুখ।

বন্দনা যেন গাম্ভীর্যের সঙ্গেই হুঁশিয়ার করে, 'যতই ফ্লাটারী করো, আজ আর সুবিধে হচ্ছে না।'

'আই অ্যাম নট কমসার্নড্ উইথ মাই সুবিধে, বাট ইওর অসুবিধে।'

'আজ দেখছি তোমার মাথায় ভূত চেপেছে, বাট ফর গডস্ সেক্ ডোণ্ট ডিসটার্ব মী।'

বন্দনা একটু পরেই আবার বলে, 'জান কটা বাজে?'

'ক'টা ?'

'চারটে বেজে গেছে।'

'সো হোয়াট ?'

'কাল সকালে দেরি করে উঠলে দাদার কাছে মুখ দেখান যাবে না। ভাববে…!'

'কিচ্ছু ভাববেন না, বরং জানবেন বেশ সুখেই আছে।…'

সত্যি সত্যি পরদিন সকালে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তরুণ অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেছে। প্যান্ট্রিতে চা-ব্রেকফাস্টের উদ্যোগ আয়োজন করে লিভিং রুমে বসে বসে কয়েকটা পিরিওডিক্যাল উল্টে দেখছে।

ওদিকে ওরা দু'জনে উঠে কেউই আগে বেরুতে চাইছিল না। অনেক ঠেলাঠেলির পর দু'জনেই একসঙ্গে বেরিয়ে এলো।

'কি, ঘুম হলো ?' তরুণ জানতে চাইল।

মুহূর্তের জন্য বন্দনা-বিকাশের সলজ্জ দৃষ্টি-বিনিময় হলো। তারপর বন্দনা বলল, 'এখনও জানতে চাইছ ঘুম হলো কিনা ?'

'কাল তোমরা বেশ টায়ার্ড ছিলে। অত রাত করে শুতে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

বিকাশ কোনমতে বলল, 'অফিস যাবার চাপ না থাকলে ঘুম যেন ভাঙতে চায় না।'

'নিশ্চয়ই ঘুমুবে। খাবে-দাবে ঘুমুবে বৈকি! কদিন রিল্যাক্স করে নাও।'

'দাদা, তুমি চা খেয়েছ ?'

'রোজই তো একলা খাই। তোমরা আসার পরও একলা একলা খাব ?'

বন্দনা চটপট চা-টা নিয়ে এলো। চা-টা খেয়ে উঠবার সময় তরুণ বলল, 'বুঝলে বিকাশ, বন্দনা যতদিন আছে ততদিন আমি আর কিছু কাজকর্ম করব না।'

বিকাশ বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই করবেন না।'

'মাছ-মাংস সব কেনা আছে। দেখেছ তো?'

বন্দনা বলে, কালকেই দেখেছি।'

'খুব ভাল করে খাবার-দাবার বানাও। আমি কিন্তু রোজ লাঞ্চ খেতে আসব।' হাসতে হাসতে তরুণ বলে।

বন্দনা হাসতে হাসতে বলে, 'না আসবার কি কথা আছে দাদা?'

তরুণ একবার হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, 'ও। বড্ড দেরি হয়ে গেল।'

বেরুবার আগে তরুণ একবার অফিসে বন্সাল জেনারেলকে টেলিফোন করল, 'স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।'

ট্যাণ্ডন সাহেব জবাব দিলেন, 'কে তোমাকে আসতে বলেছে? বি হ্যাপি উইথ ইওর সিস্টার অ্যাণ্ড বিকাশ।'

'থ্যাংক ইউ ভেরী ম্যাচ্ স্যার! আই অ্যাম কামিং উইদিন হাফ্ অ্যান আওয়ার।'

ট্যাণ্ডন সাহেব আর তরুণের সঙ্গে কথা বলতে চান না। 'একবার বন্দনাকে দাও তো।"

'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং। কেমন আছ বন্দনা?'

'খুব ভাল।'

'কাল রাত্তিরে খুব জমেছিল তো?'

'হ্যাঁ, তা বেশ জমেছিল।'

'তোমার দাদাকে অফিসে আনতে দিচ্ছ কেন?'

'অফিসে না গেলেও চলবে?'

'একশ'বার।'

বন্দনা টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেখল দাদা হাসছে।

'তোমাকে অফিস যেতে হবে না।'

'তাই কি হয়? ট্যাণ্ডন সাহেব অমনি বলেন।'

কিছুক্ষণ ধরে ভাইবোনে অনুরোধ-উপরোধের পালা চলল। শেষে সমস্যার সমাধান করল বিকাশ।

'ঠিক আছে ; চল আমরাও দাদার সঙ্গে অফিস যাই। কিছুক্ষণ থেকে সবাই আবার একসঙ্গে চলে আসব।'

বন্দনা দুটো হাতে তালি বাজিয়ে বলল, 'দি আইডিয়া!'

। আঠারো ।

দুঃখের দিনগুলো কাটতে চায় না কিন্তু সুখের দিনগুলো কেমন যেন ঝড়ের বেগে উড়ে যায়। বন্দনা-বিকাশকে নিয়ে তরুণের দিনগুলিও অমনি উড়ে গেল। দেখতে দেখতে বিকাশের ছুটি ফুরিয়ে এলো।

কটি দিন কত কি করল! কত কি দেখল! রবিবার সকালেই বিকাশ চলে যাবে। শনিবার সন্ধ্যায় তরুণ ওদের নিয়ে মার্কেটিংএ বেরুল।

'তোমরা তো লণ্ডনে হাস্ পাপীর জুতো পরে হৈ হৈ কর। এদের হাতে তৈরী জুতো জোড়া নিয়ে পরে দেখ কি চমৎকার।'

বিকাশ বলল, 'আমার তিন-চার জোড়া ভাল জুতো আছে। আবার জুতোর কি দরকার।

তরুণ সেকথা কানেও তুললো না। এবার ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট একটা গলির মধ্যে এক এজেন্সি হাউসে হাজির হলো।

'হাউ আর ইউ মিঃ নোয়েল?'

'ফাইন, থ্যাংক ইউ স্যার।'

'এই হচ্ছে আমার বোন ব্রাদার-ইন-ল। ওদের জিনিসটা রেডি আছে তো?'

বিকাশ-বন্দনা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

নোয়েল সাহেব বললেন, 'আপনার জিনিস রেডি রাখব না?'

এক মিমিটের মধ্যে ভিতর থেকে ঘুরে এসেই টেবিলের ওপর ব্রাউনের টুরিস্ট মডেল একটা টি-ভি সেট খুলে দেখালেন।

বন্দনা বলল, 'একি দাদা! টি-ভি সেট কিনছ কেন?'

'চুপ করে থাক।'

এবার বিকাশ বলে, 'একি করছেন দাদা?'

আর একি করছেন! মাস কয়েক আগে সেটটা দেখেই ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। তারপর ওদের আসার খবর পাবার পরই নোয়েলকে দাম-টাম মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

তরুণের সঙ্গে তর্ক করার সাহস ওদের কারুরই নেই। তবুও বার বার আপত্তি করেছিল।

শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে তরুণ বলেছিল, 'জীবনে কাউকেই তো কিছু দেবার সৌভাগ্য হলো না। লোকেরা বাবা-মা ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্রকে কত কি দেয়! তোমরা না হয় আমাকে সেই সৌভাগটুকু উপভোগের প্রথম সুযোগ দাও।'

বন্দনা-বিকাশেব মুখ দিয়ে আর একটি কথা বেরোয় নি।

কিছুক্ষণ পরে তরুণ আবার বলল, 'দাদার কাছে ছোট ভাইবোনেরা কত কি আবদার করে। কই, তোমরা তো আমার কাছে কিছুই আবদার করলে না?'

এই দুনিয়ায় স্নেহ, ভালবাসা পাবার সৌভাগ্য চাই। কিন্তু সেই স্নেহ-ভালবাসা অপরকে না দিতে পারার মত দুর্ভাগ্য নেই। মানুষকে ভালবেসেই মানুষের স্বার্থকতা, পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি। তরুণের জীবনে সেই পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি এলো না। একথা বন্দনা-বিকাশ জানত কিন্তু সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকল। খানিকক্ষণ পরে বন্দনা বলল,

'এই একমাস আমি এমন জ্বালাতন করব যে তোমার আর দুঃখ থাকবে না দাদা।'

বিষণ্ণ তরুণের মুখে শুকনো হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'শুধু এই একমাস তো জ্বালাতন করবে, তারপর তো নয়।'

পরের দিন বিকাশকে 'সী-অফ' করতে গিয়ে তরুণের মনটা আবার খাবাপ হয়ে গেল। 'বন্দনা, তুমিও চলে গেলে পারতে। ও বেচারীর একলা থাকতে ভীষণ কষ্ট হবে।'

'তোমাকে একলা ফেলে গেলে তোমার বুঝি কষ্ট হবে না?'

বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না দাদা, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না। তাছাড়া বন্দনাও তো কত দিন ধরে একঘেয়ে জীবন কাটাচ্ছিল।'

বিকাশ চলে গেল। বন্দনাকে নিয়ে তরুণ ফিরে গেল হান্সা কোয়ার্টারের অ্যাপার্টমেণ্টে।

একটা অ্যালুমিনিয়াম ডেক-চেয়ার নিয়ে তরুণ দক্ষিণের বারান্দায় বসল। বন্দনা চলে গেল ভিতরে।

কিছুক্ষণ পরে দু'হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে বন্দনা এলো বারান্দায়।

হাসতে হাসতে তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি, কফি?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর একটা বসবার কিছু আনি।'

'তুমি ধর। আমি আনছি।'

'না না, আমিই আনছি।'

তরুণ চট করে ভিতর থেকে একটা ইজিপসিয়ান মোড়া আনল।

কফির কাপে চুমুক দিয়েই বন্দনা বলল, 'একটা মাস বেশ মজায় কাটান যাবে, তাই না দাদা?'

'হ্যাঁ, তা বেশ কাটবে,' খুশীভরা হাসি হাসি মুখে তরুণ জবাব দেয়।

'জান দাদা, আমার ভাগ্যটা যে এমন করে পাল্টে যাবে তা কোনদিন ভাবিনি।'

আত্মস্মৃতির সবগুলি অধ্যায় মনে মনে পর্যালোচনা করো বন্দনা যেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

'এর মধ্যে আবার ভাগ্য পাল্টাল কোথায়?'

ভ্রূ দুটো তুলে চোখ ঘুরিয়ে বন্দনা বলে, 'ভাগ্য না হলে তোমার মত দাদা পাই? হান্সা কোয়ার্টারে থাকতে...'

তরুণ আর হাসি চাপতে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, 'একটা আস্ত পাগলী না হলে কেউ একথা বলে?'

হঠাৎ ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

তরুণ উঠতে গেলেই বন্দনা বলল, 'তুমি বসো, আমি দেখছি।'

বন্দনা দরজা খুলেই আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'আপ আ গিয়া! আইয়ে আইয়ে!'

তাড়াতাড়ি তরুণ উঠে গিয়ে দেখল ট্যাণ্ডন সাহেব এসেছেন।

ট্যাণ্ডন সাহেব মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'আই ওয়ানটেড টু চেক আপ দুই ভাই-বোনে কেমন মজা করছ?'

বন্দনা মজা করে বলে, 'এই তো সবে এক কাপ কফি নিয়ে শুরু করেছি। কদিন অপেক্ষা করুন, তারপর দেখবেন।'

ট্যাণ্ডন সাহেব বন্দনার কাঁধে হাত দিয়ে একটু কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'এই বুড়ো দাদাকেও একটু শেয়ার-টেয়ার দিও।'

তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। এবার বলে, 'আগে তো বসুন তারপর ভাগাভাগি করা যাবে।'

তরুণ আর ট্যাণ্ডন সাহেব লিভিং রুমের কোণার কৌচে বসলেন। পাকা গিন্নীর মত বন্দনা জানতে চাইল, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ? টি অর কফি?'

'শুধু টি অর কফি? আর কিছু খাওয়াবে না?'

'আপনার মত সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটের তো অধৈর্য হওয়া চলে না। ইউ মুড ওয়েট অ্যাণ্ড সী।'

বন্দনার শাসন করার কায়দা দেখে দু'জনেই হাসলেন।

ট্যাণ্ডন সাহেব কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'খোদা হাফিজ! এ তো দারুণ মেয়ে!' এবার তরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সী স্থড হ্যাভ বিন ইন ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস।'

'ইউ গো অন পণ্ডারিং, আমি যাচ্ছি।'

কর্ডিগানের হাত গোটাতে গোটাতে বন্দনা পা বাড়াল প্যান্ট্রির দিকে। ট্যাণ্ডন সাহেব প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'তরুণ, আউটস্ট্যাণ্ডিং ডিপ্লোম্যাটদের মত সী ক্যান ইগনোর টু!'

তরুণ কিছুই জবাব দেয় না কিন্তু মনে মনে যেন বন্দনার জন্য গর্ব অনুভব করে।

ট্যাণ্ডন সাহেব এবার বলেন, 'ভারী চমৎকার মেয়ে! দেখলেই যেন আদর করতে ইচ্ছা করে।'

'সত্যি, বন্দনা খুব ভাল মেয়ে।'

'তুমি খুব লাকী।'

'অ্যাজ ফার অ্যাজ বন্দনা'জ কনসার্নড্, আমি নিশ্চয়ই লাকী।'

ট্যাণ্ডন সাহেব হঠাৎ একটু হাসলেন, 'অ্যাণ্ড সী ইজ ভেরী প্রাউড অফ ইউ।'

'তাই নাকি?' হাসতে হাসতে তরুণ পাল্টা প্রশ্ন করে।

কিছুক্ষণ পরে বন্দনা ট্রলি-ট্রে নিয়ে হাজির হলো। প্লেট ভর্তি পাকোড়া আর কফি ছাড়াও আরও কি কি যেন।

ট্যাণ্ডন সাহেব ঠাট্টা করে বললেন, 'এত বেলায় পাকোড়া-কফি? ভেবেছিলাম লাঞ্চ খাওয়াবে।'

'আজকে আমাদের একটু স্পেশ্যাল খাওয়া-দাওয়া আছে। সো ইউ মাস্ট এক্সকিউজ।'

বন্দনার কথা শুনে তিনজনেই হাসল।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। এর আগে মহাশূন্যতার মধ্যে তরুণ ভেসে বেড়াত। আজকাল ? সব শূন্যতা যেন পূর্ণ করেছে বন্দনা। একটি মুহূর্তের জন্যও তরুণ নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করতে পারে না।

তরুণের মুখটা তুলে ধরে বলল, 'তুমি চুপটি করে কি ভাবছ দাদা ? আমি রান্না করছি, চলো না, তুমি ওখানে গিয়ে বসবে।'

তরুণ আর চুপটি করে একলা বসতে পারে না। বন্দনা রান্না করে আর ও পাশে ইজিপসিয়ান মোড়াটা নিয়ে বসে বসে গল্প করে।

'আচ্ছা দাদা, তুমি রান্নাঘরে গিয়ে মাসিমার সঙ্গে গল্প করতে ?'

'খুব ছোটবেলায় মা'র পাশে পাশেই কাটাতাম কিন্তু বড় হবার পর আর সে সুযোগ পেতাম না।'

'কেন ?'

ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণ হাসল। পুরনো দিনের কথা মনে হতেই কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

উদাস ফ্যাকাশে দৃষ্টিটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে তরুণ বলল, 'পরের দিকে ইন্দ্রাণী না হলে মা'র এক মুহূর্তও চলত না। ইন্দ্রাণীকে কাছে পেলেই মার ফিস ফিস শুরু হয়ে যেতো।'

'মাসিমা ওকে ভীষণ ভালবাসতেন।' আপন মনেই বন্দনা বলল।

কথা বলতে বলতেই মাছ ভাজা হয়ে গেল। একটা মাছ ভাজা প্লেটে তুলে তরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও দাদা।'

'সে কি ? এখন মাছ খাব কেন ?'

'আমি দিচ্ছি, খেয়ে নাও না।'

আরো এগিয়ে চলে। তরুণ ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রার দুটো টিকিট কিনে এনেছে। বন্দনাকে বলেছে একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরে যেতে। ভিতরের ঘরে সাজগোজ করছে সে। তরুণ সিগারেট খেতে খেতে পায়চারী করছে।

'দাদা, একটু এদিকে আসবে ?'

'কি হলো ?'

'একটু এসো।'

ও-ঘরে গিয়ে বন্দনাকে দেখেই তরুণ বলল, 'বাপরে বাপ! বার্লিনার্সরা ভাববে ইণ্ডিয়ান কুইন এসেছে।'

'আমি কুইন না হতে পারি বাট সিস্টার অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট।'

ঠোঁটটা উল্টে তরুণ বলে, 'এই গহনা-টহনা কাপড়-চোপড় দেখে কি বিশ্বাস করবে?'

বন্দনাকে দেখতে ভালই। চোখ-মুখ বেশ শার্প। নাকটা যেন একটু চাপা। তবে তা নজরে পড়ে না। চেহারার গড়নটাও বেশ ভাল। লণ্ডনের একদল ইণ্ডিয়ান ছোকরা যে বন্দনার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য টি বোর্ডের দোকানে আড্ডা জমাত, সেজন্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। আজ আবার একটা কালো বেনারসী পরেছে। আই-ল্যাশ দিয়ে চোখ দুটোকে আরো সুন্দর করেছে। পেণ্ট করে নি বটে তবে একটু বিউটি ট্রিটমেণ্ট করায় সুন্দর মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

'দাদা, এই দুলটা পরিয়ে দাও তো।' দুল দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এমন বিশ্রী ডিজাইন যে পরাই একটা ঝামেলা।'

'এই মাটি করেছে। আমি কি পারব?'

পারব না বললে কি বন্দনা ছাড়ে!

বন্দনাকে কাছে পেয়ে নতুন করে বাঁচবার আশা পায় তরুণ। আনন্দ পায়, উৎসাহ পায়। জীবনযাত্রার ধরনটাও পাল্টে গেল। কফি আর স্যাণ্ডউইচ খেয়েই দিন কাটে না। প্রতিদিন কত কি রান্না করে বন্দনা।

'এত কি খাওয়া যায়?'

'তুমি বড্ড বেশী তর্ক কর, দাদা। অন্তত খাওয়া-দাওয়ার ভারটা আমাকে ছেড়ে দাও।'

তরুণ আর তর্ক করে না। হার স্বীকার করেও যেন জিতে যায়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে গল্প করত কত রাত পর্যন্ত। ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে কত কথা হতো।

'চল, এবার তুমি শুতে চল।'

তরুণ বুঝত এ অনুরোধ নয়, অর্ডার। 'এই তো যাচ্ছি।'

'আর এই তো যাচ্ছি নয়, এবার ওঠ।'

তরুণ উঠে পড়ে। বন্দনা আগেই বিছানাপত্র ঠিক করে রেখেছে। তরুণ শুতে না শুতেই বন্দনা ব্ল্যাঙ্কেট ঠিক করে দেয়!

'আমি কি বাচ্চা? কম্বল-টম্বলও গায় দিতে পারি না?'

'এত আদরে মানুষ হয়েছ যে এসব শেখার সুযোগ পেলে কোথায়?'

বন্দনা ভোরবেলায় উঠে পড়ে। একবার উঁকি দিয়ে তরুণকে দেখে নেয়। হয়ত কম্বলটা একটু টেনে দেয়। মুহূর্তের জন্য একটু যা ভাল করে দেখে নেয়।

দুঃখে-কষ্টে মানুষ হয়েছে বন্দনা। ঝড়-বৃষ্টি বড় বেশী সহ্য করতে হয়েছে। তরুণের স্নেহচ্ছায়ায় এসেই প্রথম একটু পরিস্কার আকাশ দেখার সুযোগ পেয়েছে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই এই মুখখানা দেখে যেন সে অনুপ্রেরণা পায়, আনন্দ পায়। দাদার ওপর আধিপত্য করে আত্মতৃপ্তিও পায় মনে মনে।

সুখের দিনগুলো আবার ঝড়ের বেগে উড়ে যায়। বন্দনার বার্লিন বাসের পালা প্রায় শেষ হয়ে আসে।

'সব অভ্যেসগুলো তো নষ্ট হয়ে গেছে। এবার যে কিভাবে একলা থাকব আর স্যাণ্ডউইচ খাব, তাই ভাবছি।'

সেইদিন দুপুরেই বন্দনা বিকাশকে লিখল, 'দাদাকে ছেড়ে যেতে মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। তুমি যদি রাগ না কর তাহলে আরো সপ্তাহ দুই থাকতাম।'

বিকাশের উত্তর আসতে দেরি হলো না। 'তুমি নিশ্চয়ই আরো কিছুদিন থাকবে। দাদাকে দেখলে কি আমি রাগ করতে

পারি ? ভুলে যেও না ওঁর চাইতে আমাদের আপন আর কেউ নেই।'

পরের দিন সকালে অফিস বেরুবার সময় তরুণ বলল, 'আজ তোমার টিকিট কাটতে দেব।'

'না না, দাদা। আমাব টিকিট কাটতে হবে না। তোমাকে আর একটু জ্বালাতন করি।'

'সে কি ? বিকাশ আর কতদিন হাত পুড়িয়ে খাবে ?'

'ওই আমাকে থাকতে বলেছে।'

একটু শুকনো হাসি হাসল তরুণ। 'আমার সঙ্গে তোমরা এত জড়িয়ে পড়ো না। তাহলে আমার পাপে তোমাদেরও দুঃখ পেতে হবে।

'সে সব তোমার ভাবতে হবে না।'

। উনিশ ।

বন্দনা চলে গেল। নিয়ে গেল কিছু অনুভূতি, রেখে গেল কিছু স্মৃতি।

বিন্দুতে যেমন সিন্ধু হয়, তেমন প্রতিটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে জন্ম নিয়েছিল কিছু অনুভূতি। সে অনুভূতি এর আগে কোনদিন বোঝেনি। আর রেখে গেল যে টুকরো টুকরো স্মৃতি তা তরুণের জীবনের অনন্য সম্পদ। এত বড় দুনিয়াটায় এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এমন আপন করে আর কাউকে কাছে পায় নি। ভালবাসা পেয়েছে, সমবেদনা পেয়েছে বহুজনের কাছে। বন্দনা ইন্দ্রাণীর অভাব মেটাতে পারে নি, পারবে না, পারতে পারে না। তবুও সে যা দিয়ে গেল, তা তরুণ আর কোথাও আশা করতে পারে না।

বন্দনা ছাড়া আর কে এত আপন-জ্ঞানে বলতে পারে, 'দাদা, তুমি আমার শাড়ির নিচের কুঁচিগুলো চেপে ধরো তো; আমি কাপড়টা ঠিক করে পরে নিই।'

কোন কোনদিন পার্টিতে যাবার সময় বিচিত্র হেয়ার-ডু করে দু'হাত দিয়ে খোঁপাটা চেপে ধরে ডাকত, 'দাদা, একটু এ ঘরে এসো।'

'কেন, কি হলো?'

তরুণ ঘরে এলে বলত, 'ঐ সামনের কাঁটাগুলো দিয়ে দাও তো।'

কাঁটাগুলো খোঁপায় গুঁজে দিতে দিতে তরুণ বলত, 'কি দরকার এত সব কায়দা-টায়দা করার?'

'জীবনে কোনদিন ঠিক আনন্দ করার অবকাশ পেলাম না তো, তাই তোমার এখানে এসেও লাইফটাকে এন্‌জয় করব না?'

কে এমন স্পষ্টভাবে দাবি জানাতে পারে?

বন্দনা সত্যি অনন্যা!

বন্দনাকে বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে বড় বিশ্রী লাগছিল। চুপচাপ কৌচটায় বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের কয়েকটা দিন আরো খারাপ লাগল। নিঃসঙ্গতার জ্বালাটা বড় বেশী অনুভব করল।

অফিসে যাতায়াত করে, কিন্তু কাজকর্মে মন দিতে পারে না। ট্যাণ্ডন সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। জীবনটা যেন আরো বিবর্ণ হয়ে গেল। দিল্লী, লণ্ডন, নিউইয়র্কে তবু সময় কেটে যায়, কিন্তু বার্লিনে যেন সময় কাটতে চায় না। একদিন কথায় কথায় ট্যাণ্ডন সাহেবকে বলেই ফেলল, 'আর এখানে ভাল লাগছে না। ভাবছি এবার ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করি।'

'যেখানে ট্রান্সফার হবে, সেখানে গিয়ে ভাল লাগবে?'

তরুণ আর জবাব দিতে পারে নি।

মিঃ ট্যাণ্ডনই আবার বললেন, 'তুমি ট্রান্সফার চাইলে নিশ্চয়ই মিনিস্ট্রি আপত্তি করবে না, তবে তাতে তোমার কি লাভ? বরং ওয়েট ফর সাম টাইম।'

কাজকর্মের চাপ না থাকায় তরুণের আরো খারাপ লাগছিল। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, মস্কো, পিকিং-এ ডিপ্লোম্যাটদের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা থাকে, বার্লিনে তাও নেই। কি নিয়ে থাকবে তরুণ?

মাস খানেক পরে দু'তিনজন জেনারেল অ্যাসিসট্যাণ্ট কাম স্টেনো টাইপিস্টের ইণ্টারভিউ নিচ্ছিল তরুণ। পাঁচ-ছ'টি মেয়ে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিল।

মিস হেরম্যানের ইণ্টারভিউ নেবার সময় তরুণ জানতে চাইল, 'এর আগে কোথাও কাজ করেছেন?'

'কয়েক মাস আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছি। ঠিক চাকরি করিনি কোথাও।'

'তবে কি করেছেন?'

'এল-বি'র পাড়ে নর্থ ল্যাণ্ড স্যানাটোরিয়ামে একজন পাকিস্তানী অফিসারের কাছে মাঝে মাঝে কাজ করেছি।'

তরুণ ন্যাকামী করে প্রশ্ন করল, 'ইজ হি এ বিজিনেসম্যান?'

'না, না, বিজিনেসম্যান না। পারহ্যাপস হি ইজ অ্যান আর্মি অফিসার।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'উনি যে কেবল রাওলপিণ্ডি আর পেশোয়ারে আর্মি অফিসার-দেরই চিঠি লেখেন।'

তরুণ আর এগোয় নি। বুঝেছিল, অফিসারটি অসুস্থ নয়; কারণ চিকিৎসার জন্য স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হলে নিশ্চয়ই এত চিঠিপত্র লেখালেখি বা কাজকর্ম করতেন না। ওটা নিশ্চয়ই একটা কভার। গোপনে কাজ করার কায়দা মাত্র।

মিস হেরম্যানের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার টাইপ হবার আগেই

বন-এর ইণ্ডিয়ান এম্বাসীতে মেসেজ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন থেকে দিল্লী ; দিল্লী থেকে করাচি।

দিন তুয়েকের মধ্যেই বার্লিনে খবর এসে গেল।...কয়েকদিন আগে করাচিতে পাকিস্তান-কানাডার চুক্তি হলো যে তু'বছর অন্তর তু'দেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির ডেলিগেশন এক্সচেঞ্জ হবে। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির যে অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারী এই ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তিনি এবার এ স্বাক্ষর করেন নি। শোনা যাচ্ছে উনি অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য জেনেভা গেছেন।

পাকিস্তান অবজার্ভার, ডন, পাকিস্তান টাইমস ও আরো বহু পত্রিকায় নানা চুক্তি সই করার পর ঐ অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারীর ছবি ছাপা হতো। খবরের সঙ্গে এইসব ছবির কয়েকটা কপিও দিল্লী থেকে বার্লিনে পাঠানো হলো।

একটু কায়দা করে মিস হেরম্যানকে ছবিগুলি দেখাতেই সে বলে উঠল, 'এই ভদ্রলোকের কাছেই সে কাজ করেছে।'

ইতিমধ্যে রোমের একটি পত্রিকায় খবর বেরুল, ইতালী পুরানো ন্যাটো আর্মস বিক্রীর জন্য মিডল ইস্ট ও ফার ইস্টের কয়েকটি দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও পর্তুগালের কয়েকটি পত্রিকায় অনুরূপ খবর বেরুল।

ঠিক এই পটভূমিকায় পাকিস্তান ডিফেন্স মিনিস্ট্রির অ্যাডিশ্যনাল সেক্রেটারীর বার্লিন উপস্থিতির তাৎপর্য বুঝতে ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের কষ্ট হলো না। দিল্লী আরো তৎপর হলো।

মেসেজ চলে গেল চারদিকে। ওয়াশিংটন, লণ্ডন, বন, রোম, প্যারিস ও আরো কয়েকটি 'ন্যাটো' কান্ট্রিতে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ঐ সব দেশের ফরেন মিনিস্ট্রির সঙ্গে। কোন কোন দেশ ন্যাকামী করে বলল, 'উই হ্যাড নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট সেল অফ ন্যাটো আর্মস।'

ওয়াশিংটন থেকে বলা হলো, 'ন্যাটো আর্মস নিয়মিত আধুনিকীকরণ করা হয়। ইট ইজ এ রেগুলার প্রসেস। বাট ঐ আর্মস অন্য দেশে বিক্রী করতে হলে আমাদের পারমিশন চাই। সুতরাং ডোণ্ট ওরি!'

ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডরকে তাঁরা একথাও বললেন, 'উই উইল থিংক টোয়াইস বিফোর উই অথোরাইজ এনি সাচ সেল টু পাকিস্তান।'

সব শেষে করাচি। ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনার পাকিস্তান ফরেন সেক্রেটারীকে বললেন, 'আপনারা আর্মস নিলে আমাদের দুই দেশের রিলেসান্স অ্যাফেক্ট করতে বাধ্য।'

পাকিস্তান ফরেন সেক্রেটারী বললেন, 'আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ পজিশন খুব খারাপ। কোরিয়ার যুদ্ধ থেমে যাবার পর আমাদের পাটের বাজারও খুব খারাপ। ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাবে আমরা প্রয়োজনীয় ফুড গ্রেনস্ ও ইণ্ডাস্ট্রির জরুরী ইম্‌পোর্টস পর্যন্ত করতে পারছি না! সুতরাং ন্যাটো আর্মস কিনব আমরা? ইট উড বি এ বিবিলক্যাল ড্রিম ফর আস!'

ফরেন সেক্রেটারী ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টা করে বললেন, 'অনেক কষ্টে দু' দেশে রিলেসান্স একটু ইমপ্রুভ করেছে। এখন আর কিছু না হোক আমি আমার লক্ষ্ণৌর পুরানো বাড়ীতে যেতে পারি, বুড়ি নানীর সঙ্গে দেখা করতে পারি, শালীর একটু ওয়ার্ম কম্পানী পেতে পারি। ডু ইউ থিংক আমরা এমন কাজ করব যাতে এই সম্পর্কটাও নষ্ট হয়ে যায়।'

'আমরাও তো তা আশা করি না!'

ফরেন সেক্রেটারী শেষে বললেন, 'ভুলে যাবেন না উই আর সেয়ারিং সেম হিউম্যান মিজারিজ! ঐ যে ইন্দ্রাণীর কেসটা আপনারা রেফার করেছেন...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...'

'ভাবুন তো কি ট্র্যাজেডি!...আই অ্যাম প্যার্সোন্যালি লুকিং

ইনটু দ্য ম্যাটার এবং আশা করি ছ' এক মাসের মধ্যেই মেয়েটিকে খুঁজে বার করা যাবে।'

'উই উইল বী গ্রেটফুল···'

'গ্রেটফুল হবার দরকার নেই। তবে দেখবেন যেন ওদের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে পারি।'

হাসতে হাসতে হাই-কমিশনার বললেন, 'আমি নিজে এসে আপনাকে নেমন্তন্ন করে যাব।'

মাসখানেক তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কাটবার পর দিল্লী থেকে পাকিস্তানী ফরেন সেক্রেটারীর মন্তব্যের রিপোর্ট পেয়ে দীর্ঘদিনের ক্লান্তি এক মুহূর্তে বিদায় নিল। অনেক দিন পর আবার ইন্দ্রাণীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করল তরুণ।

দিন তিন-চার পরেই মিঃ ট্যাণ্ডন তরুণকে ডেকে পাঠালেন।

'বসো তরুণ।'

'কি ব্যাপার।'

'দেয়ার ইজ এ গুড পিস অফ নিউজ ফর ইউ।'

চমকে উঠল তরুণ। তবে কি ইন্দ্রাণীর কোন খবর পাওয়া গেছে ? তরুণ মুখে কিছু বলল না, উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল ট্যাণ্ডন সাহেবের মুখের দিকে।

'প্রথম কথা, তুমি প্রমোশন পাচ্ছ···'

তরুণ শুধু একটু হাসল।

'দ্বিতীয় কথা, তোমার ট্রান্সফার হচ্ছে।'

'কোথায় ?'

'বোধ হয় লণ্ডনে।'

তরুণ হেসে ফেলল। 'লণ্ডনে ?'

'মনে হয় তাই।'

তারপর ধীরে ধীরে মিঃ ট্যাণ্ডন জানালেন, 'ন্যাটো আর্মস সেল

নিয়ে যা হয়ে গেল, তার জন্য মিনিস্ট্রি মনে করে তোমাকে আর বার্লিনে রাখা ঠিক নয়।'

'সেটা আমিও ফিল করছিলাম।'

'অ্যাম্বাসেডর যা বললেন তাতে মনে হয় তোমাকে ফার্স্ট সেক্রেটারী, পলিটিক্যাল করে লণ্ডনেই পাঠান হবে। তবে…'

'তবে কি?'

'হয়ত ইন-বিটুইন ছ'এক মাসের জন্য দিল্লীতে যেতে হতে পারে।'

শালগ্রাম শিলার আর শোওয়া-বসা? স্ত্রীর অমত, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সমস্যা যখন নেই, তখন লণ্ডন আর দিল্লী। সবই সমান।

প্রমোশন? কৃতিত্বে, উন্নতিতে আর পাঁচজন খুশী হয় বলেই আনন্দ। কিন্তু তরুণ কাকে খুশী করবে? হ্যাঁ, বন্দনা-বিকাশ নিশ্চয়ই খুশী হবে, কিন্তু…

ঐ কিন্তুটা তরুণের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; ওর থেকে মুক্তি নেই।

ছ' একদিন পরেই ঢাকা থেকে দেশাই-এর একটা চিঠি পেল, ঠিক বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করার জন্য হঠাৎ অত্যন্ত বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। মনে হয় করাচি থেকে চাপ এসেছে।

ঐ চিঠিটা ঐখানেই শেষ। তবে সঙ্গে আরেকটা স্লিপ। তাতে লিখেছে, 'আজ অফিসে এসেই খবর পেলাম যে রায়টে ইন্দ্রাণীর বাবা-মা মারা যান। আগে বাড়ীতে যখন আগুন লেগেছিল তখন চাপা পড়ে ছোট ভাই মারা যায়। এর পর ইন্দ্রাণীকে স্থানীয় এক মুসলমান পরিবার আশ্রয় দেন।'

দেশাই শেষে লিখেছে, 'ইস্ট পাকিস্তানের ডি-আই-জি (সি আই-ডি) নিজে কেসটা ডিল করছেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই আরো খবর জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

চিঠিটা বার বার পড়ল। দশবার-বিশবার পড়ল। একটা চাপা

উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ল তরুণ। চিঠিটা নিয়ে প্রায় দৌড়ে গেল মিঃ ট্যাণ্ডনের ঘরে।

ট্যাণ্ডন সাহেবও চিঠিটা বার কয়েক পড়লেন। হেসে বললেন, 'সত্যি সুখবর।'

একটু পরে বললেন, 'পাকিস্তান ওদের অনেস্ট ইন্‌টেনশন প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

নিজের ঘরে ফিরে এসেই তরুণ দেশাইকে কেবল্‌ পাঠাল, 'থ্যাঙ্কস্‌ ইওর কাইণ্ড লেটার স্টপ অ্যাংসাস্‌লি এক্‌সপেক্‌টিং ফারদার ডেভলপমেণ্টস স্টপ লাভ টরুণ।'

আশা-নিরাশার দোলায় তরুণ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। দেশটা দু' টুকরো হবার পর পূর্ব বাংলার বহু হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমানদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে নানা কাবণে। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়। তাদের কেউ সুখী, কেউ অসুখী।

এমন অনেক মেয়ের কথা তরুণ জানে। শাঁখা-সিঁদুর পরেও অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান স্বামীর ঘর করছে, তাও সে জানে।

দিল্লীতে থাকতে এমন অনেক কেস সে নিজে ডিল করেছে। নাটক-নভেলকে হার মানাবে সে-সব কাহিনী। গুণ্ডা-দস্যুদের হাত থেকে হিন্দু মেয়েদের বাঁচাবার জন্য সারা পূর্ব বাংলার বহু মুসলমান পরিবার তাদের ঠাঁই দিয়েছেন নিজেদের পরিবারে। অনেক প্রগতিশীল যুবক হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তকরণ না করিয়েই বিয়ে করেছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দপ্তরে গিয়ে।

বাঙালীর জীবনের সেই ঘন দুর্যোগের রাত্রিতে আরো কত কি হয়েছে! কেউ কেউটে সাপের মত ছোবল দিয়েছে, আবার কেউ পশুরাজ সিংহের মত ঔদার্য দেখিয়ে হাতের কাছের শিকার ছেড়ে দিয়েছে।

ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে এমনি কোন বিপর্যয় ঘটে নি তো?

ভাবতে পারে না তরুণ।

। কুড়ি ।

প্রতি মানুষের জীবনেই কিছু কিছু চরম মুহূর্ত আসে, যখন প্রতিটি মুহূর্তের অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, গুরুত্ব আছে। সর্বস্তরের সব মানুষের জীবনেই এমন মুহূর্ত আসে।

তরুণের জীবনে আজ আবার তেমনি চরম মুহূর্ত হাজির।

এমন মুহূর্ত এর আগেও এসেছে। পরীক্ষার হলে কোশ্চেন পেপার পাবার আগে, রেজাল্ট বেরুবার দিন, ফরেন সার্ভিসের ইন্টারভিউ দেবার সময় হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন শুনতে পেয়েছে। কেন? ঢাকার সেই শেষ দিনগুলোতে? কিন্তু আজ যেন সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চের রায় বেরুবার জন্য অপেক্ষা করছে। এর পর যেন আর কোন গতি নেই।

দেশাই-এর চিঠি পাবার পর দিনই দিল্লী থেকে একটা মেসেজ পেল তরুণ। দেশাই যে খবর দিয়েছিল, সেই খবরই পাক পররাষ্ট্র দপ্তর দিল্লীতে পাঠিয়েছে এবং তরুণ তারই কপি পেল।

সময় যেন কাটে না, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন আরো জোরে শুনতে পায়। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। চব্বিশ ঘণ্টা কত কি ভাবে। কত আজেবাজে চিন্তা আসে মনে। বহু মেয়েকে প্রথমে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়ে পরে পাচার করা হয়েছে লাহোরের আনারকলি বাজারের পিছনের সরু গলিতে। সেখানে তাদের নাচ শেখান হয়েছে, গান শেখান হয়েছে, শেখান হয়েছে বেলুচিস্থানের প্রাণহীন মরুভুমির হৃদয়হীন মানুষগুলোকে প্রলুব্ধ করতে। ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টে যদি···।

মাথাটা ঘুরে ওঠে তরুণের। সারা শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনগুলো হঠাৎ খুব জোর হয়েই থেমে গেল!

প্রিয়জন সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা দেখা দিলেই যত খারাপ চিন্তা মনে আসে।

মনে আসবে না? সেই সর্বনাশা দিনগুলোতে কি হয় নি? সুস্থ স্বাভাবিক মানুষগুলোও যে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। স্নায়ুগুলো যেন সেতারের তারের মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল বহুজনের মধ্যে। সুপ্ত পশু প্রবৃত্তিগুলোরই তখন রাজত্ব। মানুষগুলো ফিরে গিয়েছিল তার আদিমতম অন্ধকার দিনগুলিতে।

ইন্দ্রাণী কি এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? লাহোর, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডির কোন হারামে তার স্থান হয় নি তো?

হয়ত হয়েছে, হয়ত হয় নি। বাঙালীর জীবনের সেই চরম অন্ধকার রাত্রেও কিছু কিছু মহাপ্রাণ 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে এসেছিলেন অসহায়া শিশুকে আশ্রয় দিতে, বিপদগ্রস্তা যুবতীর সম্মান রক্ষা করতে, নিঃসম্বল নারীকে আশ্রয় দিতে। এগিয়ে এসেছিলেন বহু ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক। পূর্ব বাংলার এই সব মহান, মহাপ্রাণ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে বহু হিন্দু মেয়ে সন্তানের মত স্নেহ পেয়েছে, আপন বোনের মত ভালবাসা পেয়েছে, মায়ের সম্মান পেয়েছে।

ইন্দ্রাণী কি এমনি কো৹৷ পরিবারে একটু আশ্রয় পায়নি?

ঢাকায় কত মুসলমান পরিবারের সঙ্গেই তো ওদের ভাব, ভালবাসা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঈদের দিন কত বাড়িতে ঘুরে ঘুরে মিষ্টি খেয়েছে। অসহায়া ইন্দ্রাণীকে দেখে কি তাঁদের কারুর মন কেঁদে ওঠে নি? কেউ কি ওকে কোলে তুলে নেয় নি? চোখের জল মুছিয়ে দেয় নি?

নিশ্চয়ই দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে তরুণ যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। ঢাকা থেকে একটা চিঠি, করাচি থেকে হাবিবের একটা মেসেজ পাবার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ মনে পড়ল বন্দনার দু' দুটো চিঠি এসে গেছে অথচ উত্তর দেওয়া হয় নি। ইন্দ্রাণীর চিন্তায় আর কাউকে ভাবার অবকাশ পায় নি। বন্দনাকেও না?

না।

অ্যাপার্টমেণ্টে একলা একলা বসে ছিল কিন্তু মনে হল সবাই জেনে গেল বন্দনাকেও সে ভুলতে বসেছে।

ছি, ছি।

নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিল। আর কিছু না হোক, ওর প্রমোশনের খবর, লণ্ডনে বদলী হবার সংবাদটা অতি অবশ্যই বন্দনাকে জানান উচিত ছিল। দেশাই-এর চিঠিটার কথাই বা কেন লিখবে না?

আর দেরি করল না। বন্দনাকে সব লিখল, সব কিছু জানাল। সব শেষে লিখল, 'জানি না কি লিখলাম, কি জানালাম। মনের যা অবস্থা। দাদা হয়ে ছোট বোনকে এসব লেখা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছি না। সে বিচার করার মানসিক অবস্থা আমার নেই। তবে বোন, তোমাকে ছাড়া আর কাকে লিখব? তুমি তো শুধু আমার বোন নয়, তুমি আমার মা, তুমি আমার বন্ধুও বটে।'

আর লিখল, 'মনে হচ্ছে তোমাদের ওখানে যাবার পরই বিধাতা আমাকে চরম খবরটা জানাবেন। হয়ত আমার জন্য তোমাদের অদৃষ্টেও কিছু দুর্ভোগ জমা আছে। যদি সত্যিই কোন সর্বনাশা খবর পাই, তাহলে দাদাকে আর খুঁজে পাবে না। তোমাদের দু' ফোঁটা চোখের জল পড়লেই আমার আত্মার শান্তি হবে। এর চাইতে বেশী কিছু করলে আমি যে ঋণের বোঝা বইতে পারব না।'

বন্দনার চিঠি আসতে দেরি হলো না। দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখল, 'দাদা, তোমার কোন অকল্যাণ হতে পারে না। আর কেউ না জানুক, আমি অন্তত জানি তুমি কি ধাতু দিয়ে তৈরী, কি

ঔদার্যে ভরা। আমার মত নিঃসম্বল অসহায়া মেয়েকে যে চরম সর্বনাশেব মুখ থেকে রক্ষা করেছে, তার অকল্যাণ করার সাহস ভগবানেরও নেই।

চিঠিটা শেষ করে আবার নীচে লিখেছিল, 'তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে? তুমি যেভাবেই হোক দিল্লী যাওয়া বন্ধ কর। আমার মনে হয় তোমার এখন আমার কাছেই থাকা উচিত। যত তাড়াতাড়ি পার এখানে চলে এসো।'

ট্যাণ্ডন সাহেবও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। তরুণের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ওর দিল্লী যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করছিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন অ্যাম্বাসেডরের সঙ্গে টেলিফোনে অন্যান্য কথাবার্তা বলতে বলতে এই প্রসঙ্গটাও তুলেছিলেন, 'স্যার, ও এখন এমন টেনসনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে যে দিল্লীতে না গেলেই ভাল হয়।'

'আই ডু রিয়ালাইজ দ্যাট।'

'আপনি একটু দেখবেন...'

'নিশ্চয়।'

গুরুত্বপূর্ণ ডিপ্লোম্যাটদের বদলী করে দিল্লী এনে তাদের ব্রিফিং করা হয় নানা বিষয়ে। এর প্রয়োজন আছে, গুরুত্বও আছে। কিন্তু দু'চারদিনের ব্রিফিং-এর জন্য সরকারী অর্থে দু'-এক মাস ভারত ভ্রমণ ও আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করাই চলতি রেওয়াজ। কেউ আপত্তি করেন না—কারণ যিনি আপত্তি করবেন, তিনিও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চান না।

অ্যাম্বাসেডর নিশ্চয়ই দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কারণ ট্রান্সফার অর্ডারে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল, 'অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কমপ্লিটস্ হিজ রাউণ্ড অফ ব্রিফিং হিয়ার, হি সুড প্রসিড টু লণ্ডন টু জয়েন হিজ নিউ পোস্ট।' অর্থাৎ ব্রিফিং শেষ হলেই লণ্ডন যেতে পারে।

এর পর পরই অ্যাম্বাসেডর নিজেই একদিন তরুণকে টেলিফোন করলেন, 'দিল্লীতে তোমার কদিন লাগবে ?'

'তিন-চারদিন। খুব বেশী হলে এক সপ্তাহ।'

'তুমি কি তারপর একটু ঘোরাঘুরি করবে ?'

'না স্যার, তেমন কোন প্ল্যান নেই।'

'তাহলে তুমি আমার একটা উপকার করবে ?'

'নিশ্চয়ই স্যার। একথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন ?'

'আমার ছোট মেয়ে যমুনাকে চেন তো ?'

'খুব চিনি, স্যার।'

যমুনা অ্যাম্বাসেডরের ছোট ভাইয়ের কাছে থেকে বোম্বে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিল। ওকে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে ভর্তি করার চেষ্টা চলছিল, তাও তরুণ জানে।

অ্যাম্বাসেডর আবার বললেন, 'আমার ছোট ভাই গত মাসে হঠাৎ বদলী হয়ে মাদ্রাজ চলে গেছে। ওর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা বোম্বেতেই আছে। যমুনার অ্যাডমিশন ফাইন্যাল হয়ে গেছে কিন্তু ও চলে আসার আগে আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী একটু ওকে দেখতে চান।'

'স্যার, ওঁরা তো দিল্লীতেই থাকেন ?'

'হ্যাঁ। তাই বলছিলাম তুমি যদি যাবার সময় বোম্বে হয়ে যেতে…'

'নিশ্চয়ই।'

'আর ফেরার সময় যমুনাকে নিয়েই এখানে চলে এলে…'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, স্যার।'

সব কথাবার্তা হবার পর অ্যাম্বাসেডর যমুমাকে চিঠি লিখে জানালেন, 'আংকেল তরুণ মিত্রের সঙ্গে দিল্লী যাবে এবং ওরই সঙ্গে এখানে চলে আসবে।'

তরুণ বন্দনাকে জানাল, দিল্লীতে যাব, তবে মাত্র সপ্তাহ

খানেকের জন্য। তারপর এখানে কদিন থেকেই লণ্ডন চলে যাব। কেনসিংটন গার্ডেনে আমাকে অ্যাপার্টমেণ্ট দেওয়া হবে। বিকাশ যেন রঙ্গস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাপার্টমেণ্টটা ঠিক করে রাখে।

অসহ্য অস্তস্তিভরা দিনগুলি যেন কাটছিল না তরুণের। এই ট্রান্সফার হওয়া নিয়ে তবু কয়েকটা দিন কেটে গেল।

আবার সেই দুশ্চিন্তা মাথায় এলো। অফিসে, পার্টিতে সময়টা তবু কাটে কিন্তু এই হান্সা কোয়ার্টারের নির্জন অ্যাপার্টমেণ্টে এলেই যত আজব চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে। ঢাকার কথা মনে পড়ে।

মাথাটা আবার ঘুরে ওঠে, শরীরটা ঝিম ঝিম করে।

এরই মধ্যে হাবিবের চিঠি এলো, ফরেন সেক্রেটারী স্বয়ং কেসটা ডিল করছেন এবং আমার কাকা বলছিলেন যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব খবর পাওয়া যাবে।

ভাল কথা। কিন্তু তাতে কি মন ভরে? দুশ্চিন্তা যায়?

ঠিক পরের দিনই আবার দেশাই-এর চিঠি এলো।...'ডি আই জি'র বিপোর্টের কপি আজই আমরা পেলাম। দীর্ঘ রিপোর্ট। আজই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে দিল্লী পাঠানো হলো বলে কপি করা সম্ভব হলো না। তবে ঐ রিপোর্টের মেন সামারিতে বলা হয়েছে যে, লেট বীরেন্দ্রনাথ গুহের কন্যা কুমারী ইন্দ্রাণী গুহ মর্ডান হিস্ট্রিতে এম-এ পড়ার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেয় কিন্তু সিক্সথ ইয়ারে ওঠার পরই ছেড়ে দেয়।...'

'...এম এ ক্লাশে ভর্তি হবার জন্য ইন্দ্রাণীর আবেদনপত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন রেজিস্টারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।...'

দেশাই-এর চিঠি পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তরুণ। কি। খবর জানা গেল?

…প্রথম কথা জানা গেল তাঁর বাবা জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় কথা সে অবিবাহিতা ছিল।…

অবিবাহিতা? তরুণ যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়।

…তৃতীয় কথা তাঁর অবিভাবকের নাম লেখা আছে আজিজুল ইসলাম, প্লিডার।…

আজিজুল ইসলাম? পুরনো দিনের ঢাকার স্মৃতি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে থাকে তরুণ। চিঠি পড়া বন্ধ করে আপন মনে বার বার বলে—আজিজুল ইসলাম!

…রিলেশনসিপ ইউথ দি গার্ডিয়ানের ঘরে লেখা আছে, আংকেল।…

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা বেশ জোর করে কামড়ে ধরে তরুণ বলে, আংকেল? তবে কি ইন্দ্রণী কোন আশ্রয় পেয়েছিল?

…বার লাইব্রেরীতে খোঁজ-খবর করে জানা গেছে যে মিঃ আজিজুল ইসলাম হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তবে সঠিক সময়টা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। মিস গুহ এক বছর এম-এ পড়ার পরই কেন আর পড়লেন না, তা জানা যায়নি। প্রথমে সন্দেহ হয় যে হয়ত বিয়ে…

তরুণ প্রায় আঁতকে ওঠে, বিয়ে? তাহলে শেষ পর্যন্ত—।

চিঠিটা হাতে করে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের অস্তিত্বটা যেন নিজেই বুঝতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করে।

…বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে ঠিক ঐ সময়েই মিস গুহের নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট ইস্যু করা হয়। ঠিক কি কারণে ও কোন দেশে উনি যান, তা খোঁজ করা হচ্ছে। আজিজুল ইসলাম সাহেব মারা যাবার পর ওর একমাত্র ছেলে ঢাকার বাড়ী বিক্রী করে দেন ও কিছুকালের মধ্যেই পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। মিস গুহ ওরই সঙ্গে

বিদেশ যান কিনা, তার কোন রেকর্ড ঢাকা এয়ারপোর্ট বা ইমিগ্রেশান বা পুলিশের কাছে নেই। করাচিতে অনুসন্ধান করলে নিশ্চয়ই সেসব খবর পাওয়া যাবে।

চিঠির শেষে দেশাই লিখেছে, 'মনে হয় ঢাকাতে আর বিশেষ কিছু করনীয় নেই। তবে যদি করনীয় থাকে, জানাতে দ্বিধা করবেন না। তাছাড়া ডি-আই-জি'র পুরো রিপোর্টটা পড়ে দেখবেন। ঢাকার বহু লোকের মন্তব্য ও রেফারেন্স আছে এবং আপনি হয়ত অনেককে চিনতে পারেন।'

ডি-আই-জি'র রিপোর্টের মূল বক্তব্য পড়ে নতুন সন্দেহের মেঘ জমল তরুণের মনে। তবুও যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। কৃতজ্ঞতা বোধ করল দেশাই-এর প্রতি। কেবল্ করে ধন্যবাদ জানাল, 'কাইণ্ডলি অ্যাকসেপ্ট সিনসিয়ারেস্ট থ্যাংকস্।'

কিন্তু কে এই আজিজুল ইসলাম? প্লিডার? তরুণের বাবাও তো ওকালতি করতেন। কিছু কিছু উকিলের সঙ্গে তো ওরও পরিচয় ছিল, কিন্তু আজিজুল ইসলাম?

না।

উয়াড়ীর ওদিকে হবিবুর ইসলাম বলে একজন উকিল ছিলেন। আর কোন ইসলাম নামে উকিল ছিলেন কি?

অনেকক্ষণ ভাবল। হঠাৎ মনে পড়ল, ওবেদুর ইসলাম সাহেব তো ওর বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন।

কিন্তু আজিজুল ইসলাম নামে কোন উকিলকে কিছুতেই মনে পড়ল না। আশেপাশে ঢাকার কোন লোকও নেই যে খোঁজ-খবর করা যাবে। বার্লিনে বাঙালী নেই বললেই চলে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক হলে ঢাকার কতজনকে পাওয়া যেত। এমন বিশ্রী জায়গা এই বার্লিন।

অন্য জায়গাতে পাকিস্তান মিশনে কত ঢাকার লোক পাওয়া যায়। এখানে তাও নেই।

আজিজুল ইসলামের চিন্তা করতে করতেই দিল্লী রওনা হবার সময় এসে গেল।

প্লেনে দিল্লী যাবার সময়ও ঐ কথাই ভাবছিল, আজিজুল ইসলাম! তেহেরান এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বসেও ভাবছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, আবাল্য বন্ধু মৈনুল ইসলামের কথা। ওর বাবার নাম ছিল তো আজিজুল ইসলাম!

কিন্তু?

কিন্তু তিনি তো মুনসেফ ছিলেন, উকিল ছিলেন না। ডি-আই জি ভুল করে মুনসেফকে উকিল বলে লেখেন নি তো?

মৈনুলদের পরিবারেই কি ইন্দ্রাণী স্থান পেয়েছিল? মৈনুলের মাকে তরুণও আম্মাজান বলে ডাকত। ভদ্রমহিলার বেশ চুল পেকে যায়। ভাবী ভাল লাগত দেখতে। আম্মাজানকে কি জ্বালাতনই না করেছে ওরা!

। একুশ ।

অনেক দিন পর সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করে বেশ ভাল লাগল। হাজার হোক ভারতবর্ষ! নিজেব দেশ! বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে নিজের দেশে ফিরে এলে সবারই ভাল লাগে।

কেবিনের অন্যান্য প্যাসেঞ্জারেরা চলে যাবার পব আস্তে আস্তে তরুণ উঠল। উপরের র‍্যাক থেকে ওভারকোটটা হাতে নিল। ব্রিফকেসটাও তুলে নিল আরেক হাতে।

গ্যাংওয়ের মুখে এয়ার হোস্টেস সারা রাত্রির ক্লান্তি সত্ত্বেও একটু হাসল। ‘গুডবাই স্যার!’

তরুণ অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিল, ‘বাই।’

যমুনা এসেছিল এয়ারপোর্টে।

কাস্টমস এনক্লোজারের বাইরে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তরুণ চিনতে পারে নি। চিনবে কেমন করে? সেই ছোট্ট যমুনা যে এত বড় হয়ে গেছে, ভাবতে পারে নি।

যমুনাই দৌড়ে গিয়ে ডাকল, 'আংকেল, আই অ্যাম হিয়ার।'

'তুমি যমুনা?'

যমুনা হাসতে হাসতে বললো, 'কেন, সন্দেহ হচ্ছে?'

'না। তবে তুমি কত বড় হয়ে গেছ!'

যাদের ছোট্ট দেখা যায়, দেখা যায় হামাগুড়ি দিতে, টফি চকোলেট-আইসক্রীম নিয়ে মারামারি করতে, অনেক দিনের অদর্শনের পর তাদের বড় দেখলে ভাল লাগে। সেই বহু দূরের একটা ছোট্ট স্বপ্ন যেন বাস্তবে দেখা দেয়।

যমুনাকে দেখতে দেখতে তরুণের সারা মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

'নো আংকেল, আই ওয়াজ নট এ কিডি হোয়েন ইউ স মী লাস্ট। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়তাম।'

শুধু দুপুরটা বোম্বেতে কাটিয়েই অ্যাফটারনুন ফ্লাইটে যমুনাকে নিয়ে দিল্লী এলো তরুণ। পালাম থেকে সোজা গেল পুসা রোডে, যমুনার দাদুর বাড়ীতে! বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নাতনীকে পেয়ে ভীষণ খুশী হলেন। তরুণকে ধন্যবাদ জানালেন। ওদের ওখানেই থাকবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন।

'কাইণ্ডলি অত অনুরোধ করবেন না। আই অ্যাম কমিটেট টু স্টে উইথ এ ফ্রেণ্ড অফ মাইন।'

বিদায় নেবার আগে যমুনাকে বললে, 'দাদু-দিদিমাকে বেশী জ্বালাতন করো না। দরকার হলে আমাকে টেলিফোন করো!'

তরুণ আর দেরি করল না। সোজা চলে গেল বড়ুয়ার ওখানে।

বড়ুয়া বড় পুরনো বন্ধু। বার্লিনে বসেই ওর অ্যাকসিডেন্টের

খবর পেয়েছিল। শুধু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিল, আর কিছু করতে পারেনি।

বড়ুয়া একটা গার্ডেন চেয়ারে বসে লনে অপেক্ষা করছিল তরুণের জন্য। ট্যাক্সি এসে থামতেই চিৎকার করল, 'রানী, এসে গেছে।'

রানী ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বলল, 'মাই গড! এত দেরি করলেন?'

'এত দেরি কোথায়? যমুনাকে নামিয়ে দিয়েই তো চলে এলাম।'

তরুণ তাড়াতাড়ি গিয়ে বড়ুয়াকে জড়িয়ে ধরল। 'এখন কেমন আছ?'

'একটু একটু হাঁটা-চলা করছি।'

রানী বলল, 'ও তো এয়ারপোর্টে যাবে বলে ভীষণ জিদ ধরেছিল…'

তরুণ বলল, 'যেতে দাওনি তো?'

'আমার কথা কি শোনে? ডক্টর স্টপড্ হিম গোয়িং।'

'পম্পি কোথায়?'

বড়ুয়া বলল, 'এক্সকারসানে গেছে। তিন-চারদিন পর ফিরবে।'

রাত্রে ডিনারের পর অনেক গল্প হলো। কলহান, মিশ্র, ট্যাণ্ডন, হাবিব, দেশাই ও কতজনের কথা।

অনেক কথার শেষে বড়ুয়া বলল, 'এখন তো তুমিই সব চাইতে ওয়াইডলি ডিসকাসড্ ডিপ্লোম্যাট।'

'তার মানে?'

রানী মাঝখান থেকে মন্তব্য করল, 'সত্যি দাদা, সারা মিনিস্ট্রি আপনাকে নিয়েই মেতে উঠেছে।'

বড়ুয়া বলল, 'হ্যাটস্ অফ টু ইন্দ্রাণী! একটা বাঙ্গালী মেয়ে দুটো গভর্নমেণ্টকে নাচিয়ে দিল।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'আর হোয়াট ডু ইউ মীন-এর টাইম নেই। গেট রেডি ফর এ গ্রেট সেলিব্রেশন।'

তরুণ অত আশাবাদী হতে পারে না, 'ডোণ্ট বি ওভার-অপটিমিস্‌টিক্‌।'

ডান পা'টা আস্তে আস্তে একটা ছোট্ট মোড়ার উপর তুলে বড়ুয়া বলল, 'তরুণ, অ'ই নো পাকিস্তান বেটার দ্যান ইউ।'

'তা তো বটেই।'

'ইন্দ্রাণীর খবর যদি খারাপ হতো, তাহলে পাকিস্তান এত ঝামেলার মধ্যে যেত না...'

উদগ্রীব হয়ে বড়ুযার কথা শোনে তরুণ। 'তার মানে?'

'ইফ ইট ওয়াজ এ হোপলেস কেস, তাহালে ওরা সোজা বলে দিত ইণ্ডিয়াতে চলে গেছে। দেন দি বল উড হ্যাভ বিন ইন আওয়ার কোর্ট।'

'নানা কারণে ইন্দ্রাণীর কেসটায় ওরা ইণ্টারেস্ট নিচ্ছে কিন্তু...'

'ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ সুইফ্‌টলি দে ক্যান অ্যাক্ট ইন সাম কেসেস।'

'তাতে কি হলো?'

'আমার মনে হয় ওরা ইন্দ্রাণীর সব খবর পেয়ে গেছে এবং এখন আস্তে আস্তে আমাদের সব খবর জানাবে।'

'তাতে কি লাভ?'

'ওরা বোঝাবে যে আমাদের একজন ডিপ্লোম্যাটের জন্য কত কি করল।'

'ডু ইউ থিংক সো?'

'একশ বার।'

পরের দিন সকালে সাউথ ব্লকে মিনিস্ট্রিতে গেলে পাকিস্তান ডেস্কের অনেকেই একথা বললেন।

ওয়েস্টার্ন ইউরোপিয়ন ডেস্কে তরুণ নিজের কাজকর্ম নিয়ে বেশ একটু ব্যস্ত হলেও পাকিস্তান ডেস্কে যাতায়াত করতে হতো নানা কারণে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জয়েণ্ট ডিস্‌কাসনও হতো।

একদিন এমনি ডিস্‌কাসনের সময় জয়েণ্ট সেক্রেটারী বললেন, 'ইন্দ্রাণীকে পাবার পরই নিজেদের বোনাফাইডি প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তান নিশ্চয়ই একটা দারুণ প্রোপাগাণ্ডা শুরু করবে।'

উপস্থিত অফিসাররা অস্বীকার করতে পারলেন না এমন সম্ভাবনা।

তরুণ ওদের আলাপ-আলোচনায় বেশ একটু অবাক হয়। সারা মিনিস্ট্রির প্রায় সবাই ধরে নিয়েছে, ইন্দ্রাণীকে পাওয়া যাবেই।

কিন্তু?

তরুণের অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়। ইন্দ্রাণীকে পাওয়া গেলেও কি তাকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে? তরুণ গ্রহণ করতে চাইলেও তার পক্ষে অসম্ভব হবে না তো?

জয়েণ্ট সেক্রেটারী তো দূরের কথা, অন্যান্য কাউকেই এসব কথা বলতে পারে না, জানাতে পারে না, বোঝাতে পারে না। চুপ করে ওদের কথা শোনে, মুখে কিছু বলে না।

মনের মধ্যে অনেক সংশয়, অনেক দ্বিধা সত্ত্বেও দিল্লীতে আসার পর তরুণের মনটা একটু যেন জড়তামুক্ত হলো। একটু যেন আশাবাদী হলো।

হবে না? হাজার হোক এতগুলো মানুষ যে ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বার করার কাজে মেতে উঠেছে তা দেখে তরুণ একটু স্বস্তি পায়। বহুদিন বহুজনের সেবাযত্ন পাবার পরও যদি কোন রোগী রোগমুক্ত না হয়, যদি সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নেয়, তবুও একটা সান্ত্বনা থাকে। তেমনি এতগুলো মানুষের এত দিনের প্রচেষ্টার পরও যদি ইন্দ্রণীকে···

না না, তা হয় না। যুক্তি-তর্ক করে অন্যকে বোঝান যায়, সান্ত্বনা জানান যায়। নিজের বেলায়? নৈব নৈব চ।

ইতিমধ্যে করাচি থেকে আর একটা মেসেজ এলো দিল্লীতে।··· 'উই হ্যাভ চেকড্‌ আপ আওয়ার রেকর্ডস···। পাশপোর্ট ও ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেণ্টে তদন্ত করে জানা গেল আজ পর্যন্ত সাত

জন মৈনুল ইসলামকে পাশপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে ও তাদের মধ্যে পাঁচজন বিদেশ গিয়েছেন। দু'জন মৈনুল ইসলাম পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে আছেন এবং এদের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের, বাট কারেন্টলি ওয়ার্কিং ইন ফরেন সার্ভিস। উই আর কনটাকটিং অল অফ দেম।...'

ঐ মেসেজেই আর একটা খবর ছিল।...'মিস গুহের পাশপোর্টের রেকর্ড থেকে জানা গেছে ওঁর পায়ের পাতায় নাকি স্টিচ্ করার চিহ্ন আছে। কাইণ্ডলি চেক আপ উইথ মিঃ মিত্র এবং একটু তাড়াতাড়ি খবরটার সত্যতা আমাদের জানালে ভাল হয়।'

মেসেজটা ডি-সাইফার হয়ে পাকিস্তান ডেস্কে এসেছিল সন্ধ্যার দিকে। ডেপুটি সেক্রেটারী সঙ্গে সঙ্গে মিনিস্ট্রিতে তরুণের খোঁজ করেছিলেন কিন্তু পাননি। একটু পরেই বড়ুয়া ওখানে ফোন করলেন।

'তরুণ, হিয়ার ইজ অ্যান আর্জেণ্ট মেসেজ ফ্রম করাচি এবং আজ রাত্রেই উত্তর দিতে হবে।'

করাচি থেকে আর্জেণ্ট মেসেজের কথা শুনতেই তরুণ যেন একটু অস্থির হয়ে উঠল। সারা শরীরের রক্ত যেন হুড়মুড় করে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল! কিছু বুঝতে দিল না। ডেপুটি সেক্রেটারীকে বলল, 'হ্যাঁ, ওর ডান পায়ে স্টিচ্ করার চিহ্ন ছিল।'

'থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ।'

'নট অ্যাট অল। বরং কষ্ট করে আমাকে ফোন করার জন্য আমিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।'

মেসেজটা শোনার পর আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল।

তখন ও ক্লাশ টেন-এ পড়ে। নতুন শাড়ি পরা শুরু করেছে। ব্লেড দিয়ে পায়ের নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটা বুঝি উড়ে পড়ে সামনের দিকে। এক ঝাঁকুনি দিয়ে শাড়িটা সরাতে গিয়ে ব্লেডটা বসে যায় পায়ের পাতায়। উঃ! কি রক্ত পড়েছিল। পাঁচটা কি ছ'টা স্টিচ্ করতে হয়েছিল।

ইন্দ্রাণী তখনও বিছানায় শুয়ে। ওঠা-নামা একেবারেই বন্ধ। একদিন তরুণ বলেছিল, 'তোমার শাড়ি পরার কি দরকার?'

'সে কথা তোমাকে বোঝাতে হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করেছিল ইন্দ্রাণী।

'আমাকে ছাড়া আর কাকে বোঝাবে?'

'তোমাকে কোনদিনই বুঝতে হবে না।'

অনেক দিন পর আজ আবার সেসব কথা মনে পড়ল। একটু বিবর্ণ হয়ে গেল তরুণের মন।

রানী একটু ইসারা করল বড়ুয়াকে।

'কে ফোন করল?' জানতে চাইল বড়ুয়া।

'ডি-এস (পাকিস্তান)।'

'আইডেনটিফিকেশন মার্ক ভেরিফাই করল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

বড়ুয়া একটু হাসল? আপন মনেই বলল, 'পাকিস্তানীদের ঢং দেখে হাসি পায়!'

'তার মানে?'

'সব খবর-টবর হাতের মুঠোয় থাকার পরও এইসব ন্যাকামীর কোন মানে হয়?'

একটু হেসে বড়ুয়া আবার বলে, 'ব্রাদার, গেট রেডি। শুধু প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কয়েক হাজার টাকা অ্যাড্‌ভান্স নিলেই চলবে না। বেশ কিছু খসাতে হবে। নইলে কেউ তোমাকে ছাড়বে না।'

শুধু বড়ুয়া বা রানী নয়, মিনিস্ট্রির অনেকেই সে কথা বললেন, 'তরুণ, আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না কিন্তু।'

'না না, ফাঁকি দেব কেন?'

'ডোণ্ট প্রমিস্ লাইক এ প্রমিসিং ডিপ্লোম্যাট।'

শুধু অফিসাররাই নয়, মিনিস্ট্রির নানা ডিপার্টমেণ্টের অনেক পরিচিত কর্মচারীও বললেন, 'দাদা, শুধু আপনি বলেই আমরা এত খাটছি।'

'থ্যাংক ইউ।'

'নেই নেই দাদা, শুধু থ্যাংক ইউ বললেই চলবে না।'

সবার মুখেই ঐ এক কথা। শুনতেও যেন ভাল লাগে।

দিনগুলো বেশ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। যমুনাকে দেখতে যেতেও পারে নি। আর মাত্র দুটি দিন হাতে। সেদিন মিনিস্ট্রি থেকে যমুনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিল, বিকেলের দিকে ঠিক হয়ে থাকবে। আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।

লাঞ্চের সময় রানীকে বলল, 'আজ বিকেলে যমুনাকে নিয়ে আসব। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডিনার খাইয়ে দিয়ে আসব।'

রানী বলল, 'ঠিক আছে।'

'আমি তোমাদের গাড়ীটা রেখে যাচ্ছি। তুমি পম্পিকে আনার পর চলে এসো অফিসে। তারপর দু'জনে মিলে যমুনাকে আনতে যাব।'

রানী কিছুতেই গাড়ী রাখতে রাজী হলো না। বড়ুয়াও বারণ করল, 'না না, তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। যমুনাকে আনতে যাবার আগে রানীকে তুলে নিও অথবা ও ট্যাক্সি নিয়েই সাউথ ব্লকে পৌঁছে যাবে।'

সেদিন যমুনাকে নিয়ে আর পরের দিন মিনিস্ট্রির সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতেই কেটে গেল। একবার ফরেন সেক্রেটারীর সঙ্গেও দেখা করল। রাত্রে তরুণের অনারে বড়ুয়া আর রানী ডিনার দিল।

দিল্লী ত্যাগ করার সময় মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল তরুণের। এত বন্ধু, শুভাকাঙ্খী, সহকর্মী ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া মাত্র এই কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ বুঝতে পেরেছে, ওরা সবাই ওকে কত ভালবাসে, শুভ কামনা করে।

বড়ুয়া পর্যন্ত এসেছিল পালামে বিদায় জানাতে। অনেক

বারণ করা সত্ত্বেও বাধা মানে নি। বলেছিল, 'রানীই তো ড্রাইভ করবে, সুতরাং আমার যেতে আপত্তি কি?'

বড়ুয়ার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে তরুণ বিদায় নিল। পম্পিকে একটু বুকের মধ্যে টেনে নিল। রানীর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে শুধু বলেছিল, 'চললাম। চিঠি লিখো।'

সবার চোখই ছলছল করছিল! কথাবার্তা বিশেষ কেউই বলতে পারল না।

যমুনা পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

প্লেনটা পালামের মাটি ছেড়ে অনেক দূর উড়ে যাবার পরও তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। কেবিন হোস্টেস কফি দেবার পর দৃষ্টিটা গুটিয়ে আনল ভিতরে।

যমুনা বলেছিল, 'আপনি ওদের সবাইকে খুব ভালবাসেন তাই না?'

মাথাটা একটু নাড়িয়ে তরুণ বলল, 'ওরাই আমাকে ভালবাসে।'

কফি শেষ করে যমুনা আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আংকেল, আপনি তো লণ্ডনে ট্রান্সফার হচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু উইক-এণ্ডে আপনার কাছে চলে আসব।'

'তুমি এলে তো আমি খুশীই হবো।'

'আপনি একটু বাবাকে বলে রাখবেন।'

তরুণ হাসে। বলব।'

পম্পি, যমুনার মত বন্ধুবান্ধব-সহকর্মীদের ছেলেমেয়েদের কাছে পেলেই তরুণের মনে আসে অনেক কথা, অনেক স্বপ্ন। ইন্দ্রাণীকে পেলে ওরও ছেলেমেয়ে এতদিনে বড় হতো, লেখাপড়া করত। ভাবে, ইন্দ্রাণীর মেয়ে হলে এই পম্পি-যমুনার মতই দেখতে সুন্দর হতো, বুদ্ধিমতী হতো।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে মন উড়ে যায় সীমাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। প্লেন ছুটেছে তেহেরানের দিকে। ফ্রাঙ্কফুর্টের আগে এই

একটাই স্টপেজ। সেই তেহেরানও পার হয়ে গেল। পার হলো আরো কত দেশ-দেশান্তর।

অ্যাম্বাসেডর সস্ত্রীক ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে এসেছিলেন যমুনাকে রিসিভ করতে। দু'জনেই বার বার ধন্যবাদ জানালেন তরুণকে।

'একথা বলে লজ্জা দেবেন না, স্যার। দিল্লীতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে যমুমাকে নিয়ে একটুও ঘুরতে পারিনি।'

হঠাৎ মাঝখান থেকে যমুনা বলে উঠল, 'বাট আংকেল, ছাট ডে উই অল এনজয়েড্ ভেরী মাচ।'

অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতে বললেন, 'তরুণ, ডিপ্লোম্যাট হয়েও হেরে গেলে। ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ।'

একটু পরেই প্যান অ্যামেরিকানের বার্লিন ফ্লাইট। তরুণ সেই প্লেনেই যাবে। অ্যাম্বাসেডরের পার্সোন্যাল অ্যাসিসট্যাণ্ট তরুণের লগেজ ট্রান্সফার চেক করতে ও বোর্ডিং কার্ড আনতে চলে গেল। সেই অবসরে অ্যাম্বাসেডর আর তরুণ একটু দূরে গিয়ে কিছু গোপন কথা-বার্তা বললেন।

তরুণের প্লেন ছাড়ার আগে অ্যাম্বাসেডর বললেন, 'যমুনাকে পৌঁছে দিতে হয়ত আমিই লণ্ডন আসব! আই মাইট স্টে উইথ ইউ।'

'আই উইল বি গ্রেটফুল ইফ ইউ প্লিজ।'

বার্লিন বাসের মেয়াদ মাত্র দুটি দিন। ফেয়ারওয়েল লাঞ্চ-ডিনারের জন্যই ঐ দুটো দিন হাতে রেখেছিল তরুণ। আর কোন কাজ নেই। লগেজের ঝামেলা ওর কোন কালেই নেই। কিছু কামা-কাপড়, বই-পত্তর আর একটা মুভি ছাড়া আর কিছু নেই ওর। মিঃ দিবাকর সেসব কদিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন লণ্ডনে।

প্রথম দিন দুপুরে কলিগদের লাঞ্চ, রাত্রে ট্যাণ্ডন সাহেবের ডিনার হলো। পরের দিন তরুণ ঘুরে ঘুরে সমস্ত কলিগদের বাড়ী গেল, বিদায় নিল, শুভেচ্ছা বিনিময় করল। রাত্রে কনস্যুলেটেই ও ডিনার দিল ট্যাণ্ডন দম্পতি ও অন্যান্য সব কলিগদের জন্য।

সমস্ত কর্মজীবন ধরে বার বার যে দৃশ্যটির মুখোমুখি হতে হয়, সেই দৃশ্যটি আবার হাজির হলো। সবার মনই ভারী, চোখগুলো সবারই যেন একটু চক্‌চক্‌ করছে। মুখে কারুরই বিশেষ কথাবার্তা নেই। একেবারে শেষ মুহূর্তে তরুণের কাঁধে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে মিঃ ট্যাণ্ডন বললেন, 'বেস্ট অফ লাক।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।' কলিগদের দিকে ফিরে বলল, 'থ্যাংক ইউ অল।'

ব্রিটিশ ইউরোপীয়ন এয়ারওয়েজের প্লেনটা লণ্ডন এয়ারপোর্টের উপর ঘুরবার সময় বন্দনা-বিকাশের কথা মনে হতেই একটু ভাল লাগল। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যেমন সূর্যরশ্মি বেরিয়ে আসে, তেমনি অনেক খুশীর মধ্যেও দিল্লী বার্লিনে এয়ারপোর্টের দৃশ্য বার বার মনে পড়ল।

টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এ ঢুকতে গিয়েই তরুণ উপরে ভিজিটার্স গ্যালারীর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, বন্দনা আর বিকাশ আনন্দে উল্লাসে হাসতে হাসতে দু' হাতই নাড়ছে। হাই-কমিশনের কয়েকজন বন্ধু ও কর্মচারীও এসেছিলেন।

হাই কমিশনের একজন স্টাফ কাস্টমস এনক্লোজারে গিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারী-ডেজিগনেট এসেছেন জানাতেই সঙ্গে সঙ্গে তরুণের মালপত্র ছেড়ে দিলেন ওঁরা।

বাইরে আসতেই বন্দনা ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। 'দেখলে দাদা, শেষ পর্যন্ত আমার কথাই ঠিক হলো।'

পুরনো বন্ধু মিঃ মানি বললেন, 'ফিরে এসে বাঁচালে।'

'কেন?'

'ছেলেমেয়েকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একটু স্ফুর্তি করা যাবে।'

তরুণ হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'সারা জীবনই কি তোমাদের আয়াগিরি করব ?'

হাই কমিশনের একজন স্টাফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, লগেজ গাড়ীতে রেখে দিয়েছি। আপনি এখন আপনার অ্যাপার্টমেণ্টে যাবেন তো ?'

'হ্যাঁ।'

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'সে কি দাদা ? আগে আমার ওখানে চলো।'

'তার চাইতে তোমরা আমার সঙ্গে চলো। একটু দেখে শুনে নিয়ে তারপর তোমার ওখানে যাব।'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, তাই ভাল।'

তরুণ বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠল। বন্দনা বিকাশও উঠল।

লণ্ডনের জীবনটা বেশ ভালই শুরু হলো। অফিসে কাজকর্মের চাপ বেশী হলেও ভাল লাগে। তাছাড়া বেশ ইন্টারেস্টিং। প্রথম তিন চারদিন তো নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পেল না। লাঞ্চেও বেরুত না, উপরের রেস্তোরাঁ থেকে কিছু আনিয়ে খেত। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতেও অনেক দেরি হতো। সাড়ে সাতটা-আটটা বেজে যেত।

টুকটাক কিছু মার্কেটিং করার ছিল। সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরুবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু অফিস থেকে বেরুবার আগেই হঠাৎ একটা টেলিফোন এলো, 'তরুণ, আমি ওবেদুর।'

ওবেদুর যে এখনও লণ্ডনে আছে, তা ও ভাবতে পারে নি। অপ্রত্যাশিত এই টেলিফোন পেয়ে ভীষণ খুশী হলো, 'আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এখনও লণ্ডনেই আছ।'

'হালারা ট্রান্সফার করার চেষ্টা করছিল।'

'এতদিন পরেও পূর্ববঙ্গের পোলাদের ওরা চেনে নি ?'

'হালারা চেনে বলেই তো আমাদের একটু দূরে দূরে রাখে।'

ওবেত্নর একটু থেমে বলে, 'আজ আমাদের এক বন্ধুর বাড়ীতে গান-বাজনা আছে। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। আইদার ইউ কাম টু মাই অফিস অর আই উইল কাম ডাউন টু পিক ইউ আপ।'

'ভাই আজকে মাপ করো। আজকে আমার একটু জরুরী কাজ আছে, কদিন একেবারেই সময় পাইনি।'

'এক্ষুনি একজনের কাছে শুনলাম তুমি এসেছ এবং সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন করেছি। আর তুমি আমার ফার্স্ট রিকোয়েস্টই...'

তরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ! এসব কথা বলছ কেন? তোমার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক?'

এবার ওবেত্নর সোজা হুকুম করে, 'দেন প্লিজ ডোণ্ট আর্গু এনি মোর। তুমি সাতটা নাগাদ আমার এখানে আসছ তো?'

ওবেত্নর রহমান ময়মন সিং-এর ছেলে। তবে তরুণেরই সমসাময়িক। পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনসের লণ্ডন অফিসের ম্যানেজার বহুদিন ধরে। বাঙালী ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাগলামী করতে ওর জুড়ি নেই লণ্ডনে। তরুণের সঙ্গে বেশ গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল গতবার। এমন বন্ধুবৎসল উদার মানুষ টেমস্-এর পাড়ে দুর্লভ। কিছুতেই না করতে পারল না। তাছাড়া এতকাল বার্লিনে থেকে বাঙ্গালীর আড্ডাখানা ভুলতে বসেছে।

একে আড্ডার লোভ, তারপর ওবেত্নরের অনুরোধ। তরুণ রাজী হয়ে গেল।

'ঠিক আছে।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে বন্দনাকে টেলিফোন করে বলল, 'আমি ওবেত্নরের সঙ্গে এক ঘরোয়া জলসায় যাচ্ছি। নিশ্চয়ই রাত হবে। তুমি আমার জন্য কিছু খাবার-দাবার রেখো।'

'কোথায় যাচ্ছ, দাদা?'

'ঠিক জানি না। ওবেত্নরেরই এক বন্ধুর বাড়ী।'

অফিস থেকে বেরুবার মুখে হঠাৎ একটা কাজ এসে গেল।

বেরুতে বেরুতেই সাতটা বেজে গেল। ওবেছুরের ওখানে পৌঁছতেই ও চীৎকার শুরু করে দিল, 'আড্ডা দিতেও কেউ লেট করে ?'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না ওবেছুর। 'চলো চলো, গাড়ীতে ওঠ। আরেক দিন এসে কফি খেও।'

উঠতে না উঠতেই ওবেছুরের অষ্টিন-কেম্ব্রিজ টপ্ গিয়ারে ছুটতে শুরু করল। আশপাশের আর সব গাড়ীকে ওভারটেক করে এমন স্পীডে গাড়ী ছুটছিল যে তরুণ ওবেছুরের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলারই কোন সুযোগ পেল না। টটেনহাম কোর্ট ছাড়াবার পর তরুণ শুধু জানতে চাইল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?'

ওবেছুর শুধু বলল, 'এইত সামনেই হোবর্নে।'

হোবর্ন টিউব স্টেশন পার হবার পরই ডানদিকে গাড়ী ঘুরল। আবছা আলোয় তরুণ বুঝতে পারল না কোন রাস্তায় ঢুকল। শত খানেক গজ যাবার পরই অনেকগুলো গাড়ী নজরে পড়ল। ঐ গাড়ীগুলোরই একটু ফাঁকে ওবেছুর গাড়ী ঢুকিয়ে ব্রেক করল।

ছু'জনেই নেমে পড়ল। গাড়ীর চাবিটা পকেটে পুরেই সিগারেট বের করল ওবেছুর। ছু'জনেই সিগারেট ধরিয়ে ছু'-চার পা এগিয়েই একটা কর্নারের বাড়ীতে এলো! সামনের ঘরেই একদল বাঙালীর জটলা। দরজার গোড়াতেই ভিতরের দিকে মুখ করে আরেকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এক ভদ্রলোক।

ওবেছুর ডাক দিল, 'মৈনুল, তোমাগো ঢাকার এক পুলাকে লইয়া...'

ঢাকার মৈনুল শুনতেই তরুণের সারা শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল।

মৈনুল এদিকে মুখ ফেরাতেই তরুণ ওর মুখের আঁচিলটা দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'মৈনুল।'

এক পলকের জন্য মৈনুল হকচকিয়ে থতমত হয়ে গেল। পর

মুহূর্তেই সারা লণ্ডন শহরটাকে চমকে দিয়ে চীৎকার করল, 'আম্মাজান, ইন্দ্রাণী। তরুণ আইছে।'

দু'জনে দু'জনকে জাপটাজাপ্‌টি করে জড়িয়ে ধরল।

মৈনুলের চীৎকার শুনে ওবেতুর থেকে শুরু করে সারা ঘরভর্তি মানুষগুলো মুহূর্তের জন্য প্রাণহীন পাথরের স্ট্যাচুর মত স্তব্ধ হয়ে গেল। ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন বুড়ি আম্মাজান আর ইন্দ্রাণী।

'ইন্দ্রাণী!'

'আম্মাজান!'

তরুণ যেন বিশ্বাস করতে পারে না নিজের চোখ দুটোকে।

আম্মাজান হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তরুণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভাবি নাই তোমার দেখা পামু। মাইয়াটাকে লইয়া সারা দুনিয়া ঘুরছি তোমার দেখা পাওনের জন্য।'

তরুণ স্তব্ধ হয়ে আম্মাজানকে জড়িয়ে ধরে।

হঠাৎ আম্মাজান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণীর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে তরুণের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, 'বাবা, মাইয়াটাকে তুইলা লও। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না।'

তরুণ মাটিতে বসে পড়ে। ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

সব কিছু কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

মৈনুল আবার হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ওরে তোরা চুপ কইয়া থাকিস ক্যান? গান শুরু কর। মিষ্টি লইয়া আয়। আজ আমার ইন্দ্রাণীর বিয়া হইব।'